অষ্টম বর্ষ | দশম সংখ্যা | মাঘ ১৩৭৫

প্রবন্ধ

গল্প

॥ সম্পা

শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী, ব্রজেন্দ্র ভট্টাচার্য, নির্মল গাপাধ্যায়, অরুণ রায়,
রণেন নাগ, সুনীল চক্রবর্তী, পল্লব সে শিব চট্টোপাধ্যায় ॥

॥ সম্পাদকীয় দপ্তর ॥

৭৭/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ (ফোন : ৩৪-৫০১৪)

সম্পাদক শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী কর্তৃক নিউ প্রিণ্টস্, ৩২।৩ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত ও চতুষ্কোণ প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে নির্মলকান্তি ঘোষ কর্তৃক ১২৩, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা-১৪ হইতে প্রকাশিত। অফ্‌সেট কভার মুদ্রণ : ব্লকম্যান (প্রসেস)।

নবম বর্ষ ৩য় সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৬

প্রবন্ধ

উপন্যাস

॥ সম্পাদকীয় দপ্তর ॥

৭৭/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ (ফোন : ৩৪-৫০১৪)

সম্পাদক শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী কর্তৃক নিউ প্রিন্টস্, ৩২।৩ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত ও চতুষ্কোণ প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে নির্মলকান্তি ঘোষ কর্তৃক ১২৩, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা-১৪ হইতে প্রকাশিত। অফসেট কভার মুদ্রণ : ব্লকম্যান (প্রসেস)।

অষ্টম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা আষাঢ় ১৩৭৬

প্রবন্ধ

গল্প

উপন্যাস

॥ সম্পাদকমণ্ডলী ॥

॥ সম্পাদকীয় দপ্তর ॥

৭৭/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ (ফোন : ৩৪-৫০১৪)

সম্পাদক শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী কর্তৃক নিউ প্রিণ্টস্, ৩২।৩ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত ও চতুষ্কোণ প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে নির্মলকান্তি ঘোষ কর্তৃক ১২৩, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা-১৪ হইতে প্রকাশিত। অফ্‌সেট কভার মুদ্রণ : ব্লকম্যান (প্রসেস)।

• কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ •

অবনীন্দ্রনাথ ॥ শ্রীলীলা মজুমদার

অবনীন্দ্রনাথ সাহিত্যিকরূপে কতটা সাফল্যলাভ করেছেন এই গ্রন্থে তা আলোচিত। ২·০০

অবভাস ও তত্ত্ববস্তু বিচার ॥ ফ্রেন্সিস হার্বার্ট ব্রেডলি

Appearance and Reality-গ্রন্থের প্রাঞ্জল অনুবাদ। অনুবাদক: শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার। ৮·০০

আত্মজীবনী ॥ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দীর্ঘদিন পরে মুদ্রিত মহর্ষি-রচিত এই মহামূল্য গ্রন্থখানিতে অনেক নূতন তথ্য সংযোজিত হয়েছে। ১২·০০

গল্পসংগ্রহ ॥ প্রমথ চৌধুরী

প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত আরও আটটি গল্প সংকলিত নূতন সংস্করণ। ১০·০০ ; শোভন ১২·০০

দুনিয়াদারী ॥ চারুচন্দ্র দত্ত

কয়েকটি সুপাঠ্য গল্পের সংকলন। ২·০০

নারীর উক্তি ॥ ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

বর্তমান স্ত্রীশিক্ষা-বিচার, সম্বন্ধ, আদর্শ, ভদ্রতা, প্যাটেল-বিল, বঙ্গনারী—কঃ পন্থা ইত্যাদি নিবন্ধ। লেখিকার সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণিত। ২·৫০

পুরানোকথা ॥ চারুচন্দ্র দত্ত

দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ সুখপাঠ্য ও কৌতূহলোদ্দীপক রচনা। গ্রন্থকারের আংশিক আত্মচরিত বা জীবনচরিত বলা যায়। প্রতি খণ্ড ৩·০০

পূর্ণকুম্ভ ॥ শ্রীরানী চন্দ

তীর্থভ্রমণের কাহিনী। অনেকটা ডায়েরির ভঙ্গিতে লেখা। ১৯৫৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্র-পুরস্কার-প্রাপ্ত। ৫·০০

প্রবন্ধসংগ্রহ ॥ প্রমথ চৌধুরী

ইতিপূর্বে দুইখণ্ডে সংকলিত পঞ্চাশটি প্রবন্ধ একত্র প্রকাশিত। ১৬·০০ ; শোভন ১৮·০০

বাংলার স্ত্রী-আচার ॥ ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব-বঙ্গের বিবাহ-পর্ব, বিবাহকালীন ও বিবাহ-উত্তর স্ত্রী-আচারসমূহের মনোহারী বিবরণ। ১·৩০

বৌদ্ধদের দেবদেবী ॥ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য

বৌদ্ধ মূর্তিশাস্ত্র এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবদেবী সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা। ৩·০০

যা দেখেছি যা পেয়েছি ॥ শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

লেখক তাঁর সুদীর্ঘ কর্মবহুল জীবনের কাহিনী বিবৃত করেছেন এই গ্রন্থে। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে, এই খণ্ডে তাঁর কৈশোরকাল থেকে আরম্ভ করে কর্মজীবনে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত কাহিনী মুদ্রিত হয়েছে। ১৪·০০

সপ্তপর্ণ ॥ রাখালচন্দ্র সেন

'পাকা হাতের' লেখা ছোটো গল্পের সংকলন। ২·০০

হিমাদ্রি ॥ শ্রীরানী চন্দ

কেদার-বদরী ভ্রমণের কাহিনী। লেখিকার 'পূর্ণকুম্ভ' গ্রন্থের ন্যায় সুখপাঠ্য। ৩·০০

বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকনাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

পদকল্পতরু-প্রণেতা

সতীশচন্দ্র রায়

জন্ম : ১লা কার্তিক, ১২৭৩

মৃত্যু : ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮

ভবানীচরণ রায়

৫ই জ্যৈষ্ঠ (১৩৩৮) সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত ধামগড় গ্রামে নিজ বাড়ীতে অবস্থান কালে পরলোক গমন করেন। স্বর্গীয় রায় মহাশয় ১২৭৩ বঙ্গাব্দের ১লা কার্তিক ধামগড়ের সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ও তৎপরে ঢাকা কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ঢাকা কলেজ হইতে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতা আসিয়া General Assembly's Institutionএ ভর্তি হন। তথা হইতে বি.এ. ও পরে সংস্কৃত কলেজ হইতে এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এম.এ. পাশ করিবার পর কিছুদিন তিনি ঢাকার জগন্নাথ কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপকের কাজ করেন। পড়াশুনা ও গবেষণার পক্ষে ঐ চাকুরী অনুকূল না হওয়ায়, তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়া সংস্কৃত ও প্রাচীন সাহিত্যের বিশেষরূপ আলোচনা করিতে থাকেন।

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। তিনি বি.এ. পরীক্ষায় সংস্কৃতে অনার্স লইয়া প্রথম শ্রেণীতে গুণানুসারে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। তাঁহাদের সঙ্গে প্রথম হন (সাহিত্য) পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয়। তাঁহার সহপাঠিগণের মধ্যে খ্যাতনামা অধ্যাপক স্বর্গীয় বিনয়েন্দ্রনাথ সেন এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ-বন্ধু কর্মবীর স্বর্গীয় অশ্বিকাচরণ উকিল মহাশয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি সংস্কৃত কলেজ হইতে সংস্কৃতে এম.এ. পরীক্ষা দিয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং সোনামণি বৃত্তি লাভ করেন।

কর্মজীবনের অবসানে প্রায় ১০ বৎসর যাবৎ বাড়ীতে অবস্থান

করিয়া তিনি সম্পূর্ণ একনিষ্ঠভাবে সাহিত্য-চর্চা ও সাহিত্য-সেবায় আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তিনি ৪০ বৎসর ধরিয়া বৈষ্ণব-পদাবলীর আলোচনায় নিমগ্ন ছিলেন। তাঁহার ন্যায় এরূপ দীর্ঘকাল একনিষ্ঠার সহিত একটি বিষয়ের আলোচনায় রত থাকার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত ও বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত "পদকল্পতরু" তাঁহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। পদাবলী-সাহিত্য-প্রকাশ-কার্যে তাঁহার অধ্যবসায়, গবেষণা ও নৈপুণ্য যে বঙ্গসাহিত্যের প্রভূত উপকার করিয়াছে, তাহা রামেন্দ্রসুন্দর, রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ সুধীবর্গ মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। বৈষ্ণব-পদাবলী বিষয়ক তাঁহার বহু মৌলিক-গবেষণাপূর্ণ, সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা এবং বাঙ্গালার অন্যান্য মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রায় ১০।১২ বৎসর পূর্বে "অপ্রকাশিত-পদ-রত্নাবলী" নাম দিয়া সুবিস্তৃত ভূমিকা ও শব্দ-সূচী সহ একখানি উৎকৃষ্ট পদাবলী-সংগ্রহ তিনি প্রকাশিত করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থখানি ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের বি.এ. শ্রেণীর পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিয়াছিলেন। মৃত্যুর ৪।৫ বৎসর পূর্বে তিনি ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মহাকবি ভবানন্দের "হরিবংশ" নামক কাব্য সম্পাদন করিবার জন্য নিযুক্ত হন। ইহার কয়েক বৎসর পূর্বে ঐ গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের পরিচয় দিয়া তিনি "ঢাকা-রিভিউ ও সম্মিলনী" পত্রিকায় দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, এবং ইহার কয়েক বৎসর পরে মুন্সীগঞ্জ-সাহিত্য-সম্মিলনে ঐ বিষয়ে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটি পরে সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় "পূর্ব-বঙ্গের কবি-শ্রেষ্ঠ ভবানন্দের-হরিবংশ" নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। নিজের সংগৃহীত প্রাচীন ও প্রামাণিক পুঁথি ছাড়া ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকশালা হইতে হরিবংশের আরও কয়েকখানা প্রাচীন ও প্রামাণিক হস্তলিখিত পুঁথি তিনি প্রাপ্ত হন। এই তিন-চারিখানা পুঁথির পাঠ ও রূপান্তর মিলাইয়া হরিবংশের text বা মূল নিরূপণ করিয়া পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত-করণে তিনি তিন চারি মাস কাল অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। "হরিবংশ" কলিকাতার 'প্রবাসী' প্রেসে মুদ্রিত হয় (১৩৩৮)।

শেষ-জীবনে পদাবলী-সাহিত্যের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি হিন্দী-সাহিত্যের আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। হিন্দী-সাহিত্যের অনুশীলন

সম্পর্কে হিন্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও সমালোচক যুক্তপ্রদেশবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মসিংহ শর্মা মহোদয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় এবং বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মে। পণ্ডিতজী হিন্দীর তো কথাই নাই, সংস্কৃত, উর্দু, ফার্সী প্রভৃতি ভাষায় অগাধ পণ্ডিত। পণ্ডিতজীর সহায়তায় তিনি সুরদাস, তুলসীদাস, বিহারীলাল প্রভৃতি প্রাচীন শ্রেষ্ঠ হিন্দী কবিদিগের কাব্য বিশেষ মনযোগের সহিত পুনরায় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। হিন্দীর সঙ্গে সঙ্গে উর্দুরও আলোচনা তিনি আরম্ভ করিয়াছিলেন। সংস্কৃতে অগাধ ব্যুৎপত্তি ছিল বলিয়া অতি অল্পদিনের চেষ্টাতেই তিনি হিন্দীতে মৌলিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধাদি লিখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। প্রয়াগের হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলনের মুখপত্র "সম্মেলন-পত্রিকা," লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশিত "সুধা," এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত "মনোরমা," বিহার হইতে প্রকাশিত "বালক," মুজঃফরপুর হইতে প্রকাশিত "লেখমালা", মধ্যভারতের ইন্দোর হইতে প্রকাশিত "বীণা," এবং কলিকাতা হইতে প্রকাশিত "বিশাল ভারত" প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় তাঁহার লিখিত হিন্দী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। ৪।৫ বৎসর পূর্বে "সুধার" সাহিত্যাঙ্কে "বঁগলা-সাহিত্য কে ক্রম-বিকাস কা দিগ্‌দর্শন" শীর্ষক একটি সুদীর্ঘ গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ তিনি লিখিয়াছিলেন। সম্মেলন-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার "অলঙ্কার ঔর কবিতা" শীর্ষক প্রবন্ধও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কুমিল্লা হইতে প্রকাশিত "কমলা" নামক মাসিক পত্রিকায় একটি সুদীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধে তিনি "মহাকবি সুরদাসের পদাবলী"র বিশদরূপে আলোচনা করিয়াছেন। (কমলার তৃতীয় বর্ষের শ্রাবণ, আশ্বিন, কার্তিক, ফাল্গুন এবং চৈত্র সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। ইহা ছাড়া ১৩৩২ বঙ্গাব্দে সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত "হিন্দী-সাহিত্যে বিহারীলালের সতসঈ" নামক সুবিস্তৃত প্রবন্ধে তিনি কবি বিহারীলালের সতসঈ-কাব্য ও পণ্ডিত-শ্রীযুক্ত পদ্মসিংহ শর্মা মহোদয়-কর্তৃক সম্পাদিত উক্ত কাব্যের প্রসিদ্ধ-সংস্করণের বিশদরূপে আলোচনা করিয়াছেন।

তিনি প্রয়াগের হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলনের একজন স্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন এবং কয়েক বৎসর পূর্বে ভরতপুরে হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলনের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে যোগদান করিয়া "বিদ্যাপতি কে উপর হিন্দী-সংসার কা অনাদর ঔর উস্ কা সংশোধন" শীর্ষক একটি মৌলিক গবেষণা ও বিচার-পূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরে ঐ প্রবন্ধটি হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন

"বিদ্যাপতি ঔর উনকী কবিতা" এই পরিবর্তিত নামে একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। বিলাতের Chaucer Society, Shakespeare Society, Browning Society প্রভৃতির ন্যায় "বিদ্যাপতী-সঞ্জীবনী-সমিতি" নামক একটি সমিতি গঠন করিবার ইচ্ছা তাঁহার অনেকদিন হইতেই ছিল এবং ঐরূপ একটি সমিতি গঠনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তার প্রতি তিনি প্রয়াগের হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করেন। হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে বিদ্যাপতির একটি বিশুদ্ধ, প্রামাণিক, সটীক সংস্করণের সম্পাদকত্ব গ্রহণ করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কেবল একজনের চেষ্টায় যে ঐরূপ মহৎ কায কখনও সুসম্পন্ন হইতে পারে না, তিনি সেকথা সম্মেলনের কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া বিনয়ের সহিত তাঁহাদের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। "বিদ্যাপতি-সঞ্জীবনী-সমিতি" গঠন করিয়া বিদ্যাপতির একটি বিশুদ্ধ প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশ করিবার তাঁহার সাতিশয় আগ্রহ ছিল। এ বিষয়ে প্রয়াগের হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন কর্তৃক প্রকাশিত তাঁহার "বিদ্যাপতি ঔর উনকী কবিতা" নামক পুস্তিকা, মুজঃফরপুর হইতে প্রকাশিত "লেখমালা"র বিদ্যাপতি-অঙ্কে প্রকাশিত "বিদ্যাপতি কে বিষয় মে হমারা নম্র নিবেদন" শীর্ষক প্রবন্ধ, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত "বিশাল ভারত" নামক সুবিখ্যাত হিন্দী মাসিক পত্রিকার ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁহার "বিদ্যাপতি-সঞ্জীবনী-সমিতি" নামক প্রবন্ধ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত "পঞ্চপুষ্প" নামক মাসিক পত্রের ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের আষাঢ়, শ্রাবণ ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত "বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রমাণিক সংস্করণ "শীর্ষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ এবং শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত "সোনার গৌরাঙ্গ" নামক মাসিক পত্রে ৫।৬ বৎসর ধরিয়া প্রতি-মাসেই ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত তাঁহার "বিদ্যাপতি-মীমাংসা," "বিদ্যাপতি-বিচার" ও বিদ্যাপতি-বিষয়ক অন্যান্য প্রবন্ধে তিনি তাঁহার ঈপ্সিত "বিদ্যাপতি-সঞ্জীবনী-সমিতির" কার্য-প্রণালীর সূত্রপাত করিয়া তাঁহার পরিবর্তিগণের কার্যকে অনেক পরিমাণে অনায়াসসাধ্য করিয়া গিয়াছেন।

প্রায় ২০ বৎসর যাবৎ তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত, পরিষৎ পত্রিকার একজন নিয়মিত লেখক এবং "পদকল্পতরু"র সম্পাদক

হিসাবে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। "পদকল্পতরু" গ্রন্থ সম্পাদন কার্যে তিনি যে কিরূপ অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা "পদকল্পতরু"র পাঠক-মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। আমরা এ বিষয়ে মাত্র ২।১টি ঘটনার কথা উল্লেখ করিব। বৈষ্ণবপদাবলীর বিশুদ্ধ পাঠ ও অর্থ নির্ণয়ের জন্য প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির অনুসন্ধান তিনি সর্বদাই করিতেন। "পদকল্পতরু"-সম্পাদনের সময় পরিষদের পুথিশালা হইতে যে সমস্ত প্রাচীন প্রামাণিক পুথি পাইয়াছিলেন, তাহার অতিরিক্ত তিনি নিজেও কয়েকখানা অতি মূল্যবান্ প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ঐ সকল প্রাচীন পুথির মধ্যে নিমানন্দ দাস সঙ্কলিত "পদ-রস-সার" নামক সুপ্রাচীন পুথিখানা সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ঐ পুথিখানা প্রাপ্তির ইতিহাস এবং সঙ্কলয়িতা ও গ্রন্থের পরিচয় দিয়া "নিমানন্দ দাসের পদ-রস-সার" শীর্ষক একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ তিনি উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে পাঠ করেন। পরে ঐ প্রবন্ধটি ১৩২১ বঙ্গাব্দে "সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায়" প্রকাশিত হয়। "পদ-রস-সার" পুথিখানা অত্যন্ত অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার কাজ শেষ করিয়া ফিরাইয়া দিতে হইবে, এই শর্তে পুথির মালিকের নিকট হইতে তিনি পাইয়াছিলেন। "পদকল্পতরু"-সম্পাদন কার্যে উক্ত পুথিখানা প্রতিপদেই তাঁহার প্রয়োজন হইবে জানিয়া তিনি একখানা মজবুত রকমের বাঁধান খাতায় দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া সমস্ত পুথিখানা তাঁহার মুক্তার ন্যায় সুদৃশ্য হস্তাক্ষরে নকল করিয়া লইয়াছিলেন। ইহার কয়েক বৎসর পরেই "পদ-রস-সারে"র ঐ মূল পুথিখানা একজন ধনীব্যক্তির গৃহ হইতে অপহৃত এবং সম্ভবত চিরদিনের জন্য লুপ্ত ও বিনষ্ট হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার লিখিত খাতাখানাই বোধ হয়, বর্তমানে "পদ-রস-সারে"র একমাত্র প্রামাণিক হস্তলিখিত পুথি। উহা সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে এবং তাঁহার লাইব্রেরীর অন্যান্য প্রাচীন পুস্তকের সহিত যথাসময়ে ঐ খাতাখানিও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হস্তে অর্পিত হইবে। "পদকল্পতরু"-সম্পাদন কার্যে অত্যধিক পরিশ্রম করায় তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে, এবং তিনি দুরারোগ্য বহু-মূত্ররোগে আক্রান্ত হন। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি হওয়ায় এমন কি তাঁহার জীবন-সংশয়ের সম্ভাবনা পর্যন্ত ঘটিয়াছিল।

প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির অনুসন্ধান, বহু প্রামাণিক প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির পাঠ মিলাইয়া পদাবলীর বিশুদ্ধ পাঠ ও অর্থ নির্ণয়, প্রসিদ্ধ পদ-কর্তাদের

লুপ্ত ও বিনষ্টপ্রায় পদের পুনরুদ্ধার ও প্রকাশ এবং বহু অজ্ঞাতনামা ও অজ্ঞাত-পূর্ব পদকর্তাদের পদাবলীর আবিষ্কার প্রভৃতি কার্যে তিনি যে কিরূপ অধ্যবসায়, গবেষণা, নৈপুণ্য ও বৈশিষ্ট্য সহকারে করিয়াছেন, তাহা সাহিত্যানুরাগী ও সাহিত্য-রসিক মাত্রেই অবগত আছেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া পদাবলী সাহিত্য আলোচনার ফল তাঁহার সম্পাদিত পদকল্পতরুর বিরাট সংস্করণ। তবে দুঃখের বিষয়, তিনি ইহাকে পূর্ণ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। গ্রন্থের মুদ্রণকার্য শেষ হইলে "পরিবর্তন ও পরিবর্ধন" শীর্ষক একটি অধ্যায় গ্রন্থের সহিত সংযুক্ত করিয়া মুদ্রাকর-প্রমাদের সংশোধন ও কোন কোন প্রসিদ্ধ পদকর্তাদের সম্বন্ধে নূতন যেসব আলোচনা তাঁহার ভূমিকাটি লিখিত হইবার পর প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিবার সঙ্কল্প তাঁহার ছিল। আকস্মিক মৃত্যুর কারণে, তিনি যে এই সঙ্কল্পটি পূর্ণ করিয়া যাইতে পারিলেন না, ইহাতে বৈষ্ণব-সাহিত্য আলোচনার যে কিরূপ গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সকলেই অনুভব করিয়া থাকিবেন। শব্দ-সূচীটি এবং পূর্বোক্ত "পরিবর্তন ও পরিবর্ধন" শীর্ষক অধ্যায়টির মুদ্রণ শেষ হইলেই গ্রন্থের সমাপ্তি হইত, এবং তিনি আর অল্প কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিলেই তাঁহার জীবনের এই মহৎ কার্যের সুসমাপ্তি দেখিয়া যাইতে পারিতেন। পরিশিষ্ট ৬ষ্ঠ খণ্ডে তাঁহার সংগৃহীত বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ পদকর্তাদের বহু নবাবিষ্কৃত ও অপ্রকাশিত পদাবলী এবং প্রায় ৩০ জন অজ্ঞাতপূর্ব এবং কয়েকজন অজ্ঞাতনামা পদকর্তার বহু নবাবিষ্কৃত পদাবলী প্রকাশিত করিতে তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। সর্বসমেত এই পরিশিষ্ট-পদাবলীর সংখ্যা অনুমান এক হাজারের কিছু অধিক হইবে। এস্থলে ইহা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, পরিষৎ কর্তৃক পদকল্পতরুর এই সুবৃহৎ-প্রমাণিক সংস্করণের সম্পাদক নিযুক্ত হইবার বহু পূর্বে ১৩০৪ বঙ্গাব্দে কলিকাতার ভারতীয় গ্রন্থ-প্রচার-সমিতি হইতে প্রাচীন পুথি দৃষ্টে, তিনি পদকল্পতরুর একটি ভাল সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরিষদের সংস্করণ প্রকাশিত হইবার পূর্বে উহা পদকল্পতরুর অন্যতম উৎকৃষ্ট সংস্করণ বলিয়া বিবেচিত হইত।

পদকল্পতরু-গ্রন্থের মুদ্রণ শেষ হইলে প্রাচীন পুথি দৃষ্টে চৈতন্যচরিতামৃতের একটি বিশুদ্ধ প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশ করিবারও তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি প্রায় ৫।৬ বৎসর উক্ত সংস্করণের জন্য উপাদান সংগ্রহে

ব্যস্ত ছিলেন। গোবিন্দদাস প্রভৃতি ২।৪ জন প্রসিদ্ধ পদকর্তার ভাল সংস্করণ প্রকাশ করিবারও আগ্রহ তাঁহার ছিল।

তাঁহার মৃত্যুর কিঞ্চিদধিক এক বৎসর পূর্বে পরিষদের এক অধিবেশনে তিনি সর্বসম্মতিক্রমে পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন। পরিষদের কার্যে আত্মনিয়োগ করিবার ঐরূপ সুযোগ পাইয়া ধন্যবাদ সহকারে তিনি ঐ পদ গ্রহণ করেন। পরিষদের মঙ্গলের জন্য তিনি সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন।

তিনি আজীবন সংস্কৃত-সাহিত্যের চর্চা করিয়া গিয়াছেন। কাব্য ও অলঙ্কারের প্রতিই তাঁহার সমধিক অনুরাগ ছিল। অলঙ্কারে তাঁহার অসামান্য ব্যুৎপত্তি ছিল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শন-শাস্ত্র তিনি সম্যক্‌রূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং শেষজীবনে গীতা ও উপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থরাজি অত্যন্ত যত্ন সহকারে সর্বদাই অধ্যয়ন করিতেন। "প্রবাসী" পত্রিকায় প্রকাশিত ঋষি-কল্প দ্বিজেন্দ্রনাথের দার্শনিক প্রবন্ধাদি তিনি অত্যন্ত আগ্রহ ও অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিতেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কর্তৃক অনূদিত মহাত্মা লোকমান্য তিলকের "গীতারহস্য" নামক অমূল্য গ্রন্থ-রত্ন শেষজীবনে তাঁহার অতিপ্রিয় পাঠ্য ছিল। ইংরেজ দার্শনিকগণের মধ্যে তিনি Herbert Spencerএর প্রতি সমধিক অনুরক্ত ছিলেন। Psychology বা মনস্তত্ত্ব ও Psycho-Analysis বা মনোবিশ্লেষণ প্রভৃতি বিষয়ক Freud প্রমুখ প্রতীচ্য লেখকগণের পুস্তকাদি তিনি যত্নসহকারে পাঠ করিয়াছিলেন।

তিনি সংস্কৃতে ও বাঙ্গালায় একজন সুকবি ছিলেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সংস্কৃতে সুন্দর শ্লোক রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার রচিত অনেক সুন্দর শ্লোক তাঁহার সুযোগ্য পুত্রগণ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু-উপলক্ষে তিনি "দেশবন্ধু প্রশস্তিঃ" এই নামে একটি অতি সুন্দর শ্লোক লিখিয়া হিন্দী পদ্যানুবাদসহ তাহা মহাত্মা গান্ধীর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন।

যৌবনে কলেজ পরিত্যাগের পরে তিনি মহাকবি কালিদাসের অমর কাব্য মেঘদূতের একটি উৎকৃষ্ট পদ্যানুবাদ প্রকাশিত করেন। উহা অনেকদিন হইল নিঃশেষিত হইয়াছে। পরে তিনি জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" ও ভানুদত্তের সু-প্রসিদ্ধ "রস-মঞ্জরী" নামক কাব্যদ্বয়ের সুললিত পদ্যানুবাদ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। বিশেষজ্ঞগণের নিকট হইতে তাঁহার "গীতগোবিন্দ" ও

"রস-মঞ্জরী"-র পদ্যানুবাদ অতি উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছিল।' Goethe ও Shelleyর কয়েকটি গীতি-কবিতা ও Miltonএর "On his Blindness নামক প্রসিদ্ধ সনেটের তিনি পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন ; সেগুলি প্রকাশিত হয় নাই। ইহা ব্যতীত স্ব-রচিত "সরলা" নাম্নী একটি অতি প্রাঞ্জল সংস্কৃত টীকা সহিত ময়ূরভট্ট-রচিত প্রসিদ্ধ "সূর্য-শতক" কাব্যের একটি উৎকৃষ্ট পদ্যানুবাদ তিনি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। নানা কারণে উক্ত গ্রন্থের মুদ্রণ-কার্য ৭।৮ ফর্মার অধিক অগ্রসর হয় নাই। তাঁহার সম্পাদিত আরও একখানা উৎকৃষ্ট পুস্তকও পাণ্ডুলিপির আকারেই রহিয়াছে। মৃত্যুর অল্প কয়েকবৎসর পূর্বে তিনি ঢাকা-মিউজিয়ামের শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে তাঁহার নিজের সংগৃহীত ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালা হইতে প্রাপ্ত প্রায় ১৫ খানা প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি মিলাইয়া "গোপালচরিত" নামক একখানা সংস্কৃত-কাব্য একটি পাণ্ডিত্য-পূর্ণ ভূমিকা-সহ সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। "গোপালচরিত" রচয়িতা যে কে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। কোন কোন প্রাচীন পুথিতে বৈষ্ণব-ধর্মের প্রবর্তক ও প্রচারক শ্রীচৈতন্যদেবকেই গ্রন্থকার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

তিনি একজন সুনিপুণ ভাষাবিদ্ ছিলেন। সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দী, মৈথিল, উর্দু এবং অল্প-বিস্তর ফার্সী, গুজরাটী ও ওড়িয়া ভাষা তিনি জানিতেন। প্রসিদ্ধ বিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের "বাঙ্গালা-শব্দকোষ" এবং শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের" সমালোচনায় তিনি তাঁহার ভাষাতত্ত্বজ্ঞানের বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন ["বাঙ্গালা শব্দকোষ (সমালোচনা)" ১৩২৩ বঙ্গাব্দের এবং "চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" ১৩২৫ বঙ্গাব্দের পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।] শব্দকোষের সমালোচনা উপলক্ষ্যে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় এবং বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মে। তরুণ ভাষাতত্ত্ববিদ্গণের মধ্যে তিনি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এবং ডক্টর মৌলভী মুহম্মদ্ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের গবেষণার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবু তাঁহার "Origin and Development of the Bengali Language" নামক অমূল্য গ্রন্থের দুই খণ্ড তাঁহাকে সাদরে উপহার দেওয়ায় তিনি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, এবং অবকাশ পাইলেই উক্ত গ্রন্থের বিশদরূপে আলোচনা করিয়া কয়েকটি প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় লিখিবেন, এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

যৌবনের প্রারম্ভে ঐতিহাসিক গবেষণা এবং প্রত্নতত্ত্বের দিকে তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। প্রায় ৩৪ বৎসর পূর্বে "রত্নাবলী-রচয়িতা শ্রীহর্ষ" নামক একটি সুদীর্ঘ মৌলিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ তিনি তৎকালের সুপ্রসিদ্ধ "সাহিত্য" পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ঐ প্রবন্ধটি ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া Asiatic Societyর পত্রিকায় প্রকাশিত করিবার জন্য তিনি তাঁহার বন্ধুগণ কর্তৃক পুনঃপুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ব-বিষয়ে মাসিক পত্রাদিতে কোন প্রবন্ধ না লিখিলেও, এ সম্বন্ধে যে তিনি অনেক পড়াশুনা করিয়াছিলেন, তাহা ভারতবর্ষের হিন্দুধর্ম-মন্দির বিষয়ক তাঁহার স্বহস্ত লিখিত নোটে ভরা কয়েকখানা পুরাতন খাতা দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছি।

চিত্রবিদ্যা ও ভাস্কর-শিল্পের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। ইউরোপের প্রাচীন ও আধুনিক শ্রেষ্ঠ চিত্রকরদিগের চিত্রাবলী এবং গ্রীক্ ও রোমান্ ভাস্কর-শিল্প বিষয়ক সচিত্র বহু গ্রন্থ তিনি অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ ইটালী-দেশীয় স্থপতি ও চিত্রকর Giorgio Vasari প্রণীত Lives of the most excellent Painters, Architects and Sculptors নামক বিখ্যাত বই তিনি কলিকাতার Imperial Library-তে বসিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া পড়িয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ চিত্রকর Hogarth-এর সামাজিক বিদ্রূপমূলক Prints বা চিত্রাবলীরও তিনি Imperial Libraryতে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে অনুশীলন করিয়াছিলেন। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সুযোগ্য শিষ্যগণ কর্তৃক প্রবর্তিত প্রাচীন ভারতীয় চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির তিনি অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন এবং অবনীন্দ্র-নাথ লিখিত কলাবিষয়ক প্রবন্ধাদি তিনি অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতেন। প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতির প্রতি তাঁহার একান্ত অনুরাগের ফলে লাহোর গবর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজের সুযোগ্য সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় এবং পত্রব্যবহার হয়। শেষ হিন্দুরাজা লক্ষ্মণসেনের সময়ের অর্থাৎ মুসলমানগণ কর্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের অব্যবহিত পূর্বের সাহিত্য ও শিল্পকলার নিদর্শন-সমূহের বিশদরূপে পর্যালোচনা করিয়া তৎকালীন বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিহাস বিষয়ক কয়েকটি অপূর্ব মৌলিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ তিনি বহু-

দিন পূর্বে ঢাকা হইতে প্রকাশিত 'ঢাকা-রিভিউ ও সম্মিলনী' পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

তিনি ইংরাজীতে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং ইংরাজী সাহিত্যে তাঁহার অসামান্য অধিকার ছিল। Chaucer হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশ শতাব্দীর Hardy, H. G. Wells, Bernard Shaw, Galsworthy প্রমুখ অতি আধুনিক লেখকদিগের রচনাও তিনি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমালোচনামূলক প্রবন্ধাদিতে তিনি তাঁহার ইংরেজী সাহিত্যে গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। ইহা ব্যতীত অনুবাদের সাহায্যে গ্রীক, ল্যাটীন্, ফরাসী, ইটালিয়ান, জার্মান এবং রাসিয়ান প্রভৃতি সাহিত্যের লেখকগণের রচনা তিনি অত্যন্ত মনোযোগপূর্বক অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ফরাসী কথা-সাহিত্যের তিনি অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। George Sand, Balzac, Gautier, Dautet, Flaubert, Maupassant, Hugo, Zola, Anatole France প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ফরাসী কথা-সাহিত্যিকদের রচনা তিনি আদ্যোপান্ত পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াছেন। George Sandএর Consuelo তাঁহার অতি প্রিয় বই ছিল। কলিকাতার Imperial Library-তে বসিয়া তিনি Balzacএর উপন্যাস-সমূহের সুপ্রসিদ্ধ 'Comedie Humaine' নামক বিরাট-সংগ্রহ আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছিলেন। Montaigne এবং Sainte-Beauveএর রচনাবলী তাঁহার অতি প্রিয় পাঠ্য ছিল। ফরাসী-সাহিত্যের উপর তাঁহার এত বেশী অনুরাগ ছিল যে, তাঁহার মৃত্যুর প্রায় ৪।৫ বৎসর পূর্বে তিনি ফরাসী ভাষা শিখিবেন, এরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং কলিকাতা হইতে তাঁহার জন্য প্রথম শিক্ষার্থীদের উপযোগী পাঠ্য বই এবং একখানা ভাল ফরাসী-ইংরেজী অভিধান কিনিয়া পাঠাইতে তাঁহার পুত্রকে বলিয়াছিলেন। তিনি Maupassant-রচিত কয়েকটি ছোট গল্পের অনুবাদ করিয়া এক বন্ধুর অনুরোধে মাসিক পত্রে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। জার্মান কবি গেটের (Goethe) তিনি অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন।

Eckermannএর 'Conversation witn Goethe' তাঁহার অতি প্রিয় বই ছিল। আলোকসামান্য প্রতিভা, লোকোত্তর কবিত্ব এবং বহুদর্শিতা প্রভৃতি বিষয়ে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে তিনি Goethe-এর সহিত তুলনা করিতে ভালবাসিতেন।

Goethe ও রবীন্দ্রনাথের এইরূপ তুলনা-মূলক সমালোচনা, আমাদের দেশে কেহই করেন নাই বলিয়া তিনি প্রায়ই দুঃখ করিতেন এবং পদাবলী-সাহিত্য-প্রকাশ কার্য হইতে অবসর পাইলেই রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে বিশদরূপে আলোচনা করিবেন, এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

অবসর পাইলেই আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্য, বিশেষতঃ বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা ছিল। তরুণ লেখক ও লেখিকাদের রচনা তিনি আগ্রহ সহকারে পড়িতেন। লেখিকাদিগের মধ্যে শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী এবং প্রসিদ্ধ 'প্রবাসী'পত্রিকার প্রবীণ সম্পাদক মহাশয়ের কন্যাদ্বয় শ্রীযুক্তা সীতা ও শান্তা দেবীর উপন্যাসগুলির তিনি প্রশংসা করিতেন।

রচনা-রীতি প্রভৃতি বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে তিনি স্বীয় আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতি বাল্যকাল হইতেই তিনি বঙ্কিম-সাহিত্যের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। তাঁহার চরিত্র ও রচনা-রীতির উপর বঙ্কিম সাহিত্যের প্রভাব অতি সুস্পষ্টরূপে লক্ষিত হয়।

সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি ছাড়া জ্যোতিষ ও সঙ্গীত শাস্ত্রেও তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। তিনি প্রায় সমস্ত জীবনই, অবসর সময়ে ফলিত জ্যোতিষের চর্চা করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ সুদীর্ঘ কাল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতে ফলিত জ্যোতিষের আলোচনার ফলে, তিনি যে সকল মূল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, সেগুলি অবসর পাইলে প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করিবেন, তাঁহার এরূপ ইচ্ছা ছিল। তাঁহাকে শঙ্করাচার্য, নেপোলিয়ান, কাইজার, বিবেকানন্দ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির কোষ্ঠীবিচার করিতে দেখিয়াছি।

সঙ্গীতে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ও বুৎপত্তি ছিল। তিনি একজন উচ্চদরের মৃদঙ্গ ও তবলা বাদক ছিলেন।

কলিকাতায় পাঠ্যাবস্থাতেই তিনি তৎকালের সুপ্রসিদ্ধ মৃদঙ্গ-বাদক মুরারিবাবুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট মৃদঙ্গ শিখিতে আরম্ভ করেন। ইহা ছাড়া কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীতের চর্চাও তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া করিয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্তৃক সংগঠিত এক সঙ্গীত সম্মিলনীতে সভ্য হইয়া তিনি কিছুদিন নিয়মিতরূপে 'সঙ্গত' অভ্যাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পুস্তক-সংগ্রহের মধ্যে 'মৃদঙ্গ-মঞ্জরী'.

'সেতার শিক্ষা' ও সঙ্গীত বিষয়ক বহু বই দেখিয়াছি। তাঁহার নিজ হাতে লেখা মৃদঙ্গের 'বোল'-ভরা বহু পুরাতন নোটবই তাঁহার কাগজ-পত্রের মধ্যে দেখিয়াছি। তাঁহার সমসাময়িক বহু শ্রেষ্ঠ গায়ক ও বাদকের কথাও আমরা তাঁহার মুখে শুনিয়াছি। সাহিত্যামোদী ও সঙ্গীতজ্ঞ নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত 'সঙ্গীত-রাগ-কল্পদ্রুম' নামক সুবৃহৎ সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থ (Encyclopædia) তিনি আদ্যোপান্ত অভিনিবেশ সহকারে নোট করিয়া পড়িয়াছিলেন।

প্রাচীন ও মধ্য যুগের ইংরেজী কবিতার আলোচনা করিতে হইলে যেরূপ অল্প-বিস্তর ছন্দঃশাস্ত্রের জ্ঞান আবশ্যক, সেইরূপ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আলোচনা করিতে হইলেও, ভাল রকম ছন্দঃশাস্ত্রে জ্ঞান, একরকম অপরিহার্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সঙ্গীতে অসাধারণ বুৎপত্তি হেতু ছন্দঃশাস্ত্রে তাঁহার অসামান্য অধিকার ছিল। পদাবলী ও প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আলোচনা বিষয়ক প্রবন্ধাদিতে তিনি সর্বদাই তাঁহার গভীর ছন্দজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন।

তাঁহার এইরূপ অগাধ পাণ্ডিত্য ও বহুদর্শিতার সহিত সততা, বিনয় ও সহৃদয়তা প্রভৃতি বিবিধ গুণরাজির সমাবেশের ফলে, এক অপূর্ব মণি-কাঞ্চন সংযোগ ঘটিয়াছিল। তিনি যৌবনের প্রারম্ভে বঙ্কিমের অনুকরণে কাব্য-উপন্যাস লিখিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, কিন্তু অল্প দিনের চেষ্টার পরেই তিনি ইহা বুঝিতে পারেন যে ঐরূপ শ্রেষ্ঠ মৌলিক সাহিত্য রচনার উপযুক্ত প্রতিভা তাঁহার নাই এবং তদবধি তিনি কেবল পদ্যানুবাদ ও প্রাচীন সাহিত্যের অনুশীলন ও বিচার-কার্যেই ব্যাপৃত রহেন। পদ্যানুবাদে তাঁহার কৃতিত্ব তাঁহার 'মেঘদূত', 'গীত-গোবিন্দ' ও "রস-মঞ্জরী'র পাঠক মাত্রেই সম্যকরূপে অবগত আছেন।

তাঁহার পদাবলী সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধাদিতে তিনি সর্বত্রই তাঁহার পূর্ববর্তিগণের যিনি যাহা কিছু করিয়াছেন, তাহার সশ্রদ্ধ উল্লেখ করিয়াছেন। সত্যের অনুরোধে, কাহারও সহিত কোনও মতভেদ উল্লেখ করিতে বা কাহারও কোন ভ্রম-প্রমাদ প্রদর্শন করিতে যাইয়া তিনি কখনও তাঁহার স্বভাব-সুলভ বিনয় ও সৌজন্য পরিত্যাগ করেন নাই। "অকরণাৎ মন্দকরণমপি শ্রেয়ঃ"— তিনি সর্বদাই এই মহৎ নীতির অনুসরণ করিয়া

তাঁহার পূর্বে যাঁহারা পদাবলী-সাহিত্যের সম্পাদন ও কিছুমাত্রও আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, সর্বত্রই অকুণ্ঠিতচিত্তে তাঁহাদিগের প্রাপ্য ন্যায্য প্রশংসা তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা সহকারে অর্পণ করিয়াছেন। এস্থলে সত্য ও সম্পূর্ণতার অনুরোধে, ইহাও বলা আবশ্যক মনে করি যে, তিনি কেবল তাঁহার পূর্ববর্তিগণের সশ্রদ্ধ আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত রহেন নাই, তাঁহার সমসাময়িক বহু প্রবীণ ও তরুণ লেখকদিগের গবেষণারও তিনি সর্বত্রই শ্রদ্ধা ও সৌজন্য সহকারে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি কখনও কেবল নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করিবার জন্য কোনও বিশেষ একটি মতের সমর্থন করেন নাই,—সর্বত্রই তিনি যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তাহা প্রমাণ ও সুযুক্তি সহকারে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিতেন মাত্র। ভ্রম-প্রমাদ হওয়া মানুষ মাত্রেরই স্বাভাবিক। নিজের সিদ্ধান্তটিকেই একমাত্র সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে চোখ-কান বুজিয়া বসিয়া থাকা অথবা বিদ্রূপ করিয়া অপরের সিদ্ধান্ত বা মতকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টার ন্যায় মনের সংকীর্ণতা তাঁহার ছিল না।

সমালোচনা ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় বিষয়ে তিনি বঙ্কিম-প্রদর্শিত আদর্শেরই অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমের উত্তররামচরিতের এবং স্বর্গীয় ভূদেববাবুর রত্নাবলীর সমালোচনা, তিনি তাঁহার সমালোচনার আদর্শ-রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদিগকে কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন। ইংরেজী সমালোচনাত্মক সাহিত্যের সহিতও তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল, এবং তিনি তাঁহার লেখার বহু স্থলে প্রসিদ্ধ ইংরেজ সমালোচক Mathew Arnold-এর মতের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

তিনি সুরসিক ও পরিহাসপ্রিয় ছিলেন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহাকে অনেক পত্রেই "রসিকবরেষু" এইরূপ পাঠ লিখিতেন। নীরস ভাষাতত্ত্বের আলোচনাকেও অত্যন্ত সরস ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিতে তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল।

আমরা অতঃপর তাঁহার চরিত্র ও ধর্মমত সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলিয়া আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

তাঁহার ন্যায় বিবিধ সদ্‌গুণবিশিষ্ট ব্যক্তি প্রায় সচরাচর দৃষ্ট হয় না বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তাঁহার সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্পদ ছিল—তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র। তাঁহার চরিত্রে অহঙ্কার ও আত্মাভিমানের

লেশমাত্রও ছিল না। অশেষ জ্ঞানী হইয়াও তিনি বিনয়ের প্রতিমূর্তি ছিলেন। জীবনে কখনও তাঁহাকে ক্রোধ, লোভ, হিংসা প্রভৃতি রিপুর বশবর্তী হইতে দেখি নাই। তিনি এরূপ ধীর প্রশান্ত প্রকৃতির ছিলেন যে, তাঁহাকে দর্শনমাত্রই মনে শ্রদ্ধার উদয় না হইয়া পারিত না। দয়া, ক্ষমা ও সহনশীলতা তাঁহার চরিত্রের বিশিষ্ট গুণ ছিল। তাঁহার চরিত্রে এরূপ একটি স্বাভাবিক মাধুর্যগুণ ছিল যে, সম্পূর্ণ অনাত্মীয় ব্যক্তিকেও তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অত্যন্ত আপনার করিয়া লইতে পারিতেন। তিনি অত্যন্ত অনাড়ম্বর ছিলেন। বহু খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান হইতে তাঁহাকে 'কাব্যবিনোদ' 'সাহিত্যরত্ন' 'সাহিত্য-শাস্ত্রী' 'কবিভূষণ' প্রভৃতি উপাধি দেওয়ার বহু প্রস্তাব তিনি বিনয়ের সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। পূজনীয় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার নিকট লিখিত এক পত্রে তাঁহাকে 'পদাবলী-মথক' বা ঐরূপ অন্য কোনও উপাধি গ্রহণ করিতে না দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সতীশচন্দ্র রায় রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলী ও প্রবন্ধাদি

প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। "শ্রীশ্রীপদকল্পতরু" — ভারতীয়-গ্রন্থ প্রচার সমিতি, কলিকাতা, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ।

২। "মেঘদূত"—সুললিত পদ্যানুবাদ।

৩। "শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ" (সচিত্র)—সুদীর্ঘ ভূমিকা, সংস্কৃত মূল, পুজারি গোস্বামীর টীকা, সুললিত পদ্যানুবাদ ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা সম্বলিত, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ।

৪। 'রস-মঞ্জরী'—বিস্তৃত ভূমিকা, সূচী ও ব্যাখ্যা সম্বলিত সুললিত পদ্যানুবাদ, ১৩২০ বঙ্গাব্দ।

৫। 'সূর্য্যশতক'—ভূমিকা, সংস্কৃত মূল, স্ব-রচিত 'সরলা' নাম্নী টীকা, পদ্যানুবাদ ও ব্যাখ্যা-সম্বলিত (অসম্পূর্ণ)।

৬। 'অপ্রকাশিত-পদ-রত্নাবলী'—সুবিস্তৃত ভূমিকা, বিষয়-সূচী, পদ-সূচী, দুরূহ স্থলে পাদ-টীকা ও অর্থ-প্রয়োগ-সম্বলিত সুবৃহৎ শব্দ-সূচী সহ বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ পদ-কর্তার ও ২৮ জন

অজ্ঞাত-পূর্ব পদ-কর্তার ৬০০ শতের অধিক উৎকৃষ্ট, অপ্রকাশিত ও নবাবিষ্কৃত পদাবলীর সংগ্রহ, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ।

৭। বিদ্যাপতি বিচার। নিবন্ধ। সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শীত, ১৩৬৭। ১০৭-২৪৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয় এবং পরে তাহা পুস্তকাকারেও গ্রথিত হয়। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের এই নিবন্ধাবলী ধারাবাহিকভাবে পূর্বে শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত 'সোনার গৌরাঙ্গ' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র ভবানীচরণ রায় এই নিবন্ধমালা সংগ্রহ করিয়া 'সাহিত্য পত্রিকায়' প্রকাশ করেন।

৮। বিদ্যাপতি-পদ্য-সংগ্রহ। প্রকাশক : হিন্দী-সাহিত্য সম্মেলন, এলাহাবাদ। ইহা বিদ্যাপতি সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধ পুস্তক। নাগরী লিপিতে প্রকাশিত বিদ্যাপতি-পদাবলীর সম্পাদকদের ভুলগুলি ইহাতে আলোচনা করা হইয়াছে। ইহা লেখকের জীবদ্দশায় প্রকাশিত।

সম্পাদিত গ্রন্থাবলী

১। "শ্রীশ্রীপদকল্পতরু"—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত।
১ম খণ্ড, ১৩২২ বঙ্গাব্দ ; ২য় খণ্ড, ১৩২৫ বঙ্গাব্দ ;
৩য় খণ্ড, ১৩৩০ বঙ্গাব্দ ; ৪র্থ খণ্ড, ১৩৩৪ সন,
৫ম খণ্ড, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ।

২। ভবানন্দের 'হরিবংশ'—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ।

৩। 'নায়িকারত্ন-মালা'—'ভক্তিপ্রভা' প্রেস, আলাটী (হুগলী) হইতে। শ্রীযুক্ত মধুসূদন অধিকারী কর্তৃক প্রকাশিত। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ।

৪। "গোপাল-চরিতম্" (সংস্কৃত-কাব্য) সুবিস্তৃত ভূমিকা সম্বলিত। (অপ্রকাশিত)

প্রকাশিত প্রবন্ধাদি
(বাঙ্গালা)

১। 'রত্নাবলী-রচয়িতা শ্রীহর্ষ' — সাহিত্য, ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ১৩০৪ বঙ্গাব্দ।

২। 'প্রাচীন পদাবলীর পাঠ-ভেদ'—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৫ শ ভাগ, ৩য় সংখ্যা, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ।

৩। 'প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃকগণ'—(সুদীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধ) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৬শ ভাগ, ২য় সংখ্যা; ১৮শ ভাগ, ২য় সংখ্যা; ২০শ ভাগ, ২য় সংখ্যা; ১৩১৬, ১৩১৮, ১৩২০ বঙ্গাব্দ।

৪। "লক্ষণসেনের সময়ে বঙ্গের অবস্থা'—মুসলমানগণ কর্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের অব্যবহিত পূর্বের সাহিত্য ও শিল্পকলার নিদর্শনসমূহ বিশদরূপে পর্যালোচনা করিয়া তৎকালের সামাজিক অবস্থা বিষয়ক প্রবন্ধ, ১৪৩ পৃঃ—ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনী, ১৩২১ বঙ্গাব্দ।

৫। 'নিমানন্দ দাসের পদ-রস-সার'—(পাবনা উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম-অধিবেশনে পঠিত) সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ২১শ ভাগ, ১ম সংখ্যা, ১৩২১ বঙ্গাব্দ।

৬। 'অজ্ঞাতপূর্ব পদকর্তৃকগণ—(ধারাবাহিক প্রবন্ধ) শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা, ৩০শে পৌষ, ৪২৯ গৌরাঙ্গাব্দ (১৩২১ বঙ্গাব্দ)।

৭। 'নবাবিষ্কৃত শ্রীগৌরাঙ্গপদাবলী'—(ধারাবাহিক প্রবন্ধ) শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা, ৭ই মাঘ, ৪২৯ গৌরাঙ্গাব্দ (১৩২১ বঙ্গাব্দ)।

৮। 'জ্ঞানদাসের পদাবলী'—জ্ঞানদাসের পদাবলীর পাঠ-বিচার (রাজসাহী, উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলেনের ৮ম অধিবেশনে পঠিত) সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ২২শ ভাগ, ৩য় সংখ্যা, ১৩২২ বঙ্গাব্দ।

৯। 'বৈষ্ণব-পদাবলীর রস-বৈচিত্র্য'—(সুদীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধ) ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনী, অগ্রহায়ণ ও মাঘ, ১৩২২ বঙ্গাব্দ।

১০। "বাঙ্গালা শব্দকোষ"—সমালোচনা (বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলনের ৮ম-অধিবেশনে পঠিত) সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ।

১১। "অজ্ঞাত পদকর্তৃগণ"—(সুদীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধ) ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনী, কার্তিক ও পৌষ, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ; বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ, ভাদ্র, ও আশ্বিন (যুগ্ম-সংখ্যা), কার্তিক ও অগ্রহায়ণ (যুগ্ম-সংখ্যা), ১৩২৪ বঙ্গাব্দ।

১২। "বৈষ্ণব-কবিতা"—সমালোচনা (বগুড়া, উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের দশম-অধিবেশনে পঠিত) নারায়ণ, ১৩২৪ সন।

১৩। "চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"—সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ২৫শ ভাগ, ৩য় সংখ্যা, ১৩২৫ বঙ্গাব্দ।

১৪। "ভবানন্দের মহাকাব্য হরিবংশ"—(সুদীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধ) ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনী, ফাল্গুন ও চৈত্র (যুগ্ম-সংখ্যা) এবং তাহার পরের সংখ্যা, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ।

১৫। "মহাকবি কালিদাস কি বাঙ্গালী ?"—(সুদীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধ) ভারতবর্ষ, পৌষ, ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩৩০ বঙ্গাব্দ।

১৬। "বৈষ্ণব-পদাবলীর রসাস্বাদন"—[গোবিন্দদাস] (সুদীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধ) প্রাচী, চৈত্র, ১৩৩০ বঙ্গাব্দ;
বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ।

১৭। "হিন্দী সাহিত্যে বিহারীলালের সতসঈ"—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ।

১৮। "পূর্ববঙ্গের কবি-শ্রেষ্ঠ ভবানন্দের হরিবংশ"—(মুন্সীগঞ্জ-বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের-ষোড়শ-অধিবেশনে সাহিত্য-শাখায় পঠিত), সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ।

১৯। "গোবিন্দদাসের পদাবলীর রসাস্বাদন"—(সুদীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধ), সোনার গৌরাঙ্গ, ৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ; সাধনা (কুমিল্লা হইতে প্রকাশিত), ১ম বর্ষ, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, কার্তিক, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ।

২০। 'বিদ্যাপতি-বিচার'—[সুদীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধ]
সোনার গৌরাঙ্গ; শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত, ৩য় বর্ষ—আষাঢ়, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ। ৪র্থ বর্ষ—বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ, আশ্বিন, কার্তিক, মাঘ, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ।
৫ম বর্ষ—বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ;
৬ষ্ঠ বর্ষ—বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, চৈত্র, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ।
৫ম বর্ষ—কার্তিক, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ।

২১। 'মহাকবি রামানন্দ রায়ের পদ'—সোনার গৌরাঙ্গ ৩য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ।

২২। "মহাকবি গোবিন্দদাস কি মৈথিল ?"
— (বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের বীরভূম অধিবেশনে পঠিত)
ভারতী, আষাঢ, শ্রাবণ, ভাদ্র, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ।

২৩। 'জ্ঞানদাসের পদাবলীর রসাস্বাদন' (সুদীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধ)
সোনার গৌরাঙ্গ, ভাদ্র, অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ।
বৈশাখ, ভাদ্র, পৌষ, মাঘ, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ।
শ্রাবণ, ভাদ্র, পৌষ, চৈত্র, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ।
শ্রাবণ, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ।

২৪। "অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী-সম্পাদকের নিবেদন"
[চণ্ডীদাস-সমস্যা বিষয়ক] শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় লিখিত "অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী" নামক প্রবন্ধের উত্তরে লিখিত। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ।

২৫। "মহাকবি সুরদাসের পদাবলী"— (হিন্দী সাহিত্য বিষয়ক সুদীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধ)
কমলা, ৩য় বর্ষ, শ্রাবণ, আশ্বিন ও কার্তিক, ফাল্গুন, চৈত্র।

২৬। "বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রমাণিক সংস্করণ"— (সুদীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধ) পঞ্চপুষ্প—আষাঢ়, শ্রাবণ, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ।

২৭। "দ্বিজরঘুনাথের সত্যনারায়ণের পুথি"— সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৪।

২৮। 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন" সম্বন্ধে বক্তব্য—সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ১৩৩৭॥

২৯। 'বাঙ্গলা ভাষায় অনুজ্ঞা' (শহীদুল্লাহ্) প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা। সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ১৩২৫।

হিন্দী

১। "বিদ্যাপতি কে বিষয় মেঁ হমারা নম্র নিবেদন"—
মুজঃফরপুর হইতে প্রকাশিত "লেখ-মালা' নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকার "বিদ্যাপতি-অঙ্কে" প্রকাশিত, লেখ-মালা, গুচ্ছ ১, পুষ্প ৪, বসন্তোৎসব, ১৯৮৪।

২। 'বিদ্যাপতি কে উপর হিন্দী সংসার কা অনাদর ঔর উস্ কা সংশোধন"—
ভরতপুর হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে পঠিত এবং প্রয়াগের (হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন কর্তৃক 'বিদ্যাপতি ঔর উনকী কবিতা'—এই পরিবর্তিত নামে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত।

৩। 'বিদ্যাপতি সঞ্জীবনী সমিতি'—বিশাল ভারত, কলিকাতা, অক্টোবর, ১৯২৯।

৪। 'অলঙ্কার ঔর কবিতা'—(ধারাবাহিক প্রবন্ধ), সম্মেলন-পত্রিকা, প্রয়াগ, শ্রাবণ, ভাদ্রপদ, সংবৎ ১৯৮৩ বিং।

৫। 'রাষ্ট্র-ভাষা হিন্দী'—মনোরমা, এলাহাবাদ।

৬। 'বঁগলা সাহিত্য কে ক্রম-বিকাশকা দিগদর্শন'—সুধা,লক্ষ্ণৌ, সাহিত্যাঙ্ক ১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা।

৭। 'মহারাণী অহল্যা বাঈ ঔর রাণী ভবানী'—বীণা, ইন্দোর (মধ্যভারত), অহলাঙ্ক, ভাদ্রপদ, সংবৎ ১৯৮৭, বর্ষ ৩, অঙ্ক ১১।

বৈষ্ণব-সাহিত্যের নিরলস গবেষক ও মহাপণ্ডিত সতীশচন্দ্র রায়ের জন্মশতবার্ষিকী দু-একটি পত্রিকায় যথাসময়ে উল্লেখিত হলেও একান্ত নিরবতার মাঝেই অতিক্রান্ত, এজন্য আমরা যারপরনাই দুঃখিত। বিলম্বে হলেও সতীশচন্দ্রের গবেষণা ও সাহিত্যকর্মের যথাযোগ্য মূল্যায়নের পথ প্রসস্ত করার জন্য আমরা বর্তমান নিবন্ধটি প্রকাশ করলাম। সতীশচন্দ্রের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশার্থে আহূত ১৩৩৮, ৩১শে শ্রাবণ তারিখে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে রায়মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র ভবানীচরণ রায় একটি রচনা পাঠ করেন। বর্তমান নিবন্ধটি তারই পরিবর্তিত সংস্করণ। ডঃ মহাদেব প্রসাদ সাহা রচনাটি সংগ্রহ করে দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রেখেছেন। গ্রন্থ-তালিকাটিও তিনি সংশোধন করে দিয়েছেন।—সঃ চ

দেশে বিদেশে ভারত-বিদ্যাচর্চা (২)

নেদারল্যাণ্ডসে ভারত-বিদ্যাচর্চা

শিবদাস চৌধুরী

এক

পাশ্চাত্য দেশের সংগে ভারতের যোগাযোগ বহু শতাব্দীর। তার পরিচয় রয়েছে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে, প্রাচীন সাহিত্য ও লোককথাতে। গ্রীক রাষ্ট্রদূত মেগাস্থিনিসের (খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতক) ভারত বিবরণ আমরা প্রায় সকলেই জানি। সপ্তদশ শতক থেকে ভারতকে নতুন ভাবে জানবার ও ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞানের মূল্যায়ন করবার বাসনা ইউরোপে জেগে ওঠে। ইউরোপীয় বণিক, পরিব্রাজক ও ধর্মযাজকগণ ভারতে এসে এই দেশের ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম ও রীতিনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও সাহিত্যিকদের দৃষ্টি আকর্ষণকারী ইউরোপীয় মনীষীদের অন্যতম হলেন উইলিয়ম জোন্স। তিনি চিরাচরিত গবেষণা পদ্ধতির পরিবর্তে ঐতিহাসিক পদ্ধতির সূচনা করেন। উনবিংশ শতকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের উৎসাহ ও নৈপুণ্য সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় যুগান্তর আনে। ঐতিহাসিক পদ্ধতি ছাড়া তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি তাঁরা প্রবর্তন করেন।

ভারতীয় সাহিত্য, ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে ইউরোপের বহুমুখী গবেষণার পূর্ণ পরিচয় দেওয়া একটি প্রবন্ধে সম্ভব নয়। তাই বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলের ভারতীয় সভ্যতার মূল্যায়নে যে অবদান রয়েছে তার একটির (অর্থাৎ হল্যাণ্ডের) গবেষণার ধারার উল্লেখ করব।

গত শতকের শেষ ভাগে ডাচ পণ্ডিতদের ভারত-বিদ্যাচর্চার ইতিহাসে অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। কার্ণ (১৮৩৩-১৯১৭) যে দীপশিখা প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন তা আজও তাঁর উত্তরসূরীরা সমুজ্জ্বল রেখেছেন। ভারত-

তত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান কেন্দ্রসমূহের নিঃশুল্ক গ্রন্থাগারগুলি বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। এদের দ্বার সকল অনুসন্ধিৎসুদের জন্য উন্মুক্ত। ফোগেল স্থাপিত 'কার্ণ ইনৃষ্টিট্যুট ও উট্রেক্টে কালাণ্ডের নামাঙ্কিত বেদকক্ষ ভারত-তত্ত্ববিদ্‌দের তীর্থস্থান। তা ছাড়া আরও গ্রন্থাগার রয়েছে। নেদারল্যাণ্ডসে প্রায় সর্বত্রই অল্প সময়ে যাতায়াত করা যায়। এ অবস্থা কাজের' অনুকূল।

দুই

জোন্সের বহুপূর্ব থেকেই ইউরোপ ভারতীয় জীবনযাত্রা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিল। যারা ভাঁরতের কথা ইউরোপে প্রচার করেন তাদের অনুসন্ধানের মূলে ছিল ঔৎসুক্য। সেই বাণী প্রচারকদের পুরোধাতে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে ওলন্দাজদের অবদান স্মরণীয়। ১৬০৯ খৃঃ কুলিকটে ডাচ বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয়। তখন থেকেই ডাচেরা ভারতের সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়। সপ্তদশ অষ্টদশ শতকে বণিকদের সঙ্গে ধর্মপ্রচারকেরা এদেশে আগমন করেন; তাঁদের অনেকেই হিন্দুদের ধর্ম কর্ম, সাহিত্য ও ভাষা সম্বন্ধে লিখেছেন। আব্রাহাম রোজারিয়স নামে একজন ওলন্দাজ যাজক ও ধর্মপ্রচারক করমণ্ডল (চোলমণ্ডল) উপকূলে মাদ্রাজের নিকটে বসবাস করতেন। এদেশে তিনি সতের বৎসর (১৬৩০-৪৭) ছিলেন। খুব জনপ্রিয় হওয়ায় তিনি সহজেই স্থানীয় লোকদের আচার-ব্যবহার, সাহিত্য, পুজা পার্বণ, প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হন। এখানে পদ্মনাভ নামে এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁর খুব ঘনিষ্ঠতা হয়; তাঁরই সাহায্যে সংস্কৃত গ্রন্থের তিনি অনুবাদ করেন। তাঁর রচিত (১৬৫১ খৃঃ প্রকাশিত) গ্রন্থে, ব্রাহ্মণদের জীবনযাত্রা, রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, ধর্ম, পুজাপার্বণ, পরকালতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের কথা রয়েছে। ব্রাহ্মণদের জ্ঞানের গভীরতা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। বেদের চারি শাখার কথা ইউরোপে প্রচার এবং সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথম ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদ তাঁরই কৃতিত্ব। ভর্তৃহরির বৈরাগ্য শতক ও নীতি-শতকের এবং তামিল বৈষ্ণব গাথার অনুবাদ তিনিই করেছিলেন। বার্ণাল সাহেব (১৮৯৮ সালে) হিন্দুধর্মের উপরে তাঁর বর্ণনাকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।[১] তাঁর উক্তিতে ভুল ভ্রান্তি থাকা সত্ত্বেও ইউরোপে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচারকদের তিনি পথিকৃৎ। তাঁর পুস্তক ইউরোপের বিভিন্ন

ভাষায় অনূদিত হয়। এই বইটি ও অন্যান্য গ্রন্থ ইউরোপের সুধী সমাজে ভারত সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা জাগরিত করে এবং ইউরোপের বাহিরেও যে প্রাচীন ও বিরাট ঐতিহ্যপূর্ণ দেশ রয়েছে সে বিষয়ে সকলকে সচেতন করে।[২]

এই দুই শতাব্দীতে ভারত সম্বন্ধে বহু তথ্য ডাচদের বিবরণী থেকে জানা যায়। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত মৌলিক চিন্তা ধারা তখনও অনুসৃত হয়নি। তাঁদের অনেকেই তামিল, তেলেগু ও হিন্দুস্থানী জানতেন, কিন্তু সংস্কৃতের জ্ঞান একমাত্র কৃষকপুত্র বহু ভাষাবিদ্ ঘাগের (১৬৩৬-৯৪) ব্যতীত আর কারো ছিল বলে জানা যায় না। ঘাগের ডাচ কোম্পানীর কর্মচারী ছিলেন। করমণ্ডল উপকূলে ছিল তাঁর কর্মস্থল। এখানে তিনি দশ বৎসর ছিলেন (১৬৭০-৮০)। সেই সময়ে তিনি সংস্কৃত, তামিল ও তেলেগু ভাষা শিক্ষা করেন। তাঁর সংস্কৃত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় বিখ্যাত উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ রামফিয়াসকে লিখিত এক পত্র থেকে। জাভার 'কবি' ভাষা যে সংস্কৃত ও তামিল শব্দে পুষ্ট তা তিনি রামফিয়াসকে লেখেন; দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর কাগজপত্র সমস্তই নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

তাঁর পরে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্বন্ধে ডাচদের অনুসন্ধানস্পৃহা স্তিমিত হতে থাকে। ব্যবসা ও ধর্ম প্রচারের জন্য যতটুকু দরকার ততটুকুই তাঁদের এদেশের লোকের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। তাই উইলিয়ম জোন্সের প্রবর্তিত ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে যখন ইংলণ্ড, জার্মানী, ফ্রান্স, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে ভারতচর্চা আরম্ভ হয়ে গেল—হল্যাণ্ড তখনও সুপ্ত। উনবিংশ শতাব্দীতে লাইডেনে সর্বপ্রথম সংস্কৃত পড়াবার বন্দোবস্ত হয়। অধ্যাপক হামাকর সংস্কৃত পড়াতেন। তিনি তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও সংস্কৃত চর্চার সূচনা করলেন; তাঁর মৃত্যুর পরে হিব্রুর অধ্যাপক রুট-গারস্ (Rutgers) সংস্কৃত পড়াতেন। তাঁর এক কৃতী ছাত্র হেণ্ড্রিক কার্ণ হল্যাণ্ডে সংস্কৃতচর্চার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে তিনি যে দীপশিখা প্রজ্জ্বলিত করেছেন তা আজও সেখানে অনির্বাণ রয়েছে। সংস্কৃতজ্ঞদের মধ্যে তিনি হলেন অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র। লাইডেনে পাঠ শেষ করে তিনি প্রখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ বেবারের নিকটে যান। তাঁরই পরামর্শে তিনি বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতার সংকলন ও অনুবাদ কার্যে মনোনিবেশ করেন। দেশে ফিরে

কিন্তু মনের মত কাজ পেলেন না। তাঁকে কলেজে গ্রীক্ পড়াতে হত; অবসর কাটাতেন সংস্কৃতচর্চা করে। হল্যাণ্ড তাকে গ্রহণ করবার জন্য তখনও প্রস্তুত হয় নাই। এই সময়ে তিনি কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের ডাচ ভাষায় অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ হল্যাণ্ডের বুদ্ধিজীবী মহলে আলোড়ন আনে। সংস্কৃতের অপূর্ব রত্নসম্ভার তাঁদের শ্রদ্ধা ও ঔৎসুক্য উদ্রেক করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা সেখানে সংস্কৃতের একটি অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করবার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হন। কিন্তু তাঁরা সফল হন নাই। হতাশ হয়ে কার্ণ লণ্ডনে আসেন। কিছুদিনের মধ্যে কাশীর কুইন্‌স্ কলেজে* অধ্যাপকের পদ পান†। দুই বৎসর তিনি কাশীতে ছিলেন। এখানে ভট্টকর্ণ নামেই তাঁর পরিচয় ছিল। একজন গুণমুগ্ধ ছাত্র তাঁর নামে একটি সংস্কৃত পদ্য রচনা করেছিলেন।

জয়তি জয়তি কর্ণঃ কৌমুদীশুভ্রবর্ণঃ।
খলভুজগসুপর্ণঃ শাস্ত্রদত্তৈক কর্ণঃ॥
জগদখিল সুবিদ্যাসিন্ধুনৌকর্ণধারঃ।
কৃতনিজগুণ সংখ্যাকর্ণ কীর্ত্তিপ্রহারঃ॥
সমাম্নাকূপারে প্রবমকৃতলিপ্সাঃ কবিগিরো
নিমজ্জন্তি ক্ষিপ্রংতব করুণয়া পশ্যসি যদা।
নিমগ্নোঽরং পারং ব্রজতি বিচিকিৎসার্ণবজলাদ্
অতঃ সেব্যোঽসি ত্বং কবিভিরথবা সংশয়গতৈঃ॥

ইতিমধ্যে হল্যাণ্ডের অনেক পরিবর্তন হয়। লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ এই সময়ে সৃষ্টি করা হয়। সেই পদে কার্ণ ১৮৬৫ সালে যোগদান করেন। ৪০ বৎসর শিক্ষকতা করে বহু ছাত্রকে ভারত-বিদ্যায় দীক্ষিত করেন। পরবর্তী কালে তাঁরা সকলেই পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর জীবন-সাধনা ছিল অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, অনুসন্ধান ও গ্রন্থরচনা। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী ও প্রবন্ধাদি সতের খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে তৎসম্পাদিত যোগযাত্রা, আর্যভটীয়, সানুবাদ সদ্ধর্মপুণ্ডরীকের সংস্করণ, জাতকমালার অনুবাদ, জাভার কবি ভাষায় রচিত রামায়ণ, মহাভারত ও নাগরকৃতাগমের

*বর্তমান বারাণসী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় † ১৮৬৩

সংস্করণ। বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, যাভার সাহিত্যে সংস্কৃতের প্রভাব ইত্যাদি। মৌলিক রচনার জন্য আমরা তাঁর নিকট ঋণী। আর্যভট্টীয় গ্রন্থখানি (১৮৭৪) হল্যাণ্ডে ছাপা প্রথম নাগরী অক্ষরের বই। এর পূর্বে ১৬৬৭ সালে আমাষ্টারডামে মুদ্রিত কিরচেরীর 'চায়না ইলাষ্ট্রাটা' গ্রন্থে নাগরী অক্ষরের নমুনা পাই।[৩]

তিন

কার্ণের শিষ্যদের মধ্যে জে এস স্পেয়ার (১৮৫৯-১৯১৩), উইলিয়ম কালাণ্ড (১৮৫৯-১৯৩২), সি এস উলেনব্যাক এবং জিন ফিলিপ ফোগেল (১৮৭১-১৯৫৮) সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য এবং পুরাতত্ত্ব ও আর্টের গবেষণার ইতিহাসের পাতাটি উজ্জ্বল করেছেন।

লাইডেনে কার্ণের উত্তরাধিকারী স্পেয়ার ভারতীয় দর্শন, সংস্কৃত সিনটেক্স এবং বৌদ্ধ-ধর্মে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাঁর সম্পাদিত অবদান-শতক, দিব্যাবদান, বুদ্ধ চরিত ও সৌন্দরনন্দ কাব্যে এবং অনূদিত জাতক-মালাতে নিষ্ঠা ও পাণ্ডিত্যের ছাপ রয়েছে। কথাসাহিত্যও তাঁর আলোচ্য বিষয় ছিল। এ বিষয়ে কথাসরিৎসাগরের উপরে তাঁর গ্রন্থখানিতে (১৯০৮) মৌলিক চিন্তাধারার সাক্ষ্য রয়েছে। উট্রেক্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের প্রথম অধ্যাপক কালাণ্ড ছিলেন বেদজ্ঞ। তাঁর মৃত্যুর পরে শোকসভাতে কালাণ্ডের পাণ্ডিত্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়।[৪] এই শোকসভা কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে অনুষ্ঠিত হয়। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড (রিচুয়্যাল) ও ঐতিহ্যের গবেষণা কার্যে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। প্রাচীন ভারতে পূর্বপুরুষের শ্রাদ্ধ ও তর্পণ (১৮৯০), ইন্দ্রজাল বিদ্যা (১৯০০) এবং মৃত্যু ও পরলোক বিষয়ে গ্রন্থত্রয়ে তাঁহার বিচার-বিশ্লেষণাত্মক সিদ্ধান্তের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৯৭ সালে তিনি বেদ-চর্চা আরম্ভ করেন। তাঁর সম্পাদিত ও অনূদিত বৈদিক গ্রন্থরাজির মধ্যে পাঁচখানি[৫] কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণের (১৯৩১) অনুবাদকে "triumph of scholar-ship" আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কল্পসূত্রের আপেক্ষিক কাল ও সামবেদের উৎপত্তি সম্বন্ধেও তাঁর গবেষণা উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক ফুকুসীমা বলেন—"no single scholar has ever contributed so much to the

comprehension of Samaveda literature" তাঁর কর্মময় জীবনালেখ্য ও গ্রন্থপঞ্জীর জন্য ডাচ রয়েল একাডেমি অফ সায়েন্সের বর্ষপঞ্জী (১৯০২—১৯০৩) দ্রষ্টব্য।•

আমষ্টারডাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের প্রথম অধ্যাপক উলেনব্যাক ফোনেটিক্সে (ধ্বনিতত্ব) বিশেষজ্ঞ ছিলেন। এই বিষয়ে তাঁর উপক্রমণিকা গ্রন্থ[৬] সংস্কৃতের ছাত্রদের অবশ্য পাঠ্য তালিকাভুক্ত। লাইডেনে সংস্কৃত ও পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ফোগেলের নাম ও কাজ এদেশে অপরিচিত থাকবার কথা নয়। শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক নাটকের উপরে তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য কাজ[৭] ; ডাচ ভাষায় তিনি এর অনুবাদ করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে 'ভারতীয় সাহিত্যে ও শিল্পে হংস' নামক পুস্তকটি প্রকাশিত হয়েছে। শিল্পবিদ্যা, পুরাতত্ত্ব, এপিগ্রাফি ও সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর রচনাবলী ভারত সভ্যতার ইতিহাস পুনর্গঠনের কাজে প্রভূত সাহায্য করেছে। ভারততত্ত্বের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ধারাবাহিক অনুশীলন চালাবার জন্য তিনি লাইডেনে কার্ণ ইনষ্টিট্যুট প্রতিষ্ঠা করেন (১৯২৫)। লাইডেনে ফোগেলের উত্তরাধিকারী হলেন কুইপার (F.B.J.K)। সংস্কৃতে মুণ্ডা শব্দ (১৯৪৮) এবং নহালী ভাষা সম্বন্ধে তাঁর গ্রন্থদ্বয় ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় যোজনা করেছে। ভাষাতত্ত্বে সুপণ্ডিত কুইপারের 'প্রাচীন ভারতে সংস্কৃত ভাষার উপরে অনার্য ভাষার প্রভাব' বিষয়ে গবেষণা উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় ধর্ম বিষয়েও তিনি আলোকসম্পাত করেছেন। বৈদিক ধর্মের বিকাশে মুণ্ডাদের দান ও প্রাগৈতিহাসিক ইন্দো-ইরাণী ধর্মের স্বরূপের উপরে তাঁর আলোচনা নতুন তথ্যের সন্ধান দিয়েছে। যে কয়জন মুষ্টিমেয় ইউরোপীয় পণ্ডিতের দ্রাবিড় ও মুণ্ডা ভাষাতে গভীর দখল রয়েছে তাঁদের মধ্যে তিনি অন্যতম।

উলেনব্যাকের পরে আমষ্টারডামের সংস্কৃতের অধ্যাপক হ'লেন যথাক্রমে বি-ফডেগণ ও এ. শার্পে। ফডেগণ ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। শঙ্করের গীতাভাষ্য ও কুন্দকুন্দের প্রবচনসার তিনি সম্পাদন করেছেন। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ও ভারতীয় সংগীতের উপরে তাঁর কাজে মৌলিকতা রয়েছে। ফডেগণের পূর্বে ক্রনিং ব্যতীত আর কেহ ভারতীয় দর্শনের উপরে কোন উল্লেখযোগ্য কাজ করেন নি। তিনি জার্মান পণ্ডিত ডয়সনের পূর্বে ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্যের আংশিক অনুবাদ করেছেন (১৮৭১)। সেই

দীপশিখা অনির্বাণ রেখেছেন অধ্যাপক বুইতানেন। রামানুজের গীতাভাষ্যের উপরে তাঁর কাজ রয়েছে। রামানুজের বেদার্থসংগ্রহ তিনি সম্পাদন ও অনুবাদ করেছেন। শার্পে ভারতীয় দর্শন, ব্যাকরণ এবং কাব্য চর্চা করেন; বাণের কাদম্বরীর উপরে তাঁর গ্রন্থ রয়েছে। কালিদাসের গ্রন্থাবলীর একখানি কোষগ্রন্থ রচনাকার্যে তাঁহার ধৈর্য, নিষ্ঠা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় রয়েছে।

চার

আমষ্টারডামের অন্যান্য ভারততত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যে ভারত-যাভা পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ কুন্‌স্ট যাভার সংগীত শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ। ভ্রিসি (Vreese) কাশ্মীরের নীলমত পুরাণের একটি সংস্করণ সম্পাদন করেছেন; পালি ও অপভ্রংশ সাহিত্য তিনি চর্চা করেন। ইদানীংকালে ভারতের বিভিন্ন ভাষা সম্বন্ধে পরিচয় লাভের জন্য তিনি ভারতবর্ষ ঘুরে গিয়েছেন। ভারত ও বৃহত্তর ভারতে পুরাতত্ত্ব ও আর্ট-ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীমতি লুহিএনের গবেষণা প্রসূত রচনাবলীর মধ্যে সিথিয়ান যুগের ইতিহাস খানি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

উট্রেক্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক (১৯৩২) খোণ্ডা সংস্কৃত ও প্রাচীন জাভা বিষয়ে ডাচ পণ্ডিতদের প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষদের মধ্যে অন্যতম। জাভাতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাবের উপরে তাঁর বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রয়েছে। জাভার কবি ভাষাতে রচিত ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ (১৯৩৩) ও ভীষ্ম পর্ব (১৯৩৬) গ্রন্থদ্বয়ের সংস্করণে এবং 'ইন্দোনেশিয়াতে সংস্কৃত' নামক গ্রন্থে (১৯৫২) মৌলিক চিন্তা, সন্ধানী মন, ও তথ্যনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। অতঃপর তিনি বেদ-চর্চা আরম্ভ করেন। অথর্ববেদের রচনাভঙ্গী, বেদে প্রযুক্ত অলঙ্কার ইত্যাদি বিষয়ে তিনি বহু সারগর্ভ আলোচনা করেছেন।[৮] এই সমস্ত গ্রন্থের ভিতরে 'On the relation between gods and powers in the Veda' গ্রন্থখানি (১৯৫৭) ঐতিহাসিক ও নৃতত্ত্ববিদ্‌দের নিকটে মূল্যবান। ভারতীয়ধর্ম তাঁর অন্যতম আলোচ্য বিষয়।[৯]

তাঁর ছাত্রদের মধ্যে জে. এ. বুইতানেন, এম. জে. ড্রেসডেন এবং জে. সি. হিস্‌টারম্যান যথাক্রমে রামানুজ, মানবগৃহ্যসূত্র এবং রাজসূয় যজ্ঞের উপরে গবেষণা করেছেন।[১০]

এতদ্ব্যতীত উট্রেক্টে ভারতীয় দর্শন-ইতিহাসের অধ্যাপক জি. আবোরহামার ন্যায় ও বেদান্ত দর্শনের ছাত্র; তর্কশাস্ত্রের উপরে একখানি গ্রন্থরচনাতে তিনি ব্যাপৃত। প্রাচ্যধর্মের অধ্যাপক ডি. জে. হোয়েন্সের 'বেদে শান্তি' পুস্তকটি বহু নতুন তথ্যে সমৃদ্ধ।[১১] যোহান হুইজিং (১৮৭২—১৯৪৫) ভারতীয় নাটকে বিদূষক; পাদ্রী বি. এসারম বাক্ বা শব্দব্রহ্ম; ত্রক্কার্ণ হিন্দু-জাভা প্রভাবিত একখানি ঐশ্লামিক গ্রন্থ; সি. ক্লার্ক ডাচ লিপিতে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণা ও কাজ করেছেন।

পাঁচ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে গ্রোটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত অধ্যাপনা ও গবেষণার বন্দোবস্ত হয়। অধ্যাপক জেকোর-এনসিঙ্ক সেখানকার কর্ণধার। তিনি মহাযান বৌদ্ধধর্ম ও সাংখ্য দর্শনের চর্চা করেন; 'রাষ্ট্রপাল পরিপৃচ্ছা' গ্রন্থখানির ডাচ ও ইংরাজি ভাষাতে তিনি অনুবাদ করেছেন। অন্যান্য ভারত-তত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যে বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অধ্যাপক যুঙ্গ প্রসন্নপদা গ্রন্থখানি সম্পাদন করে খ্যাতি অর্জন করেছেন; এর আংশিক অনুবাদ তাঁরই কৃত। এগারমণ্ট অশোকের রাজত্বের কাল নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন; অশোকের শিলালেখ ও কিংবদন্তীর তুলনামূলক আলোচনা করে আপেক্ষিক কাল নির্ণয় করেছেন (১৯৫৬)। তাঁর পদ্ধতির ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। মিস্ ডঃ গেন্ডার বৃদ্ধবয়সে মানব শ্রৌতসূত্রের সানুবাদ।[১২] সংস্করণ সমাপ্ত করেছেন। বৃহদারণ্যকের "আত্মাকে" তিনি পাশ্চাত্য মতে আধুনিক মনস্তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন (১৯৫৭)। জাভা ও ভারতীয় শিল্পে বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক বস 'হিরণ্যগর্ভ' পুস্তকখানিতে ভারতীয়, যাভা ও খমেরের ভাস্কর্যের লক্ষণ ও প্রতীকের উৎসের সন্ধান করে সিদ্ধান্ত করেছেন। ডঃ পি. এইচ. পটের 'যোগ ও যন্ত্রে'র উপরে প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা; তিনি পুরাতত্ত্ব ও আর্ট চর্চা করেন।

কার্ণের পরে প্রাচীন জাভার এপিগ্রাফি চর্চা করতেন ডঃ ব্রাণ্ডেস (১৮৫৭—১৯০৫)। তাঁর পূর্ব-যাভার বৌদ্ধ মন্দিরের উপরের গ্রন্থটি (১৯০৪) জেমস্ বার্জেস কর্তৃক উচ্চ প্রসংশিত হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার পুরাতত্ত্ব বিভাগের সংগঠক ডঃ ক্রম (১৮৮৩—১৯৪৫) জাভাতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাবের কথা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। অনুরূপ কাজ করেছেন স্তুতারহিম (মৃত্যু—১৯৪২)। 'হিন্দু সুমাত্রা" এবং

'ইন্দোনেশিয়াতে রাম-কথা ও রাম-রিলিফ' গ্রন্থদ্বয় তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রমাণ বহন করে।

আর অধিক উদাহরণ উল্লেখ না করে আর্নল্ড বাকের (১৮৯৯—১৯৬৩) কথা বলে বক্তব্য শেষ করব। তিনি বংলাদেশে বহুদিন ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। বাংলার কীর্তন এবং ভারতীয় ও রবীন্দ্র সংগীতের উপরে তাঁর গবেষণামূলক রচনা তাঁকে সংগীত জগতে স্মরণীয় করে রাখবে। কালাণ্ড ও ফোগেলের সংস্পর্শে এসে তিনি ভারতীয় সংগীত-শাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন। 'সংগীত-দর্পণের' উপরে তাঁর গ্রন্থ বিদগ্ধতা, মৌলিক চিন্তাধারা ও সত্যানুরাগের সাক্ষ্য বহন করে।

ওলন্দাজদের ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অবদানের যে সংক্ষিপ্ত রূপরেখা চিত্রিত করা হয়েছে তার মূল্যায়ন করলে দেখা যাবে যে হল্যাণ্ডে ভারত সম্পর্কে আগ্রহ অনেকদিনের ; কার্ণ ও তাঁর পরবর্তীকাল থেকে গুরুপরম্পরায় ভারতবিদ্যা বিষয়ে শিক্ষা ও অনুশীলনের কাজ চলে আসছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে যুগান্তরকারী রাষ্ট্রনৈতিক ও অন্যান্য পরিবর্তন সত্ত্বেও ভারততত্ত্ব অনুসন্ধানের আগ্রহ বেড়েছে বই কমেনি। মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত করা হয়েছে ও হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে নতুন নতুন সাময়িক পত্রাদি প্রকাশিত হচ্ছে। এদের মধ্যে Indo-Iranian Journal, Central Asiatic Journal, Journal of the Economic and Social History of the Orient, Oriens, Contributions to Indian Sociology উল্লেখযোগ্য।

ভারত ও হল্যাণ্ডের মৈত্রীর সেতুবন্ধনে এই যোগাযোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দখল করে থাকবে।

পাদটীকা :

১। This is still, perhaps, the most complete account of Southern Hinduism, though by far the earliest.

২। "The Dutch books were among the sources of first hand knowledge about India, which after the middle of the 17th century exerted an enormous influence on the intellectual elite which then woke up to the fact that there are more types of human civilization than the only known European variety" (Gonda).

৩। প্রথম হিন্দুস্থানী ব্যকরণও ডাচ ভাষায় রচিত হয় (১৬৯৮)। রচনা করেন ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী জার্মান বংশোদ্ভব কেটলার (Joan Josua Ketelaar) গ্রন্থখানি

উট্রেক্টের অধ্যাপক ডেভিড মিলিয়াস কর্তৃক ল্যাটিনে অনূদিত হয়ে লাইডেন হইতে প্রকাশিত হয়েছে (১৭৪৩)।

৪। 'a schlolar of great merit, a representative of old generation of giants'.

৫। বোধায়ন (১৯০৪—২৩) ও বৈখানস শ্রৌতসূত্র, পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণের ইংরাজী অনুবাদ (১৯৩১); সানুবাদ বৈখানস স্মার্তসূত্র (১৯২৭—১৯২৯)

৬। A manual of Sanskrit Phonetics.

৭। আটটি সংস্কৃত নাটক ডাচ ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এর মধ্যে কিছু কিছু মঞ্চস্থ হয়েছে। শকুন্তলা ও মৃচ্ছকটিক নাটকদ্বয় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

৮। Rig vidhan (১৯৫১) : Languages of the Veda (১৯৫৯) ; Epithet in the Rigveda (১৯৫৯) ; Vision of the Vedic poets ইত্যাদি।

৯। Aspects of early Visnuism (১৯৫৪)

১০। "model of modern Vedic research and it is hoped that it will inspire many to take up once again the classics of pre-historic India". (BSOAS, XXII)

১১। "a valuable contribution to our knowledge of Indian religious terminology" (Gonda)

১২। "It is hoped the work, which initiates a new epoch in the investigation of Indian and Ceylonese history will soon be followed by similar studies on either periods." (BSOAS, XIX, 601).

ভাতের জন্যে

কুমার মিত্র

ঝুলের মতো অন্ধকার থিকথিক করছে। সারা আকাশটা যেন ভূষোকালিতে ভরে আছে। সাদা ভাজা খইয়ের মতো ফুটফুটে নক্ষত্রগুলোই শুধু দুচার ছিটে আলো জড়িয়ে আছে গায়ে। নচেৎ সব কিছুই অন্ধকার। গাছপালা মাঠঘাট পর্যন্ত কালিঝুলি মেখে ভূত সেজে বসে আছে চুপচাপ। কি তিথি মনে নেই, তবে কৃষ্ণপক্ষ। তাই পৃথিবীর এমন প্রেতসজ্জা।

এই আকাশপাতালভরা অন্ধকারের মধ্যে বনবাদাড় জল-জাঙাল ভেঙে কোম্পানীর মস্ত উঁচু বাঁধটা পেরিয়ে ভূষণ খালের ধারে এসে দাঁড়াল। হেঁটে এল না, যেন একটা নিঃশব্দ সরীসৃপের মতো বুক বেয়ে বেয়ে চলে এল। গাইঘাটার খাল নামে পরিচিত খাল দক্ষিণবাহিনী হয়ে দামোদরের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে মাইলখানেক দূরে। নামে খাল হলে কি হয়, আসলে একটা ছোটখাটো নদী। নদীর মতো চ্যাটালো নয়, বেশ গভীর। স্রোতও খর। তর্জনগর্জনই বা কম কি! খালের ধারে দাঁড়িয়ে জলের দিকে চোখ ফেলল ভূষণ। অবিচ্ছিন্ন একটি কলকল শব্দ উঠছে। কিছুদিন আগে হড়পা নেমেছিল। মাটি ধ্বসে-ক্ষয়ে বেশ খুলে গিয়েছে খাল। চেহারাটা তাই বড়সড় ঠেকছে, হাঁকডাকও বেড়েছে সেই সঙ্গে। এখন জোয়ার চলছে, তাই এমন ভরভরন্ত। হাত দুয়েক নিচেই জল। আঁধারের গাঢ়তার জন্যে জল বলেই মনে হচ্ছে না, কে যেন আলকাতরা মাখা টিনের পাত খালের গর্ভে বিছিয়ে দিয়েছে বরাবর।

জল থেকে চোখ তুলে ভূষণ শিকারলুব্ধ শেয়ালের চোখের তীক্ষ্ণতা নিয়ে যতদূর দৃষ্টি চলে তাকাল। বাস্তবিকপক্ষে ঘন আঁধারের মধ্যে শেয়ালের মতোই জ্বলছিল ওর চোখ। অন্য কেউ হলে গাঢ় অন্ধকারের চাদর ফুঁড়ে কিছুই দেখতে পেত না। কিন্তু ভূষণের কথা আলাদা। তার রাতঘাঁটা চোখ

সমস্ত দেখতে পেল। সব কিছু। বাঁধের ওপর শ'খানেক হাত দূরে বুড়ো অশথটার কোলে ঘেঁষে যে একটা ধারী শেয়াল কিংবা আধলা কুকুর চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, সেটাও তার নজরে পড়ল। না, কেউ নেই কোথাও। একটানা ঝিঁঝির কর্কশ শব্দ ছাড়া ভাঙার ওপর কোন শব্দও নেই।

কিছুটা নিশ্চিন্ত হতে গিয়েও ভূষণের খেয়াল হল নিশ্চিন্ত হওয়ার কোন মানেই হয় না। এখন সে ঠিক একটা উপবাসী গরগরে অজগরের খাঁচার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। অজগরটা যে কোন মুহূর্তে বিশাল একটা হাঁ করে তার দিকে তেড়ে আসতে পারে। চারপাশে যা ঝোপঝাপ আর গাছপালা! ওর আড়ালে আড়ি পেতে কেউ তার গতিবিধির দিকে নজর রাখাও কিছু বিচিত্র নয়। অথবা সেই পাজীর পা ঝাড়া শয়তানটা দুটো তাগড়া জোয়ান পাইককে খাল পাহারা দেবার জন্যে পাঠিয়ে দিলেও অবাক হবার কিছু নেই। একটু আগে ভূষণ খাঁচার মধ্যে একটা অজগরের কথা ভাবছিল। আসলে অজগর একটা নয়, দুটো। পাইক দুটোকে দুটো অজগর ছাড়া কিছুই ভাবা চলে না। তেমনি ভয়ঙ্কর আর হিংস্র। দুটো মোষের আহার টেনে লোকদুটো সারাদিন ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোয়। সন্ধ্যে হলেই গা ঝাড়া দিয়ে জেগে ওঠে। তারপর দুজনে দুখানা তেল চুকচুকে পাকা বাঁশের লাঠি নিয়ে সারারাত চতুর্দিক টহল দিয়ে ফেরে। অন্ধকারেই ওদের চলাফেরা। সাপের মতো নিঃশব্দে ওরা হাঁটে, মুখে কোন কথা বলে না, অন্ধকারের মধ্যেও ইঙ্গিতে ইশারায় ওদের কথা হয়। বনবেড়ালের মতো চোখ দুটো জ্বলে। কাউকে ভয়ডর নেই; সাপখোপেরও না, অপদেবতারও না। কাজ সেরে মুহূর্তের মধ্যে হাওয়া। ওই মানুষ দুটোকেই বড় ভয় ভূষণের। সেও জোয়ান মানুষ, তেজও বড় কম নেই, দুবছর আগেও রামদার এক কোপে ভর জোয়ান মোষের গলা ফাঁক করে দিয়েছে। কিন্তু ওদের কাছে সে কিছু নয়। কোথা থেকে যে মুহূর্তের মধ্যে উড়ে আসবে ওরা আর লাঠির এক ঘায়ে যুটি ফলের মতো মাথাটা চৌচির করে দেবে সে টেরটিও পাবে না। তারপর লাশটা খালের আধবুক পাঁকের তলায় পাচার করে দিলে কাকপক্ষীও জানতে পারবে না।

ভূষণের পায়ের তলা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা বরফঠাণ্ডা জলের স্রোত বয়ে গেল যেন। গায়ের রোঁয়াগুলো শুয়োপোকার রোমের মতো খাড়া হয়ে উঠল। ভূষণ আপাদমস্তক কেঁপে উঠল। ভূষণ ভয় পেয়েছে, ভীষণ ভয় পেয়েছে। পা দুটো কেমন অবশ লাগছে, গলার ভেতরটা খরার মাঠ

হয়ে উঠল যেন। সে কি পালিয়ে যাবে? সামনের ওই বাঁকাবন কিংবা ওই ঝাঁকড়া বটগাছটার আড়ালে পাজী দুটো ঘাপটি মেরে নেই তো! আর যে লাঠি দুটোকে ওরা কখনও কোন মুহূর্তে কাছছাড়া করে না সে দুটো ওদের সঙ্গে সঙ্গেই আছে তো! এখুনি যদি তারা হাওয়ার সওয়ার হয়ে সেই মরণবাণ দুখানা হাতে নিয়ে তার ওপর চড়াও হয় তাহলে সে কি করতে পারে! যদি সেই শালগুঁড়ির মতো লাঠিদুটোর দুচার ঘায়ে তাকে শেষ করে দিয়ে তার মৃতদেহটি খালের গভীর পাঁকের তলায় নিশ্চিহ্ন করে দেয় তাহলেই বা কে জানতে পারছে! এমনি কতজনকেই ওরা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে! তারপর দুচারদিন সেই বে-হদিশ লোকটাকে নিয়ে হৈচৈ হয়েছে, থানাপুলিশ হয়েছে। তারপর একসময় গোলমাল থেমে গিয়েছে। সব জেনেও মানুষ মুখ খোলেনি। ওদের কোপে পড়বে, এমন বুকের পাটা কার!

এই নির্জন নিঃশব্দ কৃষ্ণপক্ষের ঘন অন্ধকার রাত্রে তাকেও যদি অমনি করে—

এর বেশী ভাবনাটাকে প্রশ্রয় দিল না ভূষণ। একবার ভাবতে আরম্ভ করলে ক্রমশ বেড়েই চলে, থামতে চায় না। না, সে আর ভাববে না। যা হয় হোক। এই দোটানা ভালো লাগে না। সেও কমজোরী নয়, তারও গায়ে খ্যাকশেয়ালের ক্ষিপ্রতা। আগেভাগে টের পেলে লড়াই করতে না পারুক, পালাতে অন্তত পারবে। তারও নাম ভূষণ কামার। রক্ষেকালীর চত্বরে একসময় একনাগাড়ে খাঁড়া না পাল্টে পঞ্চাশটা পাঁঠার মাথা নামিয়ে দিয়েছে। আশপাশের পাঁচ দশখানা গাঁয়ের লোক্ এক ডাকে তাকে চেনে। সেও ডাকসাইটে ভূষণ। খালের জলে একবার ঝাঁপ দিয়ে পড়তে পারলে ধরে কার সাধ্য। ডুব সাঁতারে তার সঙ্গে পাল্লা দেবার মতো লোক এ তল্লাটে কেউ নেই। তবে এতে ভয় কিসের! ভয়ভাবনা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ভূষণ বুক চিতিয়ে দাঁড়াল।

'শালা শয়তান!' কালনাগের মতো হিসহিসে আক্রোশভরা গলায় বিড়বিড় করে উঠল ভূষণ। হ্যাঁ, সেই সতীশ জোয়ারদারকে উদ্দেশ করেই শব্দদুটো ছুড়ল সে। সতীশ জোয়ারদার; হেন অপকর্ম নেই যা লোকটা করেনি, যার মতো হাড়বজ্জাত লোক ভূষণ তার জীবনে দুটি দেখেনি, এই জমিদারী না-থাকার যুগেও লোকটা একটা ছোটখাটো জোতদার। খেত-খামার বাগানবেড়ের আর শেষ নেই। এ সবের অধিকাংশই হচ্ছে

জবরদখল। অসৎপথের উপার্জন। একসময় নামকরা লেঠেল ছিল, মোটা পয়সা নিয়ে এক পক্ষের হয়ে অন্য পক্ষের মাথা ভেঙে আসত। পরে যখন বুঝল এতে বেশী লাভ নেই, তখন লাঠির প্রতাপটাকে নিজের কাজে লাগাল। আর আশ্চর্য, লাঠির জোরেই মাটির মালিক হয়ে উঠল।

দু দুটো মস্ত ধানের গোলা জোয়ারদারের। দুটো গোলাই ধানে ঠাসবোঝাই। বছরের সব সময়েই ঠাসা। মাঠ যে বছরে খরায় খাঁ খাঁ করে কিংবা অতিবৃষ্টিতে থইথই করে, কারো গোলায় এক দানা শস্যও নেই, সে বছরেও জোয়ারদারের গোলা আকণ্ঠ ভরপুর। অথচ সারা বছরটাই বিক্রীবাটার কাজ করছে সে। শত শত মণ ধান নামিয়ে নিয়ে এই গোলা হাল্কা হয়ে গেল, পরমুহূর্তেই বোঝাই। রাতারাতি কোথা থেকে যে এসে জমে গেল, সে রহস্য উদ্ঘাটন করা দেবতারও অসাধ্য। অন্তত রহস্যসন্ধানীরা তাই বলে। কেউ কেউ বলে জোয়ারদার একজন ভক্ত কালীসাধক। কালীর অনুগ্রহেই তার এমন বাড়বাড়ন্ত। ভূষণ কিন্তু এ গল্প বিশ্বাস করে না। তার বিশ্বাস হয় না যে অমন একজন হাড়পাজী লোককে মা কালী কৃপা করতে পারে। দেবতার চোখ নেই নাকি!

গত বছর খরা গিয়েছে। তিলমাত্র ফলন হয়নি মাঠে। আদিগন্ত ক্ষেত শুকিয়ে গিয়েছিল বাজপড়া গাছের মতো। এ বছর গেল অতিবৃষ্টি। জলস্ফীতিতে মাঠ হয়ে উঠেছিল একটা আথালি-পাথালি দরিয়া। বিশ বাঁও জলের তলায় তলিয়ে গেল বীজধান। সেইসঙ্গে তলিয়ে গেল গ্রামের হতভাগ্য মানুষগুলোর সুখ-সৌভাগ্য।

ভূষণ জাতচাষী নয়, কামার। চাষবাসের সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকার কথা নয়। কিন্তু সম্পর্কটা সে নিজেই গড়ে নিয়েছিল। পুজোআচ্চায় ডাক পড়ত বটে, কিন্তু পাওনাগণ্ডা আর আগের মতো মিলত না। আর পাঁঠাবলির কাজটা ভালও লাগত না ইদানীং! তাই ছেড়ে দিয়েছিল ও কাজ। কামারের দোকান একটা ছিল বটে, সেটাও বছরে ছমাস না চলার মতো। লোহালক্করের কাজ গ্রামে করাবার মতো মানুষ কোথায়? গঞ্জের হাটে একটা আলতা শাঁখা সিঁদুর ইত্যাদির দোকান দেবে ভেবেছিল, মূলধনের অভাবে সেটা পরিকল্পনাই রয়ে গিয়েছে। শেষতক তাই পৈতৃক কিছু জমিজমা থাকায় চাষের কাজেই নেমে পড়েছিল। কিন্তু সেখানেও দুর্ভাগ্য তার সঙ্গ ছাড়ল না। পরপর দু'সন অজন্মায় অভাব তার হাড়মাস

চুষে খেয়ে নিয়েছে। অথচ সংসারে তার পোষ্য কম নয়, অল্প করে জনা ছয়।

সতীশ জোয়ারদারের গোলাভরা ধান। সে ধান সে লোকজনের দায়ে-আপদে চড়া সুদে দাদনও দিয়ে থাকে। অসময়ে একমণ দিলে ধান ওঠার মরশুম এলে দেড়মণ ফিরে দিতে হবে। লোকটার খপ্পরে পড়লে দুর্ভোগের অন্ত থাকে না জেনেও দাদনের আশাতেই জোয়ারদারের গদীতে গিয়েছিল সে। তার মতো অনেকেই গিয়েছিল ওই আশাতে। সকলেই ফিরে এসেছে হতাশ হয়ে।

জোয়ারদারের সেই নোংরা খিঃখিঃ হাসিটি এখনও যেন কানে ভাসছে ভূষণের। আর তার বিশ্রী মুখভঙ্গী এখনও যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে। কালোপানা বীভৎস মুখটা ব্যঙ্গের হাসিতে আরও বীভৎস হয়ে উঠেছিল। ধান তো দেয়নিই উপরন্তু বিদ্রূপ। সে বিদ্রূপে সারা শরীরের সমস্ত রক্তকণিকায় আগুন ধরে যায়। ভূষণের সারা দেহেও আগুন জ্বলে উঠেছিল। তার হাতুড়ি-পেটা হাতটা নিশপিশ করে উঠেছিল। লাল টকটকে লোহার পিণ্ডের ওপর মস্ত যে হাতুড়িখানা সে পেটে সেই হাতুড়িটা যদি লোহার বদলে ওই নীরেট মাথার ওপর বসিয়ে দিতে পারত তবে সে শান্তি পেত। কিন্তু শান্তি পাওয়া তার হয়ে ওঠেনি। কেবল সেই দুরন্ত ইচ্ছেটা ভেতরের তাপে ফুলেফেঁপে ঢাউস হয়ে উঠে ঝলসে দিয়েছে তার সমস্ত শরীর মন।

'কি রে, জাত হারিয়ে বোস্টম, তুই হেথা কেন?' একটা গা-জ্বালানো হাসি হাসতে হাসতে কথাগুলো ভূষণের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিল জোয়ারদার। ভূষণের মনে হয়েছিল দাদন-প্রত্যাশী লোকগুলোর মুখও চাপা হাসিতে ভরে উঠেছিল। জোয়ারদারের রসাল বিদ্রূপ তারা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেছে। ভূষণের চোখজোড়া ধ্বকধ্বক করে জ্বলে উঠেছিল, কিন্তু মুখে কিছুই বলতে পারে নি সে।

'শালা বেজন্মা, হারামখোর।' ভয়ঙ্কর আক্রোশে গাল পাড়ল ভূষণ। চোখদুটো ধ্বকধ্বক করে জ্বলে উঠল, জোয়ারদারের গদীতে যেমন জ্বলে উঠেছিল। 'তোমাকে মজা দেখাচ্ছি, দাঁড়াও শালা।' সামনেই যেন জোয়ারদার দাঁড়িয়ে আছে, এমনি ভঙ্গীতে বলল ভূষণ। আর জোয়ারদারের রাগে কালো মুখখানার দিকে চেয়েই যেন দুপাটি দাঁত মেলে দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে হাসল। হাসল, নাকি ভেংচি কাটল, কে জানে!

ভূষণের গা উদোম। পরনে ছোট্ট একটা কাপড়। মালকোঁচা আগে সাঁটাই ছিল। আর একবার সেটাকে গুছিয়েগাছিয়ে নিল ভূষণ। বাড়তি অংশগুলো জুৎ করে এঁটে নিল। কোমরে একটা গামছা শক্ত করে বাঁধা ছিল। তার ঝুলন্ত দুটো প্রান্ত ঘুরিয়ে নিয়ে কাঁছার সঙ্গে ভালো করে গুঁজে দিল। আর ডানদিকে কোমরে কি যেন একটা বস্তুর অস্তিত্ব সন্ধান করল। জিনিসটি টেনে বের করল ভূষণ। সম্পূর্ণ তৈরী হবার আগে দরকারী জিনিসগুলোর একবার তদারক করে নেওয়া ভালো। মাঝারি একটা ছোরা। আঁধারের মধ্যেও ইস্পাতের ধূসর শুভ্রতার কিঞ্চিৎ বিচ্ছুরণ লক্ষ্য করা গেল। ভূষণের নিজের হাতে তৈরী ছোরা। ক্ষুরের মতো এতে দাড়ি চাঁছা যায় না বটে তবে ক্ষুরের চেয়ে কিছু কম যায় না। জুৎমতো বসাতে পরেলে এক আঘাতেই পিঠ পর্যন্ত পাচার। আলতো আঙুলের স্পর্শ দিয়ে সাবধানে অথচ যেন পরম আদরের সঙ্গে ছোরার ধার পরীক্ষা করল। বাঁটটায় অনাবশ্যক একটা চাপ দিল সজোরে। যেন নিজের সঙ্গে সঙ্গে ছোরাটাকেও উত্তপ্ত করে নিতে চাইল। গোছগাছ করার কাজ শেষ হলে খরসান দৃষ্টি মেলে দিল খালের পাথুরে কালো গর্ভে।

দূরত্বটা শ দুই হাতের বেশী হবে না। প্রায় আধ মাইলটাক সরকাঠির মতো সরলরেখায় এসে খাল যেখানে মস্ত একটা বাঁক নিয়ে আবার সোজা উত্তরমুখী হয়েছে সেখানে একটা বড়োসড়ো অশথগাছ। তার তলাতে একটা প্রায় দুহাজারমণী নৌকা গাছের ছায়ার সঙ্গে লেপ্টে আছে। ভূষণের শাণিত চোখ আঁধার ফুঁড়ে ঠিকই পৌঁছে গেল সেখানে। কোন আলো জ্বলছে না, খুটখাট শব্দও নেই। পশুপ্রাণীর সঙ্গে সঙ্গে নৌকোটাও যেন গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন।

চাল আছে ওতে, চাল। প্রায় দুশো বস্তা তাজা চাল। আঁধারের আড়াল নিয়ে চাল পাচার করছে সতীশ জোয়ারদার। চাষীদের রক্ত জল-করা পরিশ্রমের প্রাপ্তি তাদের দারিদ্র্যের সুযোগে অল্প দামে কিনে নিয়ে মোটা টাকায় বেচে দিচ্ছে দূর গঞ্জের কোন আড়তদারকে। এই চোরা-চালানের কারবারে রাশিরাশি টাকা পিটে নিচ্ছে জোয়ারদার। রাশিরাশি তোড়াবন্দী টাকা আসবে ওই বস্তাগুলোর বিনিময়ে। অথচ তারই গ্রামের মানুষগুলো কুকুর-ছাগলের মতো না খেয়ে মরবে। ভূষণের সারা শরীরটা রী রী করে উঠল রাগে আর ঘৃণায়। অথচ এর কোন প্রতিকার নেই। একেবারেই নেই কি ?

কিছুটা আছে বৈ। সেইজন্যেই তো এই নৈশ অভিযান। নৌকোটাকে আর এগোতে না দিলে কেমন হয়? বস্তাগুলো আড়তদারের মালখানায় না গিয়ে যে সব ঘরে দুচার দিন উনোনে হাঁড়ি চড়েনি তাদের কাছে পোঁছে দিলে কেমন হয়? শিশু বুড়ো বুড়ী যুবতীদের মুখে এক আশ্চর্য সুখের ছবি আঁকতে আঁকতে ভূষণ কোমরের কটিতে গোঁজা ছোরার মুখটা শক্ত করে চেপে ধরল।

নৌকোটা সতীশ জোয়ারদারেরই। আড়দারেরা এখান থেকে চালধান নিয়ে যেতে সাহস পায় না। লুঠের ভয়। জোয়ারদারকেই নিজের নৌকোয় আগ বাড়িয়ে ঠাকুরচকের হাটতলা পর্যন্ত মাল পৌছিয়ে দিয়ে আসতে হবে। সেখান থেকে নৌকো বদল হয়ে মাল চলে যাবে রূপনারাণের ধারের মস্ত বড় এক গঞ্জে। নৌকো ছাড়বার কথা মাঝ রাত্রে। হয়তো বা মাঝ রাতে একটু ভাটির টান ধরলে। এই সময়টাই সব থেকে নিরাপদ। আর বড়জোর ঘণ্টা-খানেক বাকি আছে। ভূষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে সময় বোঝবার চেষ্টা করল।

খালপারের বাঁশবনের মধ্যে একদল শেয়াল সমস্বরে হুক্কা হুয়া ডেকে উঠল। রাতের সজাগ প্রহরীর চোখে একটুও ঘুম নেই। ভূষণ বুঝল এখন কাঁটায় কাঁটায় মধ্যরাত্রি। অন্ধকারের ঘনতা তার চরমে পৌছেছে। ভূষণের অচল শরীরটা কিসের একটা নাড়া খেয়ে যেন সচল হয়ে উঠল।

এখন নৌকাখানা প্রায় অরক্ষিত। কান পর্যন্ত জ্বালা করে ওঠা পাঁঠার ঝালচচ্চড়ি খেয়ে আর স্পিরিট গিলে ভাম হয়ে টলতে টলতে এখুনি এসে পড়বে মাঝিমাল্লারা। মাঝিমাল্লা নামটা যেমন নিরীহ আসলে কিন্তু ওরা তা নয়। ভীমের মতো দশাসই জোয়ান সব এক একজন। ধেনো খেয়ে চোখ করমচার মতো লাল, মুখে অশ্রাব্য গান আর গালিগালাজ। ছুরিছোরা লাঠি-সোঁটা কিছু না কিছু প্রত্যেকের সঙ্গে। কিন্তু ওদের এসে পড়তে এখনও কমসে কম আধ ঘণ্টা, ভূষণ সব জানে। নৌকোয় সে একজন আগলদার রেখে গেছে, তাও অজানা নয় তার। মাত্র একজন? কিন্তু এর বেশী আগলদার রাখার দরকার আছে বলে মনে করে না সতীশ জোয়ারদার।

কিন্তু সতীশ জোয়ারদারের ওপর টেক্কা মারবার মতো মানুষ কি পৃথিবীতে নেই? নিজেকে নিজেই শুধোল ভূষণ। 'আছে বৈকি।' ঘাড় নেড়ে উত্তর দিল ভূষণ। জোয়ারদারের ওপর এক হাত নিশ্চিতই সে নেবে। মাত্র এক-জন আগলদারকে ঘায়েল করতে পারবে না সে? পারতেই হবে। সে যে

অন্ধকারে ঘাপটি মেরে থাকা শক্ত। বাঘের মতো লোকটার ওপর লাফিয়ে পড়ে টুঁটি টিপে ধরবে লোকটার। তারপর নৌকার কাছি কেটে দিয়ে জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে মাইলখানেক দক্ষিণে গাইঘাটার মোহনায় পৌছতে পারলেই কেল্লা ফতে। ঘণ্টাখানেক পরে জোয়াদারের লোকজন আঁতিপাঁতি করে নৌকো সন্ধান করে ফিরবে তখন দুশোখানা চালভর্তি বস্তাই চিরকালের জন্যে নিখোঁজ হয়ে গেছে। এইসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে আর মুখের ওপর একটা কুটিল হাসিকে ক্রমশঃ উদ্ভাসিত হতে দিতে দিতে ভূষণ জলে পা রাখল।

ভীষণ তোড় জলে। হড়পা এসে খালটাকে নতুন যৌবব এনে দিয়ে গেছে। খালটা যেন যৌবনজ্বালায় ছটপটিয়ে মরছে। একটু বোসমাল হয়ে পড়লেই নাকানিচোবানি খাওয়াবে। বিন্দুমাত্র শব্দ না করে ডুবজলে নামল ভূষণ। কেবল মাথাটা জেগে রইল। আস্তে আস্তে সাঁতার দিতে থাকল সে।

রাত্রির শিশিরে ভিজে জল যেন হিম। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে শৈত্যটা সয়ে এল ভূষণের। একটু যে ভয় ভয় না করছিল এমন নয়। জোয়ারদারের ভয় তো ছিলই, এ ছাড়াও মধ্যরাত্রের খালের কালো জলে সাঁতার দেবার একটা আবছা বিভীষিকাও তাকে অবশ করে তুলছিল। তবু এখানে কোন রাক্ষুসে জলজন্তুর ভয় নেই। ভূষণ সাহস সঞ্চয় করবার চেষ্টা করল।

মাত্র শ দেড়েক হাত এগোতেই অনেক্ষণ লেগে গেল। কতক্ষণ, সঠিক ঠাহর কতে পারল না, তবে পনেরো মিনিটের কম নয়। আসলে সাঁতার দিয়ে আসবার তেমন চেষ্টা করেনি সে। তার দরকারও ছিল না। শরীরটা ভাসিয়ে রেখে জলস্রোতের মধ্যে ছেড়ে দিয়েছিল নিজেকে। এমনকি চার-দিক মাঝেমাঝে দেখে নেবার প্রয়োজনে গতিবেগ সংবৃতও করতে হচ্ছিল। মাত্র হাত পঞ্চাশ যখন বাকি আছে তখন গতি একেবারে থমকে দিয়ে নৌকোর সমস্ত অবয়বে তীক্ষ্ণ নজর বুলিয়ে নিল। না, কাউকে দেখা যাচ্ছে না। অবশ্য এখান থেকে সমস্ত অংশে চোখ ঠিকঠিক পড়া সম্ভব নয়, ফলে কেউ আড়ি পেতে লুকিয়ে থাকলে দেখতে পাওয়াও অসম্ভব।

আরও খানিক এগোল ভূষণ। আবার দেখল। আবার এগোল। কেউ নেই কোথাও। আর মাত্র হাত বিশেক যখন বাকী তখন লম্বা একটা শ্বাস টেনে ডুব দিল সে। ভুস করে যেখানে ভেসে উঠল তার হাতটাক দূর নৌকোর হাল। হালটাকে আঁকড়ে ধরে হাঁপাতে লাগল ভূষণ। পরিশ্রম

বিশেষ হয়নি, কিন্তু উদ্বেগ তাকে কিছুটা ক্লান্ত করে দিয়েছে। একটু ধাতস্থ হয়ে নৌকোর তৈলাক্ত গা ধরে ধরে অপেক্ষাকৃত নিচু অংশটায় চলে এল। জলের সমতা থেকে এ জায়গাটা হাত দেড়েক উঁচু। হাত বাড়িয়ে পাটাতনের স্পর্শ পেল ভূষণ। তারপর খোলের ওপরভাগের শক্ত একটা কাঠ ধরে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে নিজেকে উপরে ছুঁড়ে দিল ভূষণ নিঃশব্দে। কিন্তু যতই নিঃশব্দ হবার চেষ্টা করুক, একটু আধটু খুটখাট শব্দ জাগলই। নিঃশ্বাস রোধ করে মিনিটখানেক চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল ভূষণ। এই সময় তার বুক দ্রুত ওঠানামা করছিল, হাত পা ভীষণ শিথিল মনে হচ্ছিল। শরীরের সব উত্তাপ কে যেন হরণ করে নিয়েছে। যে কোন মুহূর্তে বিপদের আশঙ্কা করছিল ভূষণ। কিন্তু সেরকম কিছু ঘটল না।

একটা কালপ্যাঁচা বিশ্রী একরকম গোঙানি তুলে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল। অমঙ্গল আশঙ্কায় গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল ভূষণের। মনে হল যেন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে পালিয়ে যায়। কিন্তু জোয়াদারের ব্যঙ্গে বীভৎস পাথুরে মুখটা মনে পড়ে যাওয়ায় ভয়টাকে ধিক্কার দিল ভূষণ। নিজেকেও ছিঃ ছিঃ করে উঠল।

ঘরের মধ্যে টিমটিম করে ভূষোমাখা হ্যারিকেন জ্বলছে একটা। অস্পষ্ট আলোর প্রলেপ মেখে ভেতরের অন্ধকার ঈষৎ ফিকে। ভারী শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ আসছে। আগলদার ঘুমের মধ্যে মরে গিয়েছে। বিড়ালের গদিমোড়া পায়ের নৈশঃব্দ্য নিয়ে ঘরের দিকে এগোল ভূষণ। ডান হাতটা ছোরার হাতলে। বেশী বাগড়া দিলে খতম করে দিতেও পেছপা হবে না ভূষণ।

একটা শেয়াল যেন খোপের মধ্যে হাঁস খোঁজার জন্যে উঠোনে ঢুকেছে, এমনি সতর্কতা নিয়ে ঘরে পা দিল ভূষণ। লোকটা অকাতরে ঘুমোচ্ছে। নাক ডাকিয়ে। একটা ন্যাকড়ার ছোট্ট বল বের করে লোকটার হাঁ-করা মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। না, ঘুম ভাঙার কোন লক্ষণ নেই, অস্বস্তিভরে একবার নড়েচড়ে উঠল কেবল। শক্ত পাকানো নারকেল ছোবড়ার দড়ি দিয়ে দুটো ছড়ানো পা একত্র করে আস্তেআস্তে বাঁধতে লাগল ভূষণ। আশ্চর্য, লোকটা মরে গেছে নাকি! ভূষণের ভয়-শুকনো মুখেও হাসি জেগে উঠল।

দুটো হাতে যখন শক্ত বাঁধন পড়ে গেছে তখন ঘুম ভাঙল আগলদারের। কিন্তু তখন আর বাধা দেবার সামর্থ্য নেই। একটা শক্ত ন্যাকড়ার ফালিতে মুখটা বাঁধতে আরম্ভ করেছে ভূষণ। বাধা দেবার ব্যর্থ চেষ্টায় বাঁধা হাত-পা

একটু-আধটু ছুঁড়ল, মুখখানা এদিক ওদিক ঘষল। 'থাক শালা বাঁধা পড়ে। তোর জোয়ারদার বাবা এসে খুলে দেবে।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল ভূষণ। একটা গুরুতর কাজ এতখানি সহজে চুকে গেলেও ভূষণের বুকের ভার এতটুকুও কমল না। একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী কোন ঘুলঘুলি না পেয়ে ভেতরেই পাক খেয়ে মরছে, এমনি একটা অস্বস্তি ঘুলিয়ে উঠতে থাকল বুকের মধ্যে। ভূষণ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বুকটাকে টান করে খালের ভারী জোলো বাতাস অনেকক্ষণ ধরে টানল। তারপর একটা ভীষণ কর্তব্যের তলব পেয়েই যেন ব্যস্ততায় ছটপট করে উঠল সে।

'কি ভীষণ শক্ত কাছিরে বাবা', নোঙ্গরের সঙ্গে লাগানো কাছিটা ছোরা দিয়ে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে পেঁচাতে পেঁচাতে বিরক্তির সঙ্গে বিড়বিড় করে উঠল, 'হারামজাদা যেন কইমাছের জান।' কিন্তু ছোরা একটুও শিথিল করল না। ছুরির ঘষটানিতে একরকম গা-শিরশির করে ওঠা আওয়াজ উঠছে। উঠুক, ভূষণ গ্রাহ্য করল না। ভূষণের সবল হাতের পেশী যখন ব্যাঙ ধরা দাঁড়াশের গলার মতো ফুলে উঠছে, গা ঘেমে উঠেছে, ছোরার ধার প্রায় পড়ে এসেছে, তখন কটাৎ করে একটা শব্দ তুলে কাছিটা দুভাগ হয়ে গেল। আর প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই বাঁধনহীন নৌকোখানা সশব্দে একটা মোচড় খেল। হালখানা কড়কড় শব্দ তুলল।

ভূষণ চোখের নিমেষে দৌড়ে গিয়ে হালের কাছে মাঝি হয়ে বসল। হ্যাঁ', মাঝির কাজটাও দায়ে বিপদে অল্পসল্প চালাতে পারে। খালেক সাহেবের খটিতে দিনকতক মালবওয়া নৌকোর মাঝিমাল্লার কাজও করেছিল ভূষণ। এইজন্যে এ কাজের ভার তাকেই দিয়েছে দলের লোকেরা।

মাঝির কাজটা মোটেই সহজ নয়; দীর্ঘদিন অনভ্যাসের পর কথাটা হাড়ে-হাড়ে বুঝল ভূষণ। বিশেষত অত বড় নৌকোর হাল কখনও সে ধরেনি। খালেক সাহেবের নৌকো মাত্র পাঁচ শ মন বোঝাই নিত। বড় জোড় বড়-সড় একটা ডিঙি বলা যায় সেটাকে। এ নৌকো দুহাজারমণী। নি-নি-করা গাঙে এর যাতায়াত। খালটার অর্ধেক জুড়ে বসে রয়েছে। যাচ্ছেও গদাই লস্করী চালে। অথচ জোয়ারের টানে চলেছে, আর জোয়ারটাও কম-জোরী নয়। এমনি করে চললে মাঝপথ যেতেই তো ঘণ্টা কাবার হয়ে যাবে। ভূষণ অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসল।

নৌকোটাকে যেন মজা পেয়ে বসেছে। খেলিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে ভূষণকে।

বোকা মাস্টারমশাইকে পেয়ে চালাক ছাত্র যাচ্ছেতাই ভুলভাল পড়ে যাচ্ছে যেন। হাল ঠিক রাখতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে ভূষণ। তবু নৌকোর টাল-মাটাল অবস্থা। ভূষণকে কড়মড় শব্দ তুলে ধমক দিতেদিতে একবার এদিক বাঁক নিচ্ছে, একবার ওদিক। ঘাম ছুটে যাচ্ছে ভূষণের।

'খচ্চর, শুওর।' হালের কান ধরে যথাশক্তি মোচড় দিতেদিতে গজগজ করে উঠল ভূষণ। নৌকোটাকে গাল পাড়ল। তার মনে হল নৌকোটা ইচ্ছে করে তাকে বেগ দিচ্ছে; পাজী বলদ যেমন লাঙলের মানুষ পাল্টালে গোঁ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে, নড়তে চড়তে চায় না, নৌকোটা তার সঙ্গে তেমনি আচরণ জুড়ে দিয়েছে। 'যেমন শালা জোয়ারদার, তেমনি তার নৌকো।' হালটাকে বাঁ পাশে প্রচণ্ড একটা ঠ্যালা দিয়ে প্রচণ্ড একটা ঘূর্ণি পার করে দিল নৌকোটাকে।

ঝপাৎ করে কোথায় যেন শব্দ হল। কেউ জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল মনে হল। ভূগণের হাত কেঁপে উঠল হালের ওপর। চমকে উঠে ব্যাকুল উদ্বেগে চারদিকে নজর নিক্ষেপ করল। মনের ভুল নিশ্চয় নয়, কিন্তু এ কারো জলে ঝাঁপ দেবার শব্দও নয়। মালবওয়া নৌকোয় দু বছর কাজ করে জলের সমস্ত রকম শব্দের তফাৎ বুঝতে পারে ভূষণ। কোনটা ঘূর্ণির শব্দ, কোনটা সাঁতারের শব্দ, কোনটা ঝাঁপ দিয়ে পড়ার শব্দ, মাটি ধ্বসার শব্দ, কিংবা মাছ ঘাই দেওয়ার আওয়াজ, সব বুঝতে পারে ভূষণ। এটা পাড় থেকে মাটির চাঙড় খসে পড়ার শব্দ, বুঝতে পারল সে। তাই বলে নিশ্চিন্ত বা অসতর্ক হল না। করণ এই পীচের মতো আঁধার জলে গা ভাসিয়ে তারই মতো কেউ যদি এসে পড়ে, একজনের বেশী যদি এসে পড়ে, সামাল দেওয়া খুবই শক্ত হবে।

যেখানে বসে আছে ভূষণ ঠিক তার নিচেই ঘরখানার মধ্যে জোয়ারদারের আগলদার বাঁধা পড়ে আছে। কোন সাড়াশব্দ করছে না লোকটা। যেরকম শক্ত বাঁধন দেওয়া হয়েছে বাছাধনকে নড়াচড়া করতে হবে না। চ্যাচানির পথও বন্ধ। তাই বলে চুপচাপ শুয়ে আছে কি? যদি বাঁধন কোনরকমে ছিঁড়ে ফেলে? অবস্থাটা একবার দেখে আসতে পারলে হত। কিন্তু ঠাঁই ছেড়ে নামবার কোন উপায়ই যে নেই। ভূষণ ভাবনাটাকে আমল না দেবার চেষ্টা করল।

খালের পাড় ধরে দুপাশে বরাবর বাবলা পিটুনি আর অশথ-বটের ঘন সারি চলে গিয়েছে। গাছগুলো তেমন ঘনসন্নিবদ্ধ নয়, কিন্তু পুঞ্জীভূত অন্ধকার

এসে ওদের একাকার করে দিয়েছে। ওদেরই কোন অলক্ষ্য কোণ থেকে যদি একঝাঁক সড়কি-বল্লম ছুটে আসে ঘরের চাল লক্ষ্য করে? আর তার যে কোন একটাই যদি এসে বিঁধে যায় তো এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে যাবে ভূষণ। জোয়ারদারের লেঠেলগুলোর কিছু কিছু গুণপনার সঙ্গে পরিচিত ভূষণ। ওদের সড়কি-বল্লমের ফলাগুলো যেমন তীক্ষ্ণ আর ধারাল, তেমনি লক্ষ্যও ওদের অব্যর্থ। অন্ধকার বলে যদি টিপ ফসকে যায়, এই একমাত্র সান্ত্বনা।

না, আর ভাবতে পারে না ভূষণ। মাথার মধ্যে কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। বুকের ভেতরটা হাঁইপাই করেছে। আঁকুপাকু করছে। কপালের শিরাগুলো টনটনিয়ে উঠেছে। ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মতো এখুনি যেন সেগুলো পটপট করে ছিঁড়ে যাবে। হাতের পেশীতে রক্ত জমে গিয়েছে, মনে হচ্ছে।

সামনেই বাঁ হাতে একটা শ্মশান। ভূতের মতো একটা বটগাছ দাঁড়িয়ে আছে শ্মশানের মধ্যে। তলায় কালকাসুন্দের ঝোপ। ঝোপের মধ্য থেকে একটা খসখস শব্দ ভেসে এল। না, ভয় করবার কিছু নেই। গোটা চার পাঁচ শেয়াল নাড়াচাড়া করছে। মানুষ থাকলে অত কাছাকাছি শেয়াল থাককনা। মাটি খুঁড়ে মড়া তুলছে। ভূষণের মনে পড়ল আজ সকালেই হাড়িদের বছর পাঁচেকের একটা ছেলে মরেছে। অনাহারেই মারা গেছে। ছেলেটাকে কালকাসুন্দের ঝোপের পাশে মাটি দেওয়া হয়েছে। ওর বাপটাও মরতে বসেছে পেটের জ্বালায়, ভূষণ জানে। ভূষণ কাতরভাবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

কোথা থেকে একটা সোরগোল ভেসে আসছে না? হ্যাঁ, তাই বটে। ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে মিলিত কণ্ঠের হৈ চৈ ভেসে আসছে। ভূষণ শব্দের দিকে মনোযোগী কান পাতল। ঠিকই হয়েছে। চাষীরা ক্ষেত থেকে বুনো-শুওর তাড়াচ্ছে। অনেকটা দূরে মাঠের মধ্যে কয়েকটা আলোর আভাস। আলো জ্বালিয়ে চীৎকার করে শুওর তাড়াচ্ছে ক্ষেতে পাহারাদাররা।

আকাশের দিকে অকারণ তাকাল ভূষণ। অসংখ্য নক্ষত্র ফুটেছে। রাশী-কৃত ঘাসফুল ফুটে আছে যেন মাঠে। নক্ষত্র দেখে প্রহর নির্ণয় করতে পারল না সে।

এইমাত্র খালেক সাহেবের খটি পেরোল নৌকো। এইটিই গ্রামের সীমান্ত। এরপর জেলে পাড়া ফেলে পোয়াটাক পথ পুবমুখে এগোলে গাইঘাটার

মোহনা। খটির পর থেকে শ দুই গজ খালের দুধারে বরাবর নিবিড় বাঁশবন। লম্বা বাঁশের ডগলাগুলো দুধারে ঝেঁপে আসায় অনেকখানি জায়গা জুড়ে নিবিড় অন্ধকারের ভীড়। ভূষণের শ্বাপদ-চক্ষুও এর মধ্যে দিশাহারা হয়ে পড়ল। নৌকোর হাল, এমনকি নিজের শরীর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে না সে। এই জায়গাটাকেই সব থেকে ভয়। হঠাৎ-হঠাৎ গায়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ার পক্ষে এর চেয়ে ভাল জায়গা হয় না। রাতপাখীর ডাক, হাওয়ার দাপাদাপিতে বাঁশের গা শিরশির করা ধ্বনি, পাতা ঝরার খসখস শব্দ—সব মিলিয়ে বিচিত্র রাত্রির বাঁশবন। মাঝরাত যেন তার সন্তান-সন্ততি নাতিপুতি নিয়ে বাঁশবনের মধ্যে রীতিমতো একটা সংসার পাতিয়ে বসেছে। ভূষণ শরীরের সমস্ত ধমনীর রক্ত চলাচল রুখে দিয়ে শব হয়ে বসে রইল।

দেখতে দেখতে নৌকো প্রায় বাঁশবন পেরিয়ে এল। রাতচরা ভূষণ জলের মতো মাটির মধ্যেও সমস্ত রকম শব্দের তারতম্য বুঝতে পারে। মনটা কেমন কু গাইছে। বিপদের ঘ্রাণ পেয়ে বুকের ভেতরটা আথালি-পাথালি করছে। বাঁশবনের সুরু থেকে একটা দ্রুত অথচ নিঃশব্দ সঞ্চরণের শব্দ বরাবর অনুসরণ করে আসছে তাকে। শব্দটা বাঁশের পাতা ঝারও শব্দ নয়, পাখীর গলারও নয়। গিরগিটির মতো পা টিপেটিপে কারা যেন চলে বেড়াচ্ছে। আবছা মানুষের গলাও একবার শুনতে পেয়েছে সে। তাই যদি হবে, ভূষণ ভাববার চেষ্টা করল, এমন মওকা পেয়েও ওরা চড়াও হচ্ছে না কেন? এমনও হতে পারে, ভূষণ বোঝাবার চেষ্টা করল নিজেকে, এখানে যেমন আক্রমণের সুবিধে আছে, সে সুযোগ হয়তো ওরা দিতে নারাজ।

বাঁশবন পার হয়ে, গাঁয়ের জল নিকাশী পুল ডাইনে রেখে জেলেপাড়ার কাছে বাঁক ঘুরল নৌকো। দইঘাটার হদিশ এখান থেকেই মেলে। বড় জোর তিন শ গজ। কিংবা তারও কম। এখানে চর কিছু বিস্তৃত বলে গাছ-গাছালির জটলা কিঞ্চিৎ হাল্কা। মাথার ওপর অনেকখানি আকাশ। অন্ধকারও তেমন বুকচাপা নয়। কোম্পানীর বাঁধের ওপর বেলতলায় বসে এতরাতেও পাগলা কাঙাল জেলে গুণগুণ করে গান গাইছে। লোকটার ভয়ডর বলে কিছু নেই। পাগলের আবার ভয়? এত দুঃখের মধ্যেও হাসি পেল ভূষণের।

ভূষণ শব্দ করে হাসল না বটে, কিন্তু হঠাৎই ভয়টা চলে গেল তার। নিভাস্ত হয়ে উঠল সে। বেশ খোলামেলা বোধ করল নিজেকে। মধ্যরাত্রির গা জুড়োনো বাতাস এতক্ষণ পরে শরীরে কাজ করল তার। বুকটা আর তেমন

ধানাই-প্যানাই করছে না। গিরগিটির হাঁটার মতো নিঃশব্দ পায়ের সঞ্চরণও কখন যেন থেমে গেছে। খাল এখানে কিছুটা নাব্য বলে নৌকোর গতিও খানিকটা দ্রুত। কেমন একটা নিশ্চিন্ততার আবেশে চোখ বুজে ফেলল ভূষণ।

আবিষ্ট হয়ে কতক্ষণ ভূষণ ছিল মনে নেই, হঠাৎ চমকে চোখ মেলল সে। সামনে না পেছনে, কোনখানে ঠিক নেই, খালের একদিকের পাড় যেন সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ল। অসংখ্য বোয়াল আর ভেটকি লাফ কাটতে সুরু করে দিয়েছে যেন কোথাও। কিন্তু শব্দটা থামছে না তো! কলকল ছলছল আওয়াজ তুলে ঢেউয়ের মাথায় চড়ে এগিয়েই আসছে ক্রমশঃ। ভূষণের গলার কাছে একটা চীৎকার এসে থতমত খেল। ভূষণ কি বুদ্ধি হারিয়ে ফেলল?

খালের মধ্যে নৌকোটা ঘুরপাক সুরু করে দিয়েছে। হালের ওপর থেকে কখন হাতটা খসে পড়েছে ভূষণের। শ্বাপদ চোখের আঁধারভেদী চাউনি ভিজে কাঠের মতো চুপসে গেছে। ভূষণ কোনখানে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। বুকের ভেতরকার এক উদভ্রান্ত।

নৌকোর গায়ে একসঙ্গে অনেকগুলো ঢেউ আছড়ে পড়ল ধুপধাপ শব্দ। ছহাজারমণী নায়ের বিশাল শরীরটা দুলে উঠল একবার। কয়েকটা জমাট অন্ধকারমাখা ছায়া। বিদ্যুৎচমকের মতো ডান কোমরে আঁটা ছোরাটা ঝলসে উঠল ভূষণের চোখে।

আঁধারমাখা ছায়াগুলো আর কিছু নয়, জোয়ারদারের প্রতিহিংসা। না ভূষণের সেটা বুঝতে দেরি হল না।

প্রথম ঘাটা মাথা ঘষটে কাঁধের ওপর পড়ছে। কাঁধের খানিকটা হয়তো থেঁতো হয়েই গেল। ভূষণের মুখ থেকে একটা গোঙানি বের হয়ে এল। সেও ছাড়েনি। ছোরাখানা পাঁজরের উপর সজোরেই পড়েছে। লোকটা নৌকোর পাটাতনে চালের বস্তার ওপর কাটা পাঁঠার মতো তড়পাচ্ছে। কিন্তু ছোরাটা পাঁজরেই রয়ে গেছে, খুলে নিতে পারেনি ভূষণ। গায়ের জোরেই টেনেছিল সে, কিন্তু পাথরে গেঁথেছে যেন। ভূষণের হাতে গরম রক্ত।

টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল ভূষণ। ঝাঁপ দিয়ে পড়তে পারলে এখন প্রাণটা বেঁচে যেতে পারে। কিন্তু সারা শরীরে যেন পক্ষাঘাত। গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে যাবার চেষ্টা করল সে, আবার একটা লাঠির ঘা, পাছার ওপর। মুখ থুবড়ে পড়ল ভূষণ। শরীরটা হালের কাছে ঘরের গড়ানের

ওপর উল্টোমুখে ঝুলতে থাকল, আর ঝুলন্ত মুখ থেকে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে সুদীর্ঘ আ—আ—আ—ধ্বনি, যন্ত্রনার্ত গোঙানি বেরিয়ে এল। খালের জলস্রোত ছুঁয়ে গোঙানিটা কাঁপতে কাঁপতে ছুটল।

'আর একটু হলেই শালা পালিয়েছিল। খুব জোর সময়ে এসে পড়া গেছে।' অন্ধকারের মধ্যে কে বলে উঠল।

'আমাদের একটাকে তো নিয়েইছে, ও শুওরবাচ্ছাকেও খতম করে দে।' দাঁত দিয়ে কড়াই ভাঙছে যেন লোকটা।

মুখ দিয়ে রক্ত ঝরছে। কপাল চুল ভেসে গেছে ঘন আঠালো রক্তে। ভূষণ যেন ডুবে যাচ্ছে এক অনুভূতিশূন্যতার মধ্যে। সেই অবস্থার মধ্যেই আর একটা চোট খেল সে। এবার একেবারে সরাসরি মাথায়। ভূষণের ঝুলন্ত শরীরটা জলে টুপ করে খসে পড়ল। জলের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে ভূষণ। চেতনা তখন তার শূন্যতার চরমে গিয়ে পৌঁছেছে। অনেক দূরে আবছা একটু আলোর আভাসের মতো ভূষণের মনে হল। গাইঘাটার মোহনা থেকে জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে একটা হল্লা ছুটে আসছে। ওরা বোধ হয় টের পেয়েছে, যাদের অপেক্ষায় এতখানি পথ সে নৌকোটাকে টেনে এনেছে। চৈতন্যের শেষ আলোকবিন্দুটা সম্পূর্ণ মুছে যাবার আগে ভূষণ মনে করতে পারল তার গোঙানিটা ঠিক জায়গাতেই পৌঁছে গেছে।

নামিপদের পোশাক

মুনশি খগরাজ

কেজোপদের পোশাক আর নামি পদের পোশাক এক নয়। তবে পোশাক ছাড়াও কোন কোন ধাতু সরাসরি নামি পদের কাজ করে। নমুনা—

ডাক দাগ ছুট সাজ জিত ফল ধস মার টান ভিড় চাপ ঘুর ঘাম ঙহাক রাগ লুট মিল কাস হার বেড় ছাপ ছাট খেল মিশ ধার মাশ শাপ জপ তুল দুল ঝুল

কোন কোন ধাতু একটুখানি স্বর বদলে নামিপদে চলে আসে—

ভোগ>ভুগ, জোড়>জুড়, পোশ>পুশ, ঙখোজ>ঙখুজ, শোধ>শুধ

মোড়>মুড়, দোস>দুস, জোট>জুট, ঙগোজ>ঙগুজ

এবার কি কি পোশাকে ধাতু নামিপদে আসে তার হিশেবটা একটু দেখি—

(১) 'আ' পোশাকে—শোনা, বোনা, চেন, বেচা, কেনা, বসা, গড়া, চলা, কাটা, খাওআ, পাওয়া

(২) 'আই' পোশাকে—বাছাই, ঢালাই, ডলাই, মলাই, ঝাড়াই, লড়াই, পচাই, চড়াই,

(৩) 'আও' পোশাকে—চড়াও, ঘেরাও, ঢালাও, ফলাও,

(৪) 'ইএ' পোশাকে—গাইএ, খাইএ, নাচিএ, পড়িয়ে, লড়িএ,

(৫) 'উ' পোশাকে—ঢালু, চালু,

(৬) 'উআ' পোশাকে—পড়ুআ, লড়ুআ,

(৭) 'অক' পোশাকে—চালক, পালক, ঘটক, চড়ক, দোলক, মোড়ক, জোটক, জমক,

(৮) 'অট' পোশাকে—বুনট, চাপট

(৯) 'অন' পোশাকে—মরন, গড়ন, ভজন, চলন, মাজন, ভাঙন, পচন, ঝাড়ন, ওবাধন,

(১০) 'অস' পোশাকে—খোলস,

(১১) 'আট' পোশাকে—জমাট, ভরাট,

(১২) 'আন' পোশাকে—জানান, হেলান, চালান, চটান, ছাড়ান, কাটান, চাপান, ভোগান, ভাসান, ডোবান, ঠকান, গছান, ওকাদান, বকান, মানান, ঠেসান, খসান, খাটান, জপান, ঘোরান, বানান,

(১৩) 'আনো' পোশাকে—জানানো, ঘোরানো, ছাড়ানো, বানানো,

(১৩ক) 'আনি' পোশাকে—শুনানি, শাসানি, ভাঙানি, ঢলানি, ওচেচানি, চুবানি,

(১৪) 'আল' পোশাকে—মাতাল,

(১৪ক) 'আলো' পোশাকে—ঘুরালো

(১৫) 'উক' পোশাকে—ভাবুক, মিশুক,

(১৬) 'উনি' পোশাকে—চালুনি, খাটুনি, ওকাদুনি, ওরাধুনি, চিরুনি, বকনি, ঢুলুনি.

(১৭) 'উরি' পোশাকে—ডুবুরি, ধুনুরি, ফুলুরি,

(১৮) 'তা' পোশাকে—পড়তা, ফেরতা, করতা,

(১৯) 'তি' পোশাকে—কাটতি, কমতি, ঝরতি, পড়তি, উঠতি, ভরতি,

(২০) 'তাই' পোশাকে—খোলতাই, ধরতাই,

(২১) 'না' পোশাকে—ফেলনা, খেলনা, বাজনা, ঝরনা, ভাবনা, ওরাধনা (ওরাননা), বাটনা, ঢাকনা,

(২২) 'নি' পোশাকে—ছাকনি, ঢাকনি, ওরাধনি, (ওরাননি)

(২৩) 'বার' পোশাকে—খাবার,

(২৪) 'ওআ' পোশাকে—লাগোআ, ওবাচোআ,

(২৫) 'অড়' পোশাকে—চাপড়,

(২৬) 'ই' „ —হাসি, কাশি,

পোশাক সব সময়ই ধাতুর পেছনে জোড়াই রেওয়াজ কিন্তু কথনো কথনো ধাতুর মানে পালটাতে বা জোর দিতে কোন কোন পোশাক আগেই জুড়ে দেআ হয়।—অচিন, অচল, অটুট, অমিল, অবুঝ, অনড়, অটল, অঝর, অমর, অবাধ, সটান, সজাগ,

বহু নামিপদ বাইরে থেকে বাঙলায় আমদানি হয়েছে সেই সংগে অনেক পোশাকও এসেছে। সেই সব পোশাক বা এক পদে একটি বা একটির বেশি পোশাক চাপিএ নতুন পদ বানান হয়।

(১) 'অক' পোশাকে—পাঠক, গোলক, মড়ক,

(২) 'অট' পোশাকে—দাপট,

(৩) 'অর' পোশাকে—ঙকাসর

(৪) 'অল' পোশাকে—হাতল, ধুমল, ধকল,

(৫) 'অশ' পোশাকে—লোমশ, মুখশ, ডাঙশ,

(৬) 'আ' পোশাকে—পাগলা, হাতা, রোগা হাজিরা, বাদলা, জলা, ঝালা

(৭) 'আই' পোশাকে—ঝালাই, সদাই, ননদাই,

(৮) 'আচি' পোশাকে—বেঙাচি, ঘামাচি,

(৯) 'আনা' পোশাকে—নজরানা, গরিবানা, বিবিআনা. সা।লআনা, মালিকানা, মুনশিআনা,

(১০) 'আনি' পোশাকে—তলানি, পারানি, ভেঙচানি, কামড়ানি, নাকানি, ধমকানি,

(১১) 'আল' পোশাকে—ঙদাতাল, শিঙাল

(১২) 'আলা' পোশাকে—গোআলা, শদরালা

(১৩) 'আলি' পোশাকে—ফকিরালি, ভাটিআলি, গোড়ালি, মিশাল, মিতালি

(১৪) 'আরি' পোশাকে—ঙশাখারি ঙকাসারি, মাঝারি, কাটারি

(১৫) 'আড়ি' পোকাকে—বালুআড়ি,

(১৬) 'আমি' পোশাকে—পাকামি ঘরামি, পাগলামি, ফাজলামি, ইতরামি, ঙবাদরামি,

(১৭) 'ই' „ —দোকানি, চাকরি, দালালি, তেলি, ঢুলি, ফাকি, চালাকি, ফাশি,

(১৮) 'ইআ' „ —সবজে, হলদে, খাটিআ, দেড়ে,

(১৯) 'ইন' „ —রঙিন, গাভিন,

(২০) 'ইমা' „ —লালিমা, কালিমা,

(২১) 'ইনি' „ —ঙচাদিনি, রঙিনি,

(২২) 'ইলা' „ —রঙিলা,

(২৩) 'উ' „ —ঙসাতারু,

(২৪) 'উক' „ —লাজুক, পেটুক, চুমুক,

(২৫) 'উলি' „ —আধুলি, নিছুলি, গুহাস্থলি, বাড়িউলি,
(২৬) 'উরে' „ —হাটুরে কাঠুরে,
(২৭) 'উড়ে „ —সাপুড়ে, ফাগুড়ে, হাতুড়ে, ভুতুড়ে, খেলুড়ে,
(২৮) 'উড়ি' „ —হাতুড়ি
(২৯) 'উড়' „ —লেজুড়
(৩০) 'উআ' „ —খেনো, টেকো, মেসো,
(৩১) 'এল' „ —ঘায়েল, ফুলেল, লেঠেল, ভগেজেল, ভসিদেল,
(৩২) 'ওআর' „ —জানোআর, খেলোআর,
(৩৩) 'ওআন' „ —দারোআন, গাড়োআল
(৩৪) 'ওআলা' „ —দাড়িওআলা, দইআলা, পাহারাওআলা, বইওআলা ফিরিওআলা,
(৩৫) 'কি' পোশাকে—ফুলকি, ঢুলকি, হুমকি
(৩৬) 'কো' „ —কানকো, ফুলকো
(৩৭) 'কর' „ —বাজিকর, জাদুকর, রসুইকর, হালুইকর
(৩৮) 'কার' „ —পেশকার, গনতকার
(৩৯) 'কারি' „ —ফুলকারি, খোদকারি, ভিখারি (ভিখকারি)
(৪০) 'খানা' „ —জেলখানা, মুদিখানা, ছাপাখানা, কবরখানা, ডাকতারখানা, কশাইখানা, দফতরখানা, মুশাফির-খানা, তোশখানা, বারুদখানা
(৪১) 'খোর' „ —ঘুসখোর, নেশাখোর, গুলিখোর, চশমখোর, আফিঙখোর, সুদখোর, গাজাখোর
(৪২) 'গর' „ —কারিগর, সওদাগর, ওসতাগর
(৪৩) 'গার' „ —রোজগার, খিদমতগার
(৪৪) 'গি' „ —রাজগি, মাগগি
(৪৫) 'গিরি' „ —বাবুগিরি, কুলিগিরি, দারোগাগিরি. কেরানিগিরি, মুটেগিরি
(৪৬) 'চি' „ —তবলচি, মশালচি
(৪৭) 'চে' „ —লালচে, কালচে
(৪৮) 'জাদা' „ —নবাবজাদা, নামজাদা, শাহাজাদা, হারামজাদা
(৪৯) 'জাদি' „ —নবাবজাদি, শাহজাদি, হারামজাদি

(৫০) 'টে' " —ঘোলাটে, খেপাটে, ঝগড়াটে, ভাড়াটে, কশটে, ওআশটে, ওধোআটে, লমবাটে

(৫১) 'তা' " —নোনতা, রাঙতা, পানতা

(৫২) 'তি' " —শালতি, চাকতি, ঘাটতি, গুলতি, জালতি, বরসাতি

(৫৩) 'তুমি' " —ওগোআরতুমি

(৫৪) 'দার' " —দোকানদার, পাওনাদার, খরিদদার, বখরাদার, মজুতদার, আড়তদার, জোতদার, দিলদার, মজাদার, সমঝদার, ফুলদার, খবরদার

(৫৫) 'দারি' " —দোকানদারি, আড়তদারি, খবরদারি

(৫৬) 'দানি' " —ফুলদানি, পিকদানি, জলদানি, আতরদানি

(৫৭) 'দিহি' " —জবাবদিহি, নিশানদিহি

(৫৮) 'পনা' " —পাকাপনা, গিননিপনা, বুড়োপনা, হেঙলাপনা, নেকপনা

(৫৯) 'পানা' পোশাকে—রোগাপানা, মোটাপানা, হেঙলাপানা

(৬০) 'বাজ' " —ধাপপাবাজ, রকবাজ, মামলাবাজ, মতলববাজ, ফেরেববাজ, ধড়িবাজ, ফাকিবাজ,

(৬১) 'বাজি' " —গলবাজি, ফাকিবাজি, ধাপপাবাজি, ডিকবাজি, ভোজবাজি

(৬২) 'বান' " —মেহেরবান

(৬৩) 'বানি' " —মেহেরবানি

(৬৪) 'মি' " —ছেলেমি, নেঙরামি, জেঠামি

(৬৫) 'লা' " —পাতলা, মেঘলা, চাকলা, ছাতলা, একলা

(৬৬) 'লি' " —সোনালি, রুপোলি,

(৬৭) 'ড়া' " —রাজড়া, গাছড়া,

(৬৮) 'ড়ে' " —চাসাড়ে, বাসাড়ে

(৬৯) 'সা' " —ফলসা, ঝাপসা,মাকড়সা, ভাপসা

(৭০) 'সে' " —পানসে, ফেকাসে, কটাসে

(৭১) 'সই' " —টিপসই, মানানসই, মাপসই, জুতসই

(৭২) 'শাল' " —হাতিশাল, ঘোড়াশাল, টাকশাল, ওঢেকিশাল,

(৭৩) 'শালা' „ —পাঠশালা, গোশালা, কামারশালা, ধরমশালা

(৭৪) 'রু' „ —ওসাতারু, বোমারু

এবারে পদের গোড়ায় কি কি পোশাক জোড়া হয় একটু হিসেব নিলে হয়।

(১) 'অ' পোশাকে—অকাজ, অকাল, অবাক, অবিচার, অবেলা, অসময়, অতল, অবোধ, অরুচি

(২) 'আ' „ —আকাল, আলুনি, আগাছা

(৩) 'অন' „ —অনাহার, অনাদায়, অনাদর, অনাটন, অনিচছে

(৪) 'অনা' „ —অনামুখো, অনাছিসটি

(৫) 'কু' „ —কুদিন, কুকাজ, কুকথা, কুরুচি

(৬) 'গর' „ —গরমিল, গরহাজির, গররাজি

(৭) 'দুর' „ —দুরদিন, দুরনাম, দুরসময়

(৮) 'বি' „ —বিদেশ, বিবশ, বিবাদ, বিপাক, ওবিভুই

(৯) 'বে' „ —বেহুশ, বেহাত, বেনাম, বেআইন, বেগতিক, বেদখল, বেদম, বেঢপ, বেচাল, বেআড়া, বেখাপ, বেঠিক, বেহায়া, বেপরোআ, বেতার, বেহিশেব, বেতরিবত, বেকার,

(১০) 'নি' পোশাকে—নিখরচা, নিরোগ, নিথর, নিরস, নিটোল,

(১১) 'নির' „ —নিরলোভ, নিরবিবাদ, নিরঝনঝাট,

(১২) 'না' „ —নাখোশ, নাহক, নারাজ, নামনজুর, নালায়েক,

(১৩) নিম' „ —নিমরাজি, নিমখুন,

(১৪) 'রান' „ —রামদা, রামছাগল, রামশিঙা,

(১৫) 'স' „ —সচেতন, সরস, সঠিক, সতেজ

(১৬) 'সা' „ —সাবালক, সামিল, সাজোআন

(১৭) 'সু' „ —সুদিন, সুনাম, সুফল, সুকম, সুনজর, সুবোধ, সুজোগ

(১৮) 'হা' „ —হাভাতে, হাঘরে, হাপুতি

নতুন পদ বানানো ছাড়াও নামিপদের কয়েকটি পোশাক আছে, সেগুলি হল ওআতাতি পোশাক। ওআতাতি পোশাক দুজাতের। দুটো নামিপদের ওআতাতে আর নামিপদ ও কেজোপদের ওআতাতে একই পোশাক চলে না।

নামিপদে ও নামিপদে ওআতাতের পোশাক—

(১) 'র' পোশাকে—ননির, চিনির, মনির, তুলির, ধমুর, মমুর, তালার, জুতোর, তুলোর

(২) 'এর „ —পানের, হাতের, বাতের, ধানের, পায়ের, মাছের, গাছের

একটু নজর রাখলেই দেখতে পাই পদে লেজের স্বর বজায় থাকলে 'র' নইলে 'এর' পোশাক পরে।

নামিপদে ও কেজোপদে ঙআতাতের পোশাক—

(১) 'এ' পোশাকে—ঘরে, জলে, ফুলে, ফলে, হাতে, নাকে, মুখে, গাছে

(২) 'তে' „ —বাড়িতে, চটিতে, ঙহাটুতে, চিরুনিতে, চাটুতে

(৩) 'য়' „ —খেলায়, ধুলোয়, মোজায়, মাথায়

(৪) 'কে' „ —ননিকে, মধুকে, বাদলকে, শিলাকে

এখানে দেখতে পাই—লেজের স্বর না থাকা পদে 'এ' পোশাক—

লেজের স্বর—ই বা উ হলে 'তে' পোশাক

লেজের স্বর—আ বা ও হলে 'য়' পোশাক

কোনো লোকের নাম হলে—'কে' পোশাক।

জন্মকাল

শ্যামসুন্দর দে
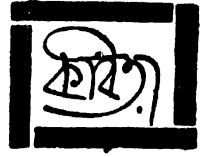
সে দিন দুরন্ত জ্বালা পৃথিবীর বুকে
অসহ্য উত্তাপ আর আবর্তন—
আবর্তনের প্রবল ঘূর্ণিতে তখন
বিচ্ছেদের যন্ত্রণায় জন্ম নিল
এক নতুন গ্রহ
যার দিকে চেয়ে চেয়ে শাস্তি পেল
ম্লান হল যন্ত্রণার কাহিনী।

এখন আমরা এক যন্ত্রণার কালে।
যখন এক একটা মন
ক্রোধের তাপে উত্তপ্ত
সময়ের চেতনায় বিস্ফোরণের বাসনা
ক্রোধ আর যন্ত্রণায়
একটি নতুন পৃথিবীর সৃষ্টি
যার আলোয় সে নিজেকে বাঁচাবে।

ফিরিয়ে দে
দীপেন রায়

ফিরিয়ে দে নৌকা-মাঝি-লোক-লস্কর
ময়না-টিয়া
ফিরে যাবো নগরে লৌকিকে ।
গাছের মধ্যে ভালোবাসার তোরই তো চোখ
ফেরানো আছে মূলে ।
স্বেচ্ছাচারী রৌদ্রে আমার
ভালোলাগে না ঘর মজানো ছুটি ।
তেপান্তরের হাড় শুকোনো বাঁশী
সাজে না আর মাঠের মধ্যিখানে,
একলা পোষা নীলের বাহাদুরী
ছড়িয়ে পড়ে আতর মাখা মুখে ।

ফিরিয়ে দে জন্মদিনের গা আটকানো জামা
বুকের মধ্যে ছুটে যাবো,
ছড়ানো সংসারে
জলের মায়া তোরই তো হাত
উপুড় হ'য়ে ঝরে,
গাছের মধ্যে অজস্র তুই
নিজেই ভালোবাসা ।

দিনবদলের পূর্বাভাস

প্রভাত চৌধুরী

আমরা এবার পথে নেমেছি হাওয়া বদলে
সময় পাখি মুখ লুকিয়ে ডানা ঝাপ্‌টায়
দিনবদলের পূর্বাভাস
ক্ষেতের কিষাণ কলের মজুর যুক্ত আছি
যুক্ত আছি ছা-পোষা সব শহরবাসী

আর্তনাদে মুখ ফিরিয়ে দীর্ঘকাল রোদ সয়েছি
রোদের আঁচে পেট পুড়েছে
ছাঁচ ভেঙেছে ঘরের চালার
ঝড় দেখেছি গ্রামশহরে একইরকম কলথামারে

যুক্ত হলাম রোদের তাপে ঝড়ের ডাকে
পটের লক্ষ্মী ঘটের ঠাকুর শঙ্খ বাজাও
বরণডালায় সাত এয়োতি বরণ কর
দিনবদলের পূর্বাভাস
মাঝি এখন খুলতে পারো ঘাটের নাও।

সময় এবং আলোকবর্তিকা বিষয়ক কবিতা

মুকুল গুহ

(১)

এইমাত্র যে সমস্ত পথচারীদের মধ্যে দিয়ে তুমি এসেছ
তাঁদের মুখ মনে রেখ ;
বাসস্ট্যাণ্ডে অপেক্ষায় তোমার নিকটে যাঁরা দাঁড়িয়েছিল
তাঁদের মুখ মনে রেখ ;
আমার প্রবাস সময়ে যে সমস্ত ফুল ফুটে উঠবে
প্রিয় উদ্যানে,
তারা শুদ্ধ জ্ঞান এবং বিবেকের মতনই ধ্রুব,
যদি কাঁদতে হয় তাদের মুখ মনে রেখ।

(২)

মুঠোর মধ্যে ডালিমদানা ফেটে চৌচির দুঃখ নোংরাচ্ছে মার
গরদশাড়ী, মুখের হাসি দেখতে ব্যাকুল দিন ফুরোলে সোনাকাজল
আমার বাবার বুকের ভিতর আমারই ভিড়, সারাসময় আলতো রাখেন,
ক্রয়বাসনা সত্যিই ছিল গত শীতে গরমমোজা চেয়েছিলেন, হয়নি কেনা—
ভুল ভাঙলে ভুল, ব্যস্তবাগীশ তোমরা যখন ফিরিয়ে দিলে দুরন্ত সংসার,
উষ্ণ হাতে স্পর্শ করেন ডাক দিয়েছেন কোমলস্বরে···খোকা আমার খোকা

(৩)

বুকের মধ্যে স্রোতস্বিনী উথাল পাথাল প্রাণ পেয়েছে প্রতিমা
রণচণ্ডী ; হলুদপাখী বসছে এসে মণিবন্ধে সময়াবতার
কথা শুনুন, অরণ্যপথ আপনি চেনেন ! নাইবা হোল আলোকোজ্জ্বল,
হলুদপাখী বলবে কি সে অকস্মাৎ বসল কেন উড়ে এসে মণিবন্ধে,
বেশত ছিলাম গাঁয় গেরামে বন্যা প্লাবন ফসলভর কড়িখেলায়
সারা শরীরে নদী বইছে কে পুরোহিত প্রাণ পেয়েছে প্রতিমা রণচণ্ডী
সময়াবতার কি করি তার হলুদ পাখী বসল কেন··········

যাত্রার পূর্বে

আশিস সেনগুপ্ত

এ ভাবে দু পকেটে হাত গুঁজে
অবশ আঙুলগুলোকে আর
প্রশ্রয় দিওনা বন্ধু,
না, কোনো করমর্দন নয় কিম্বা বন্ধু সম্ভাষণ
অপরিচ্ছন্ন ঘেমো হাতে একটু মুক্ত বাতাসের
শীতলতা লাগুক ;

নিশ্চিত বিশ্বাসের দৃঢ়তা আনতেই হবে :
সেই শীতলতা শ্বেত সমাপ্ত পণ্যবাহী জাহাজকে
ভাসিয়ে দিয়ে নোনা ঢেউয়ের জলন্ত ফস্‌ফরাস্‌
যে উত্তাপের জন্ম, তা এই চার চৌক নগরীর গর্ভে
বন্দরে ভীড়বে। 'ভাসমান' 'ভাসমান' ডাক ছাড়ার মত
দিক্‌বিদিকে সময়াভাব

তুমি দিগন্ত নাবিক, দূরবীক্ষণে
অবুঝ অসহিষ্ণু কিম্বা ক্লান্ত হোয়ো না।
সবে অন্ধকার রাত অন্ধকার বুঝতে শিখেছে।

চলো, যাত্রার পূর্বে
কীচকের রক্ত মাংস আকণ্ঠ পান করে
সেই গুপ্ত ঘাতক অরণ্যে ফিরে যাই—
যেখানে বৃদ্ধ ঘোড়াদের মৃতদেহের উপর
সবুজ ঘাস আর সফেদ কাশ ফুলেরা
আনন্দে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছে।
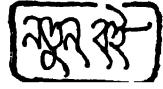
বিষুবে রৌদ্রের ডালপালা [কাব্যগ্রন্থ]—তুলসী মুখোপাধ্যায় ॥
গ্রন্থজগৎ ১৯ পণ্ডিতিয়া টেরেস কলকাতা-২৯ ॥
দাম : দু টাকা পঞ্চাশ পয়সা ॥

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার চেহারা এখন দ্রুত পালটে যাচ্ছে। পুরোনো শব্দব্যবহার, স্মৃতিচারণা এবং তার অনুষঙ্গে আর কেউ তেমন সন্তুষ্ট নয়। সকলেই চান ব্যক্তিহৃদয়ের উন্মোচন, স্বতন্ত্র উচ্চারণের ভঙ্গী ও সার্থক চিত্রকল্পের ব্যবহারে কবিতাকে নিজস্ব নির্মাণকৌশলে প্রতিষ্ঠিত করতে।

তুলসী মুখোপাধ্যায় কবিতা লিখছেন এই মননশীলতার পরিমণ্ডলে। তাঁর কবিতা কিছুটা প্রথাভঙ্গের এবং প্রতিবাদের কিছুটা ধ্বংসের এবং পুনর্নির্মাণের।

অবশ্য এখানে 'ধ্বংস' শব্দটি আমি সাধারণ অর্থে ব্যবহার করতে চাই না, গূঢ়তর অর্থেই তা ইঙ্গিতময়। কবিতার পুরোণো ছাদ ভেঙে দিয়ে পটভূমি তিনি তৈরী করতে চান বলে আমার বিশ্বাস। পূর্বজদের কাছ থেকে অনেক ধ্যানধারণা গ্রহণ করেও তিনি কথা বলেন নতুন কণ্ঠস্বরে। হৃদয় এবং উপলব্ধির উদ্ঘাটন প্রয়াসে তাঁর কবিতা অনেক বেশী আন্তরিক ও অকৃত্রিম। নিজেকে জানার মধ্য দিয়েই তিনি সমকালীন মানুষ ও পৃথিবীকে উপলব্ধি করেন বুকের মধ্যে।

'আত্মপ্রতিকৃতি' কবিতার প্রথম স্তবকে তিনি লিখেছেন : "নিজেকে দেখার মতো অতি বড়ো অভিমান / অদ্যাবধি পৃথিবী চাক্ষুষ করেনি। / নিজেকে চেনার মতো দ্বিতীয় যন্ত্রণা কোনো / বেদ ও পুরাণে লেখা নেই। / আত্মপ্রতিকৃতির মতো ভয়ঙ্কর ক্রুশকাঠি / কোনো দক্ষ মিস্ত্রীর হাতে এখনো আসেনি।"

গদ্যের কর্কশতা তাঁর কবিতার অবয়ব নির্মাণে একটি মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। অপ্রচলিত এবং অতি-প্রচলিত কথ্যউচ্চারণের গতিময়তাকে তিনি আত্মস্থ করেছেন জীবন ও কবিতার যুগ্ম প্রয়োজনে। মাঝে মাঝে তিনি

নিজের ছলনাকে আবিষ্কার করে যেন নিজের প্রতি বিরূপ হয়ে পড়েছেন। আসলে, তিনি বুঝতে পেরেছেন নিজেকে চিনতে না পারলে অন্যকে চেনাও সম্ভব নয়। সেজন্যই তিনি একটি দর্পণের খোঁজ করেন, যেখানে তার ছায়া পড়বে অকৃত্রিম নগ্নতায়। আত্মপ্রতিকৃতির শেষ স্তবকে তাই তিনি ঘোষণা করেন; "নিজেকে দেখার মতো অদ্বিতীয় অভিযান / অদ্যাবধি পৃথিবী চাক্ষুষ করেনি।"

অনেক দুঃখের মুহূর্তে তিনি স্মরণ করেছেন তাঁর ছেলেবেলার সময়কে। কয়েকটি কবিতায় বাল্য-কৈশোরের দিনগুলি অম্লান ও উজ্জ্বলতার রঙে চিত্রিত।

হয়তো তাঁর তীক্ষ্ণ সামাজিকতা বোধ এবং আত্মসচেতনতাই তাঁকে মানুষের অন্ধকার দিকগুলি সম্পর্কে অধিকতর সতর্ক হতে সাহায্য করেছে। মুখোসের অন্তরালে যে সত্য-মানুষের অবস্থান তাকেই তিনি খুঁজে পেতে চান।

তাঁর কবিতার মৌলপ্রত্যয়ে সর্বদাই ক্রিয়াশীল থেকেছে এই আত্মানুসন্ধানের মনোভাব, যা তার ব্যক্তিত্ব গঠনেরও প্রধান উপাদান। অতি পরিচিত ঘটনা এবং পথ চল্‌তি মানুষের আচমকা উক্তি তাঁর চিন্তা ও কাব্যবিবেককে বারবার উদ্বুদ্ধ করেছে। এ ধরণের কয়েকটি কবিতা হলো 'যাওয়া হয় না' 'প্রকৃত মানুষ থেকে' 'আপোষ! আপোষ!' 'বরং বেরিয়ে যাই' প্রভৃতি।

আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কবিতাকে পছন্দ করি তাঁর স্বরস্বাতন্ত্র্য ও মানুষকে চেনার দুর্লভ দৃষ্টিশক্তির জন্য। আমি তাঁর কবিব্যক্তিত্বের জন্য উল্লাস বোধ করি।

বইটির ছাপা কবিতা পাঠকের মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। মাঝে মাঝে মুদ্রা প্রসাদ অমার্জনীয়। প্রচ্ছদ এঁকেছেন পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়। আমরা তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থের জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করবো।

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

তুমি কান্না গতি বারুদ। শ্যাম রায়। জ্ঞান-তীর্থ। দাম তিন টাকা।
একটা গুলির শব্দে। বাসুদেব দেব। গ্রন্থ-নিলয়। দাম দু টাকা।

একথা আজ বিদগ্ধ পাঠকমাত্রই স্বীকার করবেন যে বর্তমান কাব্যসাহিত্য আজ এক প্রতিশ্রুতিময় পরীক্ষানিরীক্ষার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছে।

অবশ্য এই নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতে গিয়ে কোনো কোনো কবি হয়তো কিছুটা দুর্বোধ্য হয়ে পড়েন। কিন্তু এই দুর্বোধ্যতাকেও মানিয়ে নেওয়া চলে, যদি উক্ত কবির রচনায় স্বাস্থ্যের সহজ পরিচয় পাওয়া যায়। আজকের কবিতায় বর্ণ, শব্দ, প্রচলিত ছক ভেঙেচুরে নানা রকম নিজস্ব উচ্চারণকে প্রতিষ্ঠা করায় এক চেষ্টা থাকছে। এ ছাড়া সামাজিক দায়িত্ববোধ আজকের কবিতার আর একদিকের বৈশিষ্ট্য। অথচ দেখা যায় হাল আমলেরই অন্য এক কবিগোষ্ঠী কাব্যরচনায় সমাজচেতনার ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে হেঁয়ালী ধরণের এক জাতীয় বিচিত্র ধূর্ত কবিতা (?) বিভিন্ন ব্যবসায়ী পত্রিকার মাধ্যমে সাহিত্য-বাজারে প্রচার করে চলেছেন। জীবন, মানুষ এবং সমাজের অভাবে এঁদের কবিতা আজ পাঠকদের কাছ থেকে বহু দূরে সরে গেছে। আবার এটাও সত্যি যে, বহু তরুণ কবি তাঁদের একান্ত নিজস্বতায় স্বচ্ছ এবং সৎ কবিতা রচনায় বিশ্বাসী। স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলি একে।

আলোচ্য বই দুটির মধ্যে 'ভূমি কান্না গতি বারুদ'-এর কবি শ্যাম রায় রোমান্টিক। তাই বলে তিনি তাঁর পরিচিত জগত, পরিবেশ ও জীবনকে তুচ্ছ করে রোমান্সের তটিনী স্নানে ডুবে থাকেন নি—আর এইখানেই তাঁর সার্থকতা। কবি তাঁর কাব্যগ্রন্থকে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। 'ভূমি' অংশে কবি রোমান্টিক হলেও সামাজিক দায়িত্ববোধকে পাশ কাটিয়ে যান নি; যেমন,

১। "ছায়া ছবির গোহালে রসিক-বাছুরের কিউ।"

২। "শব্দের প্যারাসুটে ঝোলাঝুলি সেরে গুহায় ফেরা,"

৩। "কাঁচুলির কলঙ্ক বন্ধন মুক্ত নিঃশ্বাসে"

৪। "রসিকতা ক'দিনের কথা? নিশুক্ক বারুদই জীবন", ইত্যাদি।

শ্রীরায় স্বচ্ছ, সৎ কবিতা রচনায় বিশ্বাসী। আরো উদাহরণ দিই—"আমরা কি হিসেবের খাতাতে বাম থেকে একটু সরে এসেছি"......"সে রয়েছে পড়ে মহান শক্তির আশ্বাসে,"......"জঞ্জালের পাশে নেড়ী কুকুরটির সঙ্গে / সেই ভিক্ষুকটি যে অবশিষ্ট খাদ্য খোঁজে," ইত্যাদি। এ ছাড়া গলি থেকে ১৯৬৫, দপ্তর ও ঘর, ময়দান, ক্ষুদ্রের জোয়ার, অস্তিত্ব, মসৃণ অবতরণ এবং সিগ্‌নাল প্রভৃতি কবিতাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রতীক ব্যবহারের ক্ষেত্রে কবি 'ধান' শব্দটিকে বেশ কয়েকবার ব্যবহার করেছেন। সবক্ষেত্রেই যে

অভীষ্ট লক্ষ্যটি সার্থক হয়েছে তা নয়, তবে অনুভূতির সম্প্রসারণ ক্ষমতায় প্রায়ই তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন। কবি তাঁর সততা এবং স্পষ্ট বক্তব্যের জন্য যে সমাদর পাবেন, যে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

প্রেম এবং প্রকৃতির অনুভব প্রধান প্রেরণা হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে বাসুদেব দেবের কাব্যগ্রন্থ "একটা গুলির শব্দে"। বাসুদেব দেব মেজাজে কিছুটা আত্মকেন্দ্রিক কবি হলেও প্রায়শই মৃত্তিকমুখীও হয়েছেন। সুন্দর রূপকল্পের মাধ্যমে তিনি তাঁর বক্তব্যকে পাঠকের সামনে হাজির করেছেন। এই গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা এক অতৃপ্ত স্মৃতির অন্বেষণে নিবেদিত। তাই এখানে স্বাভাবিক ভাবেই প্রেমজাত মিশ্র বেদনা কবির সমস্ত সত্তার অনুভূতি। বাসুদেব দেবের কবিতায় আবেগ গভীর থেকে উদ্ভূত সংযমবোধের পরিচয় রেখেছে। যেমন,

"দুঃখের বিচিত্র বর্ণে প্রেমিকের মুখচ্ছবি আঁকা," এবং "প্রতীক্ষায় আছি, সর্বদাই মনে হয়, অসন্তুষ্ট, লোভী," কিংবা "আমাকে দাও সেই সাবলীল ভেলা বেহুলা গো, রক্তে নাচে বিষ", ইত্যাদি।

আজকের দিনের কবির কাছে জগত, জীবন এবং জীবনের পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে সাধারণভাবে আমরা যে বলিষ্ঠতা আশা করি তা এই গ্রন্থে স্পষ্ট নয়। তবে কবির সামাজিক দায়-দায়িত্ব সম্বন্ধে তিনি একেবারে উদাসীন একথাও বলা যায় না—কারণ বর্তমান সামাজিক বিপর্যয়ের দিকে তিনি চোখ রেখেছেন। যেমন, "সভ্যতার শেষ অবধূত যাচ্ছে ঢাকা রাত্রির ফিটনে" এবং "একটা বুলেট বেচে আরো দেড় সের গম খরিদ করুন," কিংবা "টেরিলিনের ভাজ ভাঙ্গে না—সভ্যতা খুব দুরন্ত" ইত্যাদি। এই পর্যায়ে—বন্ধুদের প্রতি, জতুগৃহ, অলৌকিক বীণা, মধ্যরাতের সংলাপ থেকে এবং একটা গুলি বিশেষ আকর্ষণ করে—অর্থাৎ, বাসুদেব দেব যে স্বচ্ছ এবং সৎ কবিতা রচনায় বিশ্বাসী কবিতাগুলি তারই প্রমাণ।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
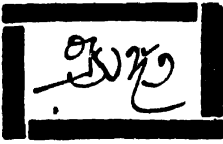
সাম্প্রতিক নাটক

অভিনয়-দর্পণে বলা হয়েছে—

"কীর্ত্তি প্রগল্‌ভ সৌভাগ্য বৈদগ্ধানাং প্রবর্ধনম্‌।
ঔদার্য্য স্থৈর্য্য ধৈর্য্যাণঞ্চ বিনাসস্থ চ কারণম ॥"

আজকের মানসিকাতাও নাটকের অভিনয়ের জন্য উপরোক্ত কারণগুলিই নির্দিষ্ট করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আলোচনা সমালোচনা অনেক হ'লেও বাংলা দেশে নাট্যকারেরা নাটক লেখার সময় বোধহয় উপরোক্ত কথাগুলি মনে রাখেন না।

নাটক দৃশ্যকাব্য ; অভিনয়ের ওপর তাকে অনেকটা নির্ভর করতে হয়। বহু তৃতীয় শ্রেণীর নাটক শুধু অভিনয়ের গুণে জনসমাজে বহুল আদৃত হয়েছে এমন নজির বাংলা দেশে আছে। আবার বহু সাহিত্য রসসমৃদ্ধ নাটক আজও সু-প্রযোজিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র বা যোগেশ চৌধুরীর নাটকগুলি এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

বর্তমানে বাংলা দেশে চলচ্চিত্রের পরই জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক মাধ্যম হিসাবে নাটকের স্থান। রেডিওর কল্যাণে সপ্তাহে যে চার পাঁচটি নাটক আমরা শুনি তার অধিকাংশই অসংখ্যবার পুনরাবৃত্তির দোষে দুষ্ট। আর সেখানকার অভিনয়রীতিও সেকেলে, অনেক সময়ই হাস্যকর। ব্যতিক্রম মাঝেমধ্যে দেখা যায়। সম্প্রতি ঋত্বিক ঘটকের "জ্বালা" নাটকটি এর নিদর্শন।

এছাড়া আছে পেশাদার মঞ্চ। তার সব ক'টিই কোলকাতায়। (সম্প্রতি শালকিয়াতে একটি নূতন মঞ্চের উদ্বোধন অবশ্য হয়েছে)। এক মিনার্ভা ছাড়া এর কোনটিই গিরিশচন্দ্র বা শিশিরকুমারের অভিনয়রীতির বাইরে আজও বেরুতে পারেনি। যদিও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে মাঝে মধ্যে চমক সৃষ্টি করার কৃতিত্ব এদের আছে। বক্তব্যহীন সামাজিক (!) নাটকই এঁরা সাধারণতঃ করেন। কৃতী অভিনেতার একক অভিনয়ই এঁদের মূলধন।

একমাত্র মিনার্ভা থিয়েটারে একটি প্রতিষ্ঠিত অপেশাদার দল পেশাদারী ভিত্তিতে আঙ্গিক ও বক্তব্যবহুল নাটক মঞ্চস্থ করে চলেছেন।

নাটকের ক্ষেত্রে যা কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা হচ্ছে, তার প্রায় সবটুকু কৃতিত্বই অপেশাদার দলগুলির। ১৯৬৭ সালে প্রায় শতাধিক দল কোলকাতায় অন্ততঃ ১১৬টি নাটক মঞ্চস্থ করেছেনে ২৭টি দল। যে ১১৬টি নাটকের হিসাব আমাদের কাছে আছে তার মধ্যে নিম্নলিখিত নাট্যকারদের নাটক আমরা পেয়েছি—রবীন্দ্রনাথ—৭টি; দ্বিজেন্দ্রলাল—১টি (একই নাটক দুইটি দল মঞ্চস্থ করেছেন); অমৃতলাল—২টি; আধুনিক কথাশিল্পীর গল্প বা উপন্যাসের নাট্যরূপ—৭টি; বিদেশী নাটকের ভাবানুবাদ—অন্ততঃ ১৪টি (তার বেশীরভাগই অবশ্য অনুবাদক কর্তৃক স্বীকৃত নয়)। আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যে শ্রীবাদল সরকারের নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে দুটি আর শ্রীমোহিত চট্টোপাধ্যায়ের ৬টি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য শ্রীসরকার ও শ্রীচট্টোপাধ্যায় উভয়ই এ্যাবসার্ড নাট্যকার হিসাবে খ্যাত।

এত নাটক মঞ্চস্থ হওয়া সত্ত্বেও এটা ঘটনা যে মনে রাখবার মত যুগান্তরকারী নাটক আজও বাংলা দেশে লেখা হয়নি, হওয়ার কোনও লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। মঞ্চস্থ হবার তো কোন প্রশ্নই আসেনা। প্রথম আবির্ভাবে দু'একজন যদিও বা কিছু চমক সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু স্থায়ী কোন কীর্তি তাঁরা কেউই রাখতে পারেননি।

সবচেয়ে চিন্তার কারণ ঘটেছে ভাবানুবাদের হিড়িকে। তারও বেশির ভাবাই মূল নাটকের নাম উল্লেখ না করেই অনুবাদ। আগে ভাবতাম এটা বুঝি হিন্দি সিনেমারই একচেটিয়া। কিন্তু প্রথম শেরউডের 'পেট্রিফায়েড ফরেষ্ট' পড়ার পর জানলাম বাংলা নাটকেও এ কায়দা চলছে। আর তাই বাঘের নাট্যকার মারে সিস্‌গালের 'দি টাইগারের' কথাও বেমালুম চেপে যান। কিম্বা দ্বীপের নাট্যকার সিমনভ-এর 'দি ফোর্থ' এর কথা স্বীকারও করেন না। অথচ এই নাট্যকারের নিজের নাটকগুলি বিদেশে অভিনয়ের সময় তাঁরা মূল নাটকের কথা স্বীকার করেন। এবং ভাবানুবাদের ধার দিয়েও যান না। অনুবাদেই সন্তুষ্ট থাকেন। প্রশ্ন হ'ল, যদি গ্রীক নাটক গ্রীক পাত্রপাত্রীদের রেখে বা শেক্সপীয়ারের ওথেলো কি ম্যাকবেথ শুধু অনুবাদ করেই অভিনয় করা যায় তবে হঠাৎ আধুনিক নাটকের ভাবানুবাদের কি প্রয়োজন? মাদার তো আমরা রুশ দেশের পটভূমিকাতেই করি।

আর ওঁরাও শকুন্তলা কি মৃচ্ছকটিক এমন কি রবীন্দ্রনাথের নৌকাডুবি ভারতবর্ষের পটভূমিকাতেই মঞ্চস্থ করেন। একি শুধু কপিরাইটের জন্য? মূল নাট্যকারকে ফাঁকি দিতে অনুবাদকের চালাকি? সবচেয়ে মজার কথা, এই অনুবাদকেরা অনেকেই সারাজীবনে একটাও নাটক নিজে ভেবে লিখতে পারেননি; অথচ তাঁরা বাংলা দেশে নাট্যকার বলে স্বীকৃত।

অনেকে বলেন বিদেশী পাত্রপাত্রী নাকি বাংলা দেশের দর্শক এ্যাকসেপ্ট করবেন না। এটা তাঁদের কতটা তথ্যনির্ভর জানি না। কিন্তু আমরা দেখেছি বিদেশীরা শকুন্তলা বা নৌকাডুবিকে এ্যাকসেপ্ট করেন। এদেশের দর্শক রাজা অয়েদিপাউস বা ওথেলোকে এ্যাকসেপ্টই করেছেন। শুধু বেচারা চেখভ কি সিয়ান ও কেসী বা সার্ত্র কি দোষ করলেন? উইলিস হাল কি সিমনভেরা জানতেই পারলেন না তাঁদের নাটক বাংলা দেশে অভিনীত হয়ে হাততালি কুড়িয়ে চলে গেছে। প্রিষ্টলে, টেনেসি উইলিয়ামস কি আর্থার মিলার সবারই একদশা। এই উঞ্ছবৃত্তি কতদিন চলবে জানি না। আরও একটা ব্যাপার আছে যেটা শিল্পের দিক থেকে খুবই ক্ষতিকারক। সেটা হ'ল মূল নাটক লেখার সময় নাট্যকারকে যে পরিপার্শ্বিক বেছে নিতে হয় সেটা সবদেশে সমান নয়। সার্ত্র কনডেমড অব আলতোনা লেখেন জার্মানির পটভূমিকায়, কারণ ফ্রান্সে মনোপলি ক্যাপিটাল জার্মানির পর্যায়ে যায়নি। ফরাসী নাট্যকার যে ঘটনাকে ফ্রান্সের পটভূমিকায় নিতে পারেন নি সেটার বঙ্গীকরণ সত্যিই অক্ষম নয়, হাস্যকরও বটে। শিক্ষা তো আমরা বিদেশের ঘটনা থেকেও নিতে পারি। বাংলা দেশের পটভূমিকায় কেউতো ভিয়েতনামের যুদ্ধ দেখাতে বসেন না। বাংলা দেশের নাট্যকার, সমালোচক এমনকি দর্শকদেরও এই প্রশ্নগুলি ভেবে দেখা দরকার বলে বোধ হয়।

প্রদীপ্ত সেন

'মুক্তমেলা প্রসঙ্গে'

বাংলা সাহিত্যের অন্ধকারের পথিকেরা সম্প্রতি নতুন এক খেলায় মেতেছেন। শনিবারের দুপুরে কোলকাতার ঘোড়-দৌড়ের মাঠে যখন রেসুরেদের জুয়া-খেলা চলছে, এঁরা তখন ময়দানের নির্জনতায় মুক্তমেলার আসর সাজিয়ে যৌন-খেলায় উর্দ্ধবাহু তাণ্ডব শুরু করেছেন। এই বিকৃত মানসিকতার প্রধান পৃষ্ঠপোষক বাংলাদেশের একটি জাতীয়তাবাদী পত্রিকা-গোষ্ঠী—প্রচারের ঢাক এঁরাই কাঁধে নিয়ে লোক জড়ো করার প্রসাসে আপ্রাণ গলাবাজি করে চলেছেন। প্রতি শনিবার এই মেলায় যাঁরা চটকদার পশরা সাজাচ্ছেন তাঁরা বাংলাদেশের তথাকথিত সাহিত্য-সংস্কৃতির নাম-করা আর উঠ্‌তি-নামের সাহিত্যিক-শিল্পীর দল। এঁদের মধ্যে বিবর-বিলাসী সমরেশবাবুরা যেমন আছেন তেমনি আছেন মার্কসবাদী (!) কবি প্রৌঢ় সুভাষ মুখোপাধ্যায়, আছেন ভারত-সরকারের সঙ্গীত নাটক একাদেমীর সভ্য 'বহুরূপী'-র মাননীয় শম্ভু মিত্র মশাই! জনৈক মার্কিনী ঢঙের চিত্রশিল্পী রংবেরঙের পোষাক পরে আদিম ক্ষুধার পটভূমিকায় মৃত্যু-মিছিল পরিচালনা করছেন। ভারত-বিখ্যাত একজন কম্যুনিস্ট-বিদ্বেষী প্রৌঢ়-কবির স্নেহচ্ছায়া মুক্তমেলার অঙ্গণে দীর্ঘায়িত এবং তস্য জামাতা এর প্রধান সংগঠক!

এইসব দেখে-শুনে সঙ্গতকারণেই বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষ মুক্তমেলার যৌন-মহোৎসবের পিছনে সি-আই-এর কালোছায়ার অনুমান করছে। সমগ্র বাংলাদেশের কৃষকমজুর ও মধ্যবিত্ত সমাজ যখন আজ নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ, বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার ভণ্ডামির জাল ছিন্ন করার জন্য যখন যুব-সমাজের লক্ষবাহু উর্ধে উৎক্ষিপ্ত, যখন শত-শহীদের রক্তে ভেজা বাংলার মাটিতে নতুন প্রাণের ফুল ফুটছে—তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে ময়দানের নির্জনতায় প্রতিক্রিয়াশীল-চক্রান্তের এ কোন্ নতুন ফাঁদ রচনা? বুর্জোয়া শোষক-গোষ্ঠীর গোপন-নির্দেশে সংগ্রামী যুবশক্তিকে বিপথগামী করার জন্যই কি এরা মুক্তমেলার নামে যৌন-লীলার আসর সাজাতে বসেছে? আর এই জন্যই কি মহামান্য আমেরিকান কন্সাল মুক্তমেলার শরিক হয়ে এই বিবর-বিলাসীদের আশীর্বাদ জানিয়ে গেছেন! এই আশীর্বাদ একেবারেই নির্ভেজাল অথবা এর সঙ্গে ডলারের কোন গাঁটছড়া বাঁধা আছে কিনা কে বলবে!

সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে, তার সাহিত্যে এবং চলচ্চিত্রে যৌনতার আসর এখন সরগরম। আমেরিকার রাস্তায় ঘাটে এখন টপলেস মনোহারিণীরা অবাধে সঞ্চারিত। হোটেলে-পার্কে সমুদ্রের তীরে এখন অবাধ যৌনলীলা। দিকে দিকে গড়ে উঠছে 'নুডিস্ট কলোনী'। সেই বিকৃত বীভৎস ইয়াঙ্কি কালচারের স্রোত এদেশে বইয়ে দেবার জন্ত অজস্র টাকা ঢালছে সি-আই-এ। আর তার সঙ্গে মদত দিচ্ছে জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগোষ্ঠীর বুর্জোয়া মালিকেরা। 'মুক্তমেলা' সেই ইয়াঙ্কি কালচারেরই বাংলা অনাচার!

আশার কথা, বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষ এই মেলার স্বরূপ চিনতে বিলম্ব করেন নি। ইতিমধ্যেই প্রগতিশীল পত্রপত্রিকার মাধ্যমে এই ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উচ্চারিত হতে আরম্ভ করেছে। হয়ত অনতি-কালের মধ্যেই এই প্রতিবাদ সক্রিয় প্রতিরোধের রূপ গ্রহণ করবে।

তপোবিজয় ঘোষ

রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙালী উচ্চাঙ্গ সংগীতের সমাদর করে না, অনুশীলন করে না, এ-অপবাদ বহু-প্রচলিত। বাংলার জন-জীবনের সঙ্গে সংপৃক্ত লোকসংগীত, কীর্তন, বাউল এবং রবীন্দ্র সংগীত প্রভৃতির অপেক্ষাকৃতভাবে অধিক প্রসারের জন্য যদি এ-অপবাদ হয়ে থাকে তবে তাতে কোনো ক্ষতি আছে বলে মনে করি না কারণ বৃহত্তর জনসাধারণের সঙ্গে যে-সংগীতের যোগ ক্ষীণ সেই উচ্চাঙ্গ সংগীত যদি সীমিত গোষ্ঠীতেই রুদ্ধ হয়ে থাকে তবে তাকে অস্বাভাবিক বলা চলে না, বরং তা অধিকতর কাম্য। কিন্তু আসল কথা, সে-অপবাদ বিচারসহ নয়। কারণ, এই বাংলা দেশেই আমরা ধ্রুপদী সংগীতকলার প্রথম শ্রেণীর বহু শিল্পীদের প্রত্যক্ষ করেছি। সেই সার্থকনামা শিল্পীরা ভারতীয় সংগীতকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদেরই অন্যতম ধারাবাহী ছিলেন বিষ্ণুপুরের স্বনামখ্যাত সংগীত নায়ক, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাঁরই সুযোগ্য পুত্র এবং তিনি বিষ্ণুপুরের ঐ সংগীতজ্ঞ পরিবারের আদর্শকে তাঁর নিষ্ঠা এবং সাধনায় বিশিষ্টতা দান করে গেছেন। গত ১৪ই জানুয়ারী তাঁর জীবনাবসানে এই সংগীত ধারায় একটা দীর্ঘচ্ছেদ পড়ল।

রমেশচন্দ্র মুখ্যত তাঁর পিতার কাছেই সংগীত শিক্ষা করেন। বিশেষ ভাবে শেখেন ধ্রুপদ ও খেয়াল, আর ভারত বিখ্যাত ধামার গায়ক বিশ্বনাথ রাওএর কাছে ধামার ও তিলানা' পদ্ধতি শিক্ষালাভ করেন। উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রতিটি বিভাগেই তিনি দক্ষতা অর্জন করেন। ভক্তিমূলক সংগীত, বিশেষ করে ভজন ও পুরাতন বাংলা গানে তাঁর পারদর্শিতাও উল্লেখের দাবী রাখে। তিনি সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসরাধিক কাল অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োর শ্রদ্ধেয় শিল্পী হিসাবে ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী, টপ্‌পা ও ভজন গানে শ্রোতাদের পরিতৃপ্ত করেছেন।

রমেশচন্দ্রের অন্যতম প্রধান পরিচিতি ছিল উচ্চাঙ্গ রবীন্দ্র সংগীতের নিষ্ঠাবান শিল্পী হিসাবে এবং সে সংগীতকে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে তাঁর দান অনন্ত। রবীন্দ্র সংগীতের উচ্চাঙ্গ ধারার সঙ্গে ক্লাসিক্যাল সংগীতের

স্বরূপ বিশ্লেষণ করে তিনি উচ্চাঙ্গ রবীন্দ্র-সংগীতের প্রচার ও প্রসারে যে প্রায় একক প্রচেষ্টা করে গেছেন তা সশ্রদ্ধ উল্লেখের দাবী রাখে।

রমেশচন্দ্র নিজে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না বলে তিনি সঙ্গীত জগতের জাত বিচারে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন সব সংগীতের মূল এক। তথাকথিত রাগ রাগিনীর মতভেদ ও বিভিন্ন শাস্ত্রমত সংগীতের, বহিরঙ্গ মাত্র, অন্তরঙ্গের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ সংগীতের প্রাণের প্রশ্নে সব সংগীতই এক এবং অভিন্ন, সেখানে রসানুভূতি এবং রসসঞ্চারই মূল কথা।

উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রতি জনসাধারণকে আকৃষ্ট করার সাধনায় তিনি আজীবন ব্রতী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন জনসাধারণ উচ্চাঙ্গ সংগীতকে একদিন অন্তর দিয়ে গ্রহণ করবে এবং তাঁরা সস্তা চটক-দারী সংগীতও একদিন বর্জন করবে।

বাংলা ও বাংলার বাইরের বহু পত্রপত্রিকায় সংগীত সম্বন্ধে তিনি নিয়মিত প্রবন্ধাদি লিখতেন। আমাদের পত্রিকারও তিনি একজন বহুমান্য লেখক ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'বিষ্ণুপুর—দ্বিতীয় দিল্লী' 'গোপেশ্বর গীতিকা' এবং 'বাণীবীণা'।

পশ্চিম বাংলার সংগীত নাটক একাডেমির প্রতিষ্ঠাকাল থেকে তিনি এর ফ্যাকালটি অব মিউজিকের ডীন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, পরে রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে এর রূপান্তর হবার পরও তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত এ-পদ অলঙ্কৃত করেন।

রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিয়োগকে আমরা স্বজন-বিয়োগ বলে মনে করি এবং তাঁর স্মৃতির প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই।

শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী

কবিয়াল গুরুদাস পাল

কবিয়াল গুরুদাস পালের জীবনদীপ নির্বাপিত হল বিগত ১৩ই ডিসেম্বর বিকেল ৪টায়। মাত্র ৫৪ বছর বয়সে।

তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান বাংলার মুষ্টিমেয় কয়েকজন খ্যাতনামা কবিয়ালের একটি বিরাট স্থান শূন্য হল। বাংলা লোককলার এই প্রশাখায় আপন সৃষ্টি ও প্রতিভায় যাঁরা বাংলা দেশের অগণিত মানুষের মনের কন্দরে অম্লান আসন করে রেখেছিলেন গুরুদাস পাল ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

শুধুমাত্র কবিয়াল হিসাবেই তাঁর পরিচিতি বা খ্যাতি ছিল না, উপরন্তু লোককলার অন্যান্য অঙ্গ—জারী, তরজা, সারি, গাজী ইত্যাদি গানেও ছিল তাঁর দেশজোড়া খ্যাতি। কৃষ্ণবর্ণ, ছোট্ট এই অল্প আয়ের বিড়ি-শ্রমিক মানুষটি তাঁর জীবনের ৭১টি বছর নিরলস, নিরহঙ্কার ও জাত শিল্পীর মত অসংখ্য সৃষ্টিপ্রবাহে গ্রাম-নগর-প্রান্তরের লক্ষলক্ষ মানুষকে একদিকে যেমন সাঙ্গীতিক রস বিতরণ করেছেন তেমনি তাদের মহত্তর জীবন ভাবনায় উদ্দীপিত করেছেন। দলিত-নির্যাতিত, নিরন্ন শ্রমিক কৃষক নিম্ন আয়ের মানুষের হৃদয়ে তিনি কয়েকটি যুগ ধরে যুগেরবন্ধন, নির্যাতন, শোষণ ইত্যাদির চিত্র তুলে ধরেছেন। নিরাশ, হৃতচিত্ত রিক্ত মানুষকে দ্রুততালে মহতী জীবন, দর্শন, সমাজ ইত্যাদিতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল স্থির, চৈতন্য ছিল স্বচ্ছ, এবং কর্তব্যকর্ম সম্পর্কে ছিল প্রগাঢ় আস্থা ও বিশ্বাস। আর সেই কারণেই গণশিল্পীর যতগুলি যোগ্যতা ও গুণ—তা তাঁর আয়ত্তে ছিল। সেই কারণেই তাঁকে দেখা গেছে শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্তের সংগ্রাম ক্ষেত্রে। প্রতিটি স্তরে, প্রতিটি ক্ষেত্রে, সংগ্রামকে কেন্দ্র করে তাঁর সৃজনধারা বিচ্ছুরিত হয়ে পড়েছে। এই কারণেই বাংলায় অন্যান্য কবিয়াল ও গণশিল্পীর থেকে গুরুদাস পালকে নিঃসন্দেহে পৃথক ও উল্লেখ্য স্থানে বসানো যায়।

১৯৩৩ সালে চারণকবি মুকুন্দদাসের সাথে তাঁর পরিচয় ও হাতেখড়ি। মুকুন্দদাসের দেশাত্মবোধে তিনি উৎসাহিত হন। কিন্তু শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গীর জন্ম ও তার পরিপক্কতা হয় কমিউনিস্ট নেতা নিত্যানন্দ চৌধুরীর মারফৎ। নিত্যানন্দ চৌধুরীই তাঁকে নতুন জীবনদর্শনে দীক্ষা দেন, গান রচনা ও গাওয়াতে উৎসাহ দেন। সেই সময় থেকে কমিউনিস্ট পার্টি, শ্রমিক, কৃষক ও নির্যাতিত জনমানুষের রণাঙ্গনে যোদ্ধার ভূমিকা নেন। ১৯৩৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যপদ লাভ করেন তিনি। ১৯৪৩ সালে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সংস্পর্শে আসেন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত ঐ সংগঠনে তিনি যুক্ত থেকে সাংস্কৃতিক জীবন বিকাশ করেন। ১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টির বে-আইনী যুগে তিনি 'সনাতন মণ্ডল' নাম গ্রহণ করে বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে কবি-গান গেয়ে বেড়াতেন। ১৯৪৯ সালে তিনি কারারুদ্ধ হয়ে প্রেসিডেন্সি জেলে যান।

পার্টি আইনীকরণের পর তিনি আবার নবউদ্যোগে জনমানুষের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন। 'কলকাতার খবর', 'জনযুদ্ধের কথা', ইত্যাদি গানগুলি

সারা বাংলাতে পরিচিতি লাভ করে। ক'লকাতার রেড-এড হসপিটালে থাকাকালীন রমেশ শীলের সাথে তাঁর পরিচয় হয়। পরবর্তী সময় শেখ গোমহানী, লম্বোদর চক্রবর্তী ইত্যাদির সান্নিধ্যও তিনি লাভ করেন। ঐ সময় কবিয়ালদের কাছ থেকে কবিগানের ফর্ম সম্পর্কে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন যদিও তাঁর কবিগান বা তরজায় একটি ভিন্ন স্বাদ ও চরিত্র ছিল,। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে, শ্রমিক-কৃষকের লড়াইয়ে, খাদ্যের দাবীতে, দুর্ভিক্ষ-বন্যার সাহায্যে, ছাত্র-যুবের আন্দোলনে—তিনি ছিলেন প্রথম সারির মানুষ।

গুরুদাস পাল শুধুমাত্র কবিয়াল ছিলেন না, তিনি ছিলেন সমাজ-সচেতক জনমানুষের প্রিয়তম বন্ধু—নেতাও। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলার লোকশিল্প জগত পরিবর্তিত যুগের সংগ্রামী কবিগান থেকে বঞ্চিত হয়ে রইল।

চিররঞ্জন দাস

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

চেক কবিতার আধুনিক প্রয়াসের এক গুচ্ছ অনুবাদের ভূমিকায় মোহনলাল লিখেছেন "...আজকের চেকোশ্লোভেকিয়া আপ্রাণ চেষ্টা করছে নতুন এক মানবিক এবং গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের জন্য যা মানুষের মধ্যে আরও উচ্চ মাত্রায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও আত্ম-ব্যঞ্জনা এনে দেবে, আর দেবে শুধু আধুনিক জীবনযাত্রার যান্ত্রিকতার প্রতি নয় বরং সব রকম কৃত্রিম এবং প্রাণশূন্য শ্লোগানের প্রতি ঘৃণা, যে ধরণের শ্লোগান শূন্য-গর্ভ অর্থহীন বড় বড় কুয়াশার আড়ালে মহৎ আদর্শকে আড়াল করে রাখে।"

মৃত্যুর মাত্র এক সপ্তাহ আগে লেখা কথাগুলি। যখন প্রগতির উপবীতধারীও নীরক্ত অ-ভাবুকদের মেলায় মুক্তকচ্ছ হয়ে নাচছেন তখন যথার্থ সংস্কৃতমনা ব্যক্তির অ-প্রগলভতায় তিনি তাঁর অনুবাদের উদ্দেশ্য ঘোষণা করলেন। যথার্থ পরিশীলিত ঐতিহ্য-সমৃদ্ধ বাঙালীয়ানার প্রতিনিধিরূপেই চিহ্নিত হবেন মোহনলাল তাঁর অসাধারণ দুই সাহিত্যকর্ম—"অসমাপ্ত চটাব" এবং "দক্ষিণের বারান্দা"র জন্য।

বেশ কিছুদিন আগে মোহনলাল প্রকাশ করেছিলেন চীনা গল্পের অনুবাদ সংকলন..."চীনা মাটি"। তাঁর মাধ্যমেই বাংলা-ভাষায় উপস্থিত হয়েছিল

কার্ল ক্যাপক এবং অন্যান্য কয়েকজন চেক কথাশিল্পী—"নীলচন্দ্র-মল্লিকা" গ্রন্থে। রেমার্কের "অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েষ্টার্ণ ফ্রণ্ট" তাঁর এক স্মরণীয় অনুবাদ গ্রন্থ।

পরিণতবুদ্ধির ভ্রমণকাহিনী হিসেবে তাঁর রচিত "লাফাযাত্রী", "চরণিক", "পুনর্দর্শনায় চ" স্মরণীয়। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ কিশোরদের জন্য "সোনার ঝরণা"। কিশোরদের জন্য তাঁর অন্যান্য "বোর্ডিং স্কুল", "বাবুইয়ের অ্যাডভেঞ্চার" প্রভৃতি।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র এবং অবনীন্দ্রনাথের দৌহিত্ররূপে মোহনলালের জন্ম। বিদ্যার্জন করেন হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজে, পরবর্তীকালে লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সে। বাংলাদেশের অন্যতম উল্লেখযোগ্য পরিসংখ্যানবিদ ছিলেন তিনি। গত ১৪ই জানুয়ারী তিনি এক পুত্র, এক কন্যা এবং পত্নী চেক-দুহিতা মিলাডা গঙ্গোপাধ্যায়কে রেখে পরলোক গমন করলেন।

এই মুহূর্তে যখন সাংস্কৃতিক আভিজাত্য, সুস্থযুক্তি, মুক্তবুদ্ধি ও বিকারমুক্ত রসচেতনার শ্বাসরোধের অপচেষ্টায় মেতেছে কিছু লোক তখন এই দুঃসংবাদ দুঃখবহ।

মৃণাল চৌধুরী

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

ষাট বৎসরে পদার্পণের দিনে সঞ্জয় ভট্টাচার্য মারা গেলেন। কবি, ঔপন্যাসিক, গল্প লেখক, প্রবন্ধকার ও সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্যের মৃত্যুতে সাহিত্য সেবক হিসেবে আমরা মর্মাহত। বাঙালী চরিত্রের স্বাভাবিক বাষ্পাধিক্য হেতু উচ্ছ্বসিত অতিকথন এসময় রীতি, এবং সে রীতি যথারীতি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় পালিত হয়েছে এবং হচ্ছে। আমরা তা করব না, কেননা আমরা মনে করি কবিব্যক্তির মৃত্যু যতই শোকাবহ ঘটনা হোক শোকের প্রাবল্যে মৃতের মূল্যায়ন ভুল হওয়া উচিত নয়। তাতে সমাজ, সংস্কৃতি ও মানুষের ক্ষতি হয়ে। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের ক্ষেত্রে একথাগুলি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর একটি বহুবর্ণ বিচিত্র ভূমিকা রয়েছে। তাঁর মনস্বিতার কারণে তিনি জনপ্রিয় লেখক হতে পারেন নি।

আধুনিক বাংলা কবিতায় তাঁর আসনটি সুচিহ্নিত, কবিতাতেই তিনি সবচেয়ে স্বচ্ছন্দ হতে পেরেছেন। একাধিক উজ্জ্বল মানবতাবোধে সম্পৃক্ত ছোট গল্পের তিনি জনক। উপন্যাস ও প্রবন্ধে তিনি নিজের সুনিশ্চিত মননশীলতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্যের ভূমিকাটিই আমাদের কাছে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলা দেশে লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনের অন্যতম পথিকৃৎ তিনি। সঞ্জয় ভট্টাচার্য বুঝেছিলেন বৃহৎ পত্রপত্রিকাগুলির সঙ্গে ব্যবসায়িক স্বার্থবোধ এমন ওতপ্রোত জড়িত যে সাহিত্য সংস্কৃতির প্রাণবান ধারাটিকে বহন করতে হবে লিটল্ ম্যাগাজিনগুলিকেই। এই উপলব্ধি থেকেই 'পূর্বাশা'কে বাঁচিয়ে রাখার জন্য অবর্ণনীয় কষ্ট স্বীকার করেছেন তিনি। একটি দীপ্ত উদার মন নিয়ে তিনি নতুন লেখকদের আহ্বান জানিয়েছেন, সম্ভাবনায় বিকাশের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। এ কালের প্রতিষ্ঠিত অপ্রতিষ্ঠিত অনেক লেখকই তাঁদের এই সর্বোত্তম সুহৃদকে ভুলতে পারবেন না। যে অবর্ণনীয় ক্লেশ স্বীকার করে এখনকার লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলি বাৎসরিক পত্রপত্রিকার রাহুগ্রাস থেকে সাহিত্য সাংস্কৃতির সুস্থতা পবিত্রতা রক্ষার সংগ্রামে নিয়োজিত রয়েছেন তা কিয়দংশে 'পূর্বাশা'র অগ্রাধিকার এমন কথা বললে বিশেষ অত্যুক্তি হয় না।

এই সংগ্রামী চেতনার জন্য আমরা সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কাছে ঋণী। কিন্তু অদম্য অধ্যবসায় ও অসাধারণ বৈদগ্ধ্যকে তিনি শ্রেয়োচিন্তার সঙ্গে যুক্ত করতে পেরেছিলেন কি? তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত লেখক কবিদের অনেকেরই আজ বৃহত্তম মঙ্গল সাধনার বিপরীত কোটিতে অবস্থান দেখে সন্দেহ জাগে। এই বিচারে যদি সঞ্জয় ভট্টাচার্য ব্যর্থ সাব্যস্ত হন তবু তাঁর ঋণ অপরিশোধ্য।

ব্যক্তি হিসেবে সঞ্জয় ভট্টাচার্য দুর্লভ সততা ও দরদী মনের অধিকারী ছিলেন। তাঁর মননের নঞর্থক দিকটা বিশ্বাসসঞ্জাত, আজকের বহু বুদ্ধিজীবীর মত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয়। তাই তাঁকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। তিনি আমাদের শ্রদ্ধা ও মনোযোগ দুইই আকর্ষণ করেন।

তাঁর গ্রন্থসংখ্যা চল্লিশাধিক। তাঁর শেষতম গ্রন্থটি প্রকাশের অপেক্ষায়।

নিরঞ্জন শীল

সত্য ও লোকাচারের মধ্যে আপস করিবার
ভাব স্পষ্টই কোন কাপুরুষতার ফল। বীর হও।
যাহারা আমার উত্তরসাধক, সর্বাগ্রে তাহাদিগকে
সাহসী হইতে হইবে। কোনমতে কোনও
কারণে লেশমাত্র আপসের ভাব থাকিবে না।
পরম শ্রেষ্ঠ সত্য সমগ্র দেশে আচণ্ডালে বিতরণ
কর। সম্মানের হানি অথবা অপ্রিয় বিরোধের
আশঙ্কায় ভীত হইও না। শত প্রলোভনের
বিপরীত আকর্ষণ জয় করিয়া যদি তুমি সত্যের সেবা
করিতে পার, তবে নিশ্চিত জানিও তুমি এমন
এক দিব্যতেজঃপূর্ণ হইবে যে, সম্মুখে তুমি যাহা
অসত্য জান তাহার উল্লেখ করিতে গিয়া লোকে
হটিয়া আসিবে। পূর্ণ নিষ্ঠার সহিত অবিচলিত
হইয়া যদি তুমি চৌদ্দ বৎসর সমানভাবে সত্যের
সেবা কর, তবে তুমি যাহা বলিবে তাহা শুনিতে
ও বিশ্বাস করিতে লোকে বাধ্য। তখন দেশের
অশিক্ষিত সাধারণের উপর মঙ্গল বর্ষিত হইবে,
তাহাদের সর্ববন্ধন মুক্ত হইবে এবং সমগ্র
দেশটি উন্নত হইবে।
স্বামী বিবেকানন্দ

সমাজ-বাস্তববাদী সাহিত্যের মূলসূত্র (২)

নগেন দত্ত

"The economic structure of society is the real basis on which the juridical and political superstructure is raised and to which definite social forms of thought correspond : in short, the mode of production determines the character of social, political and intellectual life generally."

Karl Marx, Capital

উপরি-উক্ত মন্তব্যের শুধু আংশিক বিচার আমরা করব। এর সর্বাঙ্গীণ সত্যতা সম্বন্ধে আজ আর তেমন মতবিরোধ নেই। যেটা সব সময় স্বীকৃত হয়না সেটা হচ্ছে 'intellectual life'. আমাদের দেশের সাহিত্য ও সাহিত্যিক সমাজ যে সর্বতোভাবে উৎপাদন-ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল তা ভাবতে তাদের কষ্ট লাগে। কারণ তারা 'superstructure' অর্থাৎ সমাজের অতি উচ্চে যে অলসক্লিষ্ট স্তরটি রয়েছে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলেই— একটু মানসিক আবিলতা অনুভব করে। কেননা, সাহিত্যিক সমাজের মধ্যে একটি শ্রেণী আছেন যাঁরা মনে করেন তাঁরা প্রগতিবাদী, তাঁদের মনের সংস্কারে যে প্রগতিবাদের ছাপ আছে তা আর কিছু নয় তৎকালীন সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে কিছু ভাল-মন্দ বলা এই হল প্রগতিবাদ। অর্থাৎ তারাশঙ্করবাবুর প্রগতিবাদের আমলে যে সামাজিক পরিবেশে জনগণের কথা তাঁর মনে হয়েছিল তার আসল নেতৃত্ব সামন্ততন্ত্রের ভাঙা জমিদার, তালুকদার শ্রেণীর হাতে। এদের ভগ্নদশার মূলে যে ইংরেজের শাসনব্যবস্থা এবং তা থেকে উদ্ভূত শ্রেণীস্বার্থের বিনাশ এটা সহজেই অনুমেয়।

গত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বাঙলা দেশের জমিদার সম্প্রদায় ইংরেজ-শাসনব্যবস্থার প্রতি বিমুখ হতে শুরু করে। ইংরেজ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন দেশের কাছে ঋণী হয়ে পড়ে। এদিকে জার্মানীকে যুদ্ধে পরাস্ত করে তার যেসব উপনিবেশ পাওয়া গেল সেখানেও নতুন পুঁজি নিয়োগ করা

প্রয়োজন। আরও বিভিন্ন কারণে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের উপনিবেশে কিছু শোষণব্যবস্থা তীব্রতর করতে হল। গত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতবর্ষে প্রায় সর্বত্রই পণ্যবস্তুর দাম বেড়ে গিয়েছিল, তার ফলে সামন্ত শ্রেণী বিব্রত বোধ করে এবং ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য মোটামুটি পুরস্কার পাওয়া ত দূরের কথা, পণ্যমূল্যের বৃদ্ধিজনিত দুর্ভোগ এই শ্রেণীটিকেও সইতে হয়েছিল। এই দুর্ভোগের চিত্রের মধ্যে মেহনতী চাষী-শ্রমিকদের কোন স্থান নেই। তাদের ক্রয় ক্ষমতা কোন স্তরে নেমে গিয়েছিল তার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস পাওয়া যায় না। উচ্চবিত্ত, জমিদার, সামন্ত শ্রেণীর শাসকরা ইংরেজ শাসনকে অপশাসন বলতে শুরু করল। সহরবাসী উচ্চবিত্তের চাকুরী না পাওয়ার আন্দোলন, ইংরেজ শাসনের অংশীদার হবার আশা, জমিদার শ্রেণীর ওপর কর বৃদ্ধির চাপ একধারে এসবের প্রতিক্রিয়া শুরু হল। অন্যধারে ইংরেজ বণিকগণের তুলা ক্রয়ের একচেটিয়া বাজার যে মিশর, সেখানেও পাশা শ্রেণীটি বিদ্রোহ করেছে, সেখানেও রাজনৈতিক দাবী দাওয়া নিয়ে বিরোধ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যে সব উপনিবেশ হস্তগত হয় তাকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাবার আগেই এই বিরোধ-বিদ্রোহ দেখা দেয়। ফলে একচেটিয়া বাজার চোট খায়। ম্যাঞ্চেস্টারের সুতো-কাপড়, ডাণ্ডির পাটের বাজার, লিভারপুলের নুন, শেফিল্ডের ছুরি কাঁচি ও অন্যান্য সবই জমিদার ও সামন্ত শ্রেণীর বিক্ষোভের ফলে বাজারে নির্বিঘ্নে চলতে পারল না। এদেশের মানুষ যেদিন বিলাতি কাপড় পুড়িয়ে মনের জ্বালা মিটিয়েছে তখন কেউই ভাবতে পারেনি যে, দেশী পুঁজিবাদীদের কাছে এর থেকে অনেক বেশী দামে কাপড় কিনতে হবে। স্বাদেশিকতার নামে জাতীয় স্থিতস্বার্থের পুঁজিবাদের পূর্ণ বিকাশকে প্রতিষ্ঠিত করাই হল উচ্চ মধ্যবিত্তের আন্দোলন। এর নামই বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে, ফরাসী বিপ্লবে যে শ্রেণী নেতৃত্ব নিয়ে তাদের শাসন কায়েম করেছিল, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সেই শ্রেণীর পূর্ণ বিকাশ লাভ সম্ভব হয়েছে। তারাই নেতৃত্বের জন্য আঁকুপাঁকু করছে।

এখন প্রশ্ন হল, এর সঙ্গে সাহিত্যের যোগসূত্র কোথায়? ইতিপূর্বে মার্কস যে political superstructure-এর কথা বলেছেন এবং intellectual life-এর উল্লেখ করেছেন তার কিছু ব্যাখ্যা এই জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে পাওয়া যাবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত গল্প, উপন্যাসগুলি পড়ে দেখুন, নায়ক উচ্চমধ্যবিত্ত নব্য শিক্ষিত বিলাত ফেরৎ ; তবে তাদের দেশের জন্য মন পড়ে আছে ; এদিকে আপনি দোর্দণ্ড প্রতাপ জমিদারের ভগ্ন দেউলে তারাশঙ্করী- ক্রন্দনও খুঁজে পাবেন। উদগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দম্ভও পাবেন, শহরের বেকার যুবকের দুঃসহ জীবন যাত্রা চিত্র পাবেন। এককালের সম্পন্ন গেরস্থ ঘরের ছেলে কলকাতায় চাকুরীর আশায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। দ্রব্যমূল্য সস্তা কিন্তু কিনে খাবার পয়সা অনেকেরই নেই, চাষীর পণ্যের দাম পড়ে যাচ্ছে। ফ্লাউড কমিশন বসিয়ে চাষীর কত ঋণ আছে তার পরিমাপ করা হল। কিন্তু ঋণ মকুব হল না বা চাষীর উন্নতিও হল না। বাঙলা দেশের চাষী সমাজ কিন্তু তখনও তেমন শ্রেণী সচেতন নয় তার কারণ, জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে যদি চাষী বিদ্রোহ হয় তাহলে জমিদার, জোতদার, তালুকদার আর শহরের আইনজীবী সমাজ বিপন্ন হয়ে পড়বে। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বহু ছোটখাট শ্রেণী আছে যাদের ঐতিহাসিক কোন ভূমিকা নেই। অথচ আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষে সহায়ক। এরা নিম্নমধ্যবিত্ত। এই শ্রেণীটি দুটি দিকের সম্ভাবনা নিয়ে বিরাজ করে। এ ছাড়া আমলাতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ স্ব-বিরোধ ইংরেজের বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলন গড়ে তুলতে সাহায্য করে। কাজেই এই যুগে তারাশঙ্করের মত সামন্ততন্ত্রের ভগ্নাংশ নিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলবার প্রয়োজন ছিল। এবং বাঙ্গলার মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত শিক্ষিত পাঠক এই কাহিনী পড়েই সাহিত্যে প্রগতিবাদী হতে চেয়েছিলেন। শৈলজানন্দের 'কয়লাকুঠী' আর 'কল্লোলের যুগে'র ছিটেফোঁটা মেহনতী মানুষের কথায় অনেকেই উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন।

কিন্তু বাংলা সাহিত্যে হঠাৎ মেহনতী মানুষের কিছু কিছু কথা এলো কেন? ইতিহাস কি বলে? সমগ্র ভারতবর্ষে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদীরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করে রেখেছিল। তার কারণ ভারত-বর্ষ মুখ্যত হিন্দুস্থান বলেই হিন্দুরা অনেক জমির মালিক, পুঁজির মালিক ছিল। বিগত দিনের সাম্রাজ্যবাদী মোগল শাসকদের কাছ থেকে রেহাই পাবার জন্যই ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের হিন্দু রাজারা, সামন্ত নেতারা বেশী খাতির করত। সেই হিন্দু রাজাদের শাসনে হিন্দু প্রজাদের যে অবস্থা ছিল মুসলমান প্রজাদেরও সে অবস্থাই ছিল। শোষণের ক্ষেত্রে কোন ভেদাভেদ নেই, এর কোন হেরফের হয়নি। আর ঐতিহাসিক নিয়মে তা হবারও নয়।

কেননা সামন্ততন্ত্রের শোষণের যে ধারা তা ধর্মনির্বিশেষ। এর প্রধান কারণ হল, কৃষি সম্পদের ওপর ভিত্তি করে যে শোষণব্যবস্থা, তা হাল, গরু ও বর্গা-দারী সত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত, এ ডিঙিয়ে বেশী দূর যেতে পারেনা। জমি চাষ করবে কিন্তু চিরস্থায়ী অধিকার পাবে না। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসক এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে হিন্দু সামন্ত রাজার বিরুদ্ধে মুসলমান প্রজাদের ক্ষেপিয়েছে, আবার হিন্দু প্রজাদের মুসলমান সামন্ত রাজার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়েছে। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এই খেলা চলেছে। কিন্তু প্রজাকে কোন সময় জমির অধিকার কেড়ে নেবার পরামর্শ দেয়নি। সেখানে ধর্মকে এবং ধর্মগত শ্রেণীকে দেখিয়ে দিয়ে বিরোধের জাল প্রশস্ত করা হয়েছে। এই যুগে বাংলা দেশে এক নতুন ধরণের সাংবাদিকতা সৃষ্টি হল। প্রায় সমস্ত সংবাদ-পত্র জগৎ হিন্দু-পুঁজি দ্বারা কবলিত হওয়ায় জনগণের প্রকৃত সমস্যার খবর কেউ জানতে পারতনা। সংবাদপত্র জগতে মধ্যবিত্তের সমস্যার কথা, নিম্ন-মধ্যবিত্তের সমস্যার কথা, এর সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার ইন্ধন, আর হিন্দুসমাজের তথাকথিত অগ্রসর শ্রেণীর জনগণের আন্দোলন, শুদ্ধি আন্দোলন—এই সবই কিন্তু সেই superstructure-এর কাজ—ওপর তলার বিক্ষোভ। এবারে নীচের তলার দিকে তাকান। ১৯২০ থেকে ১৯৩০-এর মধ্যে মেহনতী মানুষেরা কতগুলো ঐতিহাসিক গুরুত্বপুর্ণ আন্দোলন করেছে। আসামের চা বাগানের ধর্মঘট, চাঁদপুরে 'কুলি'দের ওপর অত্যাচারের ফলে ষ্টীমার ধর্মঘট, পরবর্তীকালে লিলুয়ার ধর্মঘট এবং তারও আরো অনেক পরে খড়্গপুরের ধর্মঘট। যতদূর মনে পড়ে ১৯২০ অথবা ১৯২১ সালে প্রথম সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা গঠিত হয় এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তার প্রথম সভাপতি হন। ১৯২৬ সালে প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন আইন হয়। এই যে মেহনতী মানুষের শ্রেণী সংগ্রাম তা কিন্তু সাহিত্যে প্রতিফলিত হল না। যে জমিদার শ্রেণী সাধারণ চাষী শ্রেণীকে অন্নহীন করে আসামের চা বাগানে যেতে বাধ্য করেছে, এবং সমাজের যে অংশ চা বাগানে ঢুকে অমানুষে পরিণত হয়েছে, তাদের বেঁচে থাকার আন্দোলনও বুর্জোয়া সাহিত্যে প্রতি-ফলিত হয়নি অথবা এই শ্রেণীটির মধ্যে যে বিপুল বৈপ্লবিক শক্তি নিহিত রয়েছে এবং যে শ্রেণীটির আন্দোলনের ফলে সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সম্ভব তা বাংলা সাহিত্যে প্রধান সুর হয়ে ওঠেনি। সংগ্রামী জনতার কোন চিত্র আজও তেমন নামজাদা (?) লেখকদের কলম থেকে বেরোয়নি।

এর কারণ কি? আজকের দিনে ধর্মঘট, ঘেরাও একটা আন্দোলন বটে। বাংলা দেশের সাংবাদিকেরা প্রভুর পানে তাকিয়ে এই আন্দোলনকে ফলাও করে লেখেন। বিজ্ঞাপন-ভিক্ষুক দৈনিক সংবাদপত্র বেশীদূর এগোতে পারে না। তাই বৃহত্তর জনসাধারণ এই আন্দোলনের প্রকৃত বৈপ্লবিক শক্তি অনুভব করতে পারে না। কিন্তু একদিন যেমন বাঙলা দেশের জমিদাররা বাগ্‌দি, হাড়ি, কুড়ি, ডোম, মুচি ইত্যাদি শ্রেণীর হাতে লাঠি দিয়ে জমি দখল করেছিল এবং তাদের মধ্যে অসমসাহসী, আস্থাভাজন, সৎ চরিত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল তেমনি আজও শিল্পে ধর্মঘট কালে অসমসাহসী সৎ, ত্যাগী বহু চরিত্র বেরিয়ে এসেছে। এঁরা কিন্তু সমাজ জীবনে নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করছেন। তথাকথিত প্রগতিবাদী সাহিত্যিকেরা কিন্তু এদের মধ্যে কোন 'যুগ-যন্ত্রণা' দেখতে পান না। বরং মেরুদণ্ড হীন, ভীরু কামুক চরিত্রের মধ্যে 'যুগ-যন্ত্রণা' দেখতে পান। নারীর মধ্যে ঐ একটিমাত্র সম্ভোগ কর্ম ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাননা। কেন প্রকৃত সমাজ-চরিত্রকে বাদ দিয়ে এই সব কলুষ চরিত্র সৃষ্টি করা হচ্ছে তার গুরুতর কারণ রয়েছে। আজ সময় এসেছে এই কারণ অনুসন্ধান করার কেননা, অবিরাম দ্বন্দ্বের ফলে শ্রেণী-চেতনা ও শ্রেণীস্বার্থ উভয়ই বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শিবিরের ভাগাভাগিও বেশ স্বচ্ছ হয়ে এসেছে, কাজেই আজকে ঘরে চোর ঢুকলে সে চোর ধরতে বেশী সময় লাগবে না।

বঙ্গদর্শনের সাহিত্য-সমালোচনা

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে প্রথম পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য-পত্রিকা—বঙ্গদর্শন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থে বলেছেন, "বঙ্গদর্শনের পূর্ববর্তী এবং তাহার পরবর্তী বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে যে উচ্চনীচতা তাহা অপরিমিত।" তাঁর আরও মন্তব্য হল, "রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্যের ভার বঙ্কিম একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গসাহিত্য এত সত্বর এমন দ্রুত পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।" আমরা বর্তমান প্রবন্ধে 'বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন পত্রিকায় সাহিত্য সমালোচনা বা পুস্তক সমালোচনার গুরুত্বপূর্ণ কার্যটি কিভাবে সম্পাদিত হয়েছিল তা লক্ষ্য করতে চেষ্টা করব।

বঙ্গদর্শনে সাহিত্য গ্রন্থের সমালোচনা দুটি স্বতন্ত্র রীতিতে সম্পাদিত হত। কোন কোন গ্রন্থের সমালোচনা কখন কখন সবিস্তারে স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হত, যেমন 'উত্তরচরিতে'র সমালোচনা; বাদ বাকি সকল গ্রন্থ 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন' বিভাগে সংক্ষেপে বা বিস্তারিত ভাবে সমালোচিত হত। 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন' মাসিক বঙ্গদর্শন পত্রিকার একমাত্র নিয়মিত বিভাগ। পূর্ববর্তী পত্রপত্রিকার রীতি অনুসারে বঙ্গদর্শনেও কোন লেখক বা সমালোচকের নাম প্রকাশিত হত না। এখন প্রশ্ন, বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন পত্রিকায় কোন্ কোন্ প্রবন্ধ ও সমালোচনা লিখে গেছেন—তা আজ আমাদের জানবার উপায় কি? এর কিছু সমাধান বঙ্কিমচন্দ্রই করে গেছেন। বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রের যে প্রবন্ধ ও সমালোচনাগুলি প্রকাশিত হয় সেগুলি তিনি তাঁর 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের দুই খণ্ডের মধ্যে সংকলন করে যান। কিন্তু আবার প্রশ্ন, বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত যতগুলি সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল তার সবগুলিই কি তিনি সংকলন করে গেছেন? বস্তুতঃ তা ঘটে নি। বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক বহু গ্রন্থের মূল্যবান অনেক সমালোচনা এখনও

বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে যা তাঁর গ্রন্থে বা পরবর্তীকালে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী বা রচনাবলীতে সংকলিত না হওয়ায় আমরা একালের পাঠক সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছি। ১৮৭৬-এ বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয় থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ সমালোচন' নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র যা জানান তা এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করছি: "বঙ্গদর্শনে মৎপ্রণীত যে সকল গ্রন্থসমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কতকগুলি পরিত্যাগ করিয়াছি। যে কয়টি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত করিলাম, তাহারও কিয়দংশ স্থানে স্থানে পরিত্যাগ করিয়াছি। আধুনিক গ্রন্থের দোষগুণ বিচার প্রায়ই পরিত্যাগ করা গিয়াছে। যে যে স্থানে সাহিত্য বিষয়ক মূলকথার বিচার আছে, সেই সকল অংশই পুনর্মুদ্রিত করা গিয়াছে।" এর তিন বৎসর পর ১৮৭৯ সালে বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয় থেকেই 'প্রবন্ধ পুস্তক' নামক তাঁর আর একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক লিখিত এই গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন'টিও বর্তমান প্রসঙ্গে মূল্যবান। গ্রন্থকার জানাচ্ছেন, "এই গ্রন্থে যে কয়টি প্রবন্ধ সংগৃহীত হইল, তাহা সকলই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। কোন কোন প্রবন্ধের স্থানে স্থানে কিছু পরিত্যাগ করা গিয়াছে। কখনও বা প্রবন্ধের নাম পরিবর্তন করা গিয়াছে। এই জাতীয় আরও কয়েকটি মৎপ্রণীত প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। নানা কারণে সেগুলি এক্ষণে পুনর্মুদ্রাঙ্কনের অযোগ্য বিবেচনা করিলাম।" এরপর ১৮৮৭ তে 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের প্রথম ভাগ এবং ১৮৯২এ উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। 'বিবিধ প্রবন্ধে'র প্রথম ভাগের 'বিজ্ঞাপনে' লেখক জানিয়েছেন, "ইতিপুর্বে কতকগুলি প্রবন্ধ 'বিবিধ সমালোচনা' নামে আর কতকগুলি 'প্রবন্ধ পুস্তক' নামে প্রকাশিত করা গিয়াছিল। এক্ষণে উভয় গ্রন্থই অপ্রাপ্য। দুইখানি পৃথক সংগ্রহ নিষ্প্রয়োজন বিবেচনায়, এক্ষণে ঐ প্রবন্ধগুলি এক পুস্তকে সংকলন করিয়া 'বিবিধ প্রবন্ধ' নাম দেওয়া গেল। যে সকল প্রবন্ধ পুর্বে 'বিবিধ সমালোচনা' এবং 'প্রবন্ধ পুস্তকে' প্রকাশিত করা গিয়াছিল, তাহার মধ্যে কোন কোন প্রবন্ধ এবার পরিত্যাগ করা গিয়াছে।" ১৮৯২এ 'বিবিধ প্রবন্ধে'র দ্বিতীয় ভাগের 'বিজ্ঞাপনে' বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন, "আমার নিজের রচনার অধিকাংশই ইতিপুর্বে পুনর্মুদ্রিত করিয়াছি। যাহা বাকি ছিল, তাহার মধ্যে কতকগুলি এই প্রবন্ধে পুনর্মুদ্রিত করিলাম। সকলগুলি পুনর্মুদ্রিত করিবার যোগ্যও নহে। যাহা এ পর্যন্ত পুনর্মুদ্রিত হয় নাই, তাহা হইতে বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটি মাত্র

পুনর্মুদ্রিত করিলাম। অবশিষ্ট প্রবন্ধগুলি পুনর্মুদ্রিত করিব কি না, তাহা এক্ষণে বলিতে পারি না।" বঙ্কিমচন্দ্র এ কথা বলেছেন মৃত্যুর ঠিক দুই বৎসর পূর্বে। আমাদের দুর্ভাগ্য, বঙ্কিমচন্দ্র সেই দুই বৎসরের মধ্যে তাঁর অবশিষ্ট রচনাগুলি পুনর্মুদ্রিত করে যেতে পারেন নি, এবং আজ সেইকারণে বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক রচনা কেবল তাঁর নামাঙ্কিত নয় বলে আমরা সঠিকভাবে সংগ্রহ করে উঠতে পারছি না। যাই হোক, আপাতত আমাদের অনুমান ও বক্তব্য হল, বঙ্কিম-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন পত্রিকার একমাত্র নিয়মিত বিভাগ 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃকই পরিচালিত হয়েছিল। শুধু পরিচালনা নয়, এই বিভাগের অধিকাংশ রচনাও স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের হওয়াই স্বাভাবিক, তবে সাহিত্য ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের কিছু কিছু গ্রন্থের সমালোচনা বঙ্কিম-নির্দেশিত অপর কোন কোন লেখকের দ্বারাও হওয়া সম্ভব বলে মনে করি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে বলেছেন, "মনে আছে, বঙ্গদর্শনে যখন তিনি সমালোচক-পদে আসীন ছিলেন তখন তাঁহার ক্ষুদ্র শত্রুর সংখ্যা অল্প ছিল না। শত শত অযোগ্য লোক তাঁহাকে ঈর্ষা করিত এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের অপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে ছাড়িত না।" আমার প্রশ্ন, আমরা কি বঙ্কিমরচনাবলীর মধ্যে থেকে রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত বঙ্কিমচন্দ্রের এই সমালোচক-মূর্তির পরিচয় পাই? বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের দুই খণ্ডে সর্বশেষ যা সংকলন করে যান তার মধ্যে থেকে কি সাময়িক সাহিত্য সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্রটি ফুটে ওঠে?

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ চৈতন্য লাইব্রেরীতে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে যে প্রবন্ধটি পড়েন তা ১৩০১ সালের বৈশাখ মাসের 'ভারতী'তে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়। 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থে বর্জিত উক্ত পত্রিকার পাঠের একস্থানে আছে "সাহিত্যের পক্ষে যাহা কিছু অযোগ্য, যাহা কিছু অনাবশ্যক, যাহাতে কিছুমাত্র অবহেলা বা অক্ষমতা প্রকাশ পাইত তাহাকে তিনি কদাচ মার্জনা করিতেন না। এই সমস্ত স্বল্পায়ু ক্ষুদ্র প্রাণীদের প্রতি তিনি এমন কঠোর আঘাত এমন সুতীব্র বিদ্রূপ প্রয়োগ করিতেন যে, অনেক সময় তাহা অনাবশ্যক নিষ্ঠুরতা বলিয়া মনে হইত ;—অনেক সময় মনে হইত এই সকল ক্ষণজীবীদের প্রতি বঙ্কিমের প্রবল বাহুর আঘাত যথাযোগ্য নহে। বিশেষত তখনো বাংলা লেখার শৈশব অভ্যাসগুলি দূর হয় নাই, লেখকেরা তখনো বঙ্কিমের নূতন রাজত্বের কঠিন নিয়মসকল ভালো করিয়া ধারণা করিতে পারে নাই, সে-

অবস্থায় সহজেই অনেক ত্রুটি মার্জনা করিয়া দোষকে কম করিয়া দেখিয়া এবং গুণকে বাড়াইয়া তুলিয়া সাধারণত উৎসাহ এবং প্রশ্রয় দিতে ইচ্ছা হয়। বঙ্কিমের রাজদণ্ড সেরূপ দুর্বলতা প্রকাশ করে নাই। তিনি নির্দয়ভাবে ঠিক বাছিতে গিয়া গাঁ উজাড় করিবার জো করিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমের এই নিষ্ঠুরতা উচ্চ লক্ষ্য, অটল সংকল্প এবং মহৎ পৌরুষের নিষ্ঠুরতা। বৃহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি যাঁহার প্রবল অনুরাগ তিনি সমস্ত বাধাবিঘ্নকে নির্মমভাবে ছেদন করিয়া ফেলেন। যাঁহার আদর্শ অত্যন্ত উন্নত তাঁহার বিচার অনুরূপ কঠিন।" সাহিত্য-বিচারালয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের এই উন্নত আদর্শ ও কঠিন বিচারক সত্তার পরিচয় পেতে হলে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী নয়, তাঁর সম্পাদিত বঙ্গদর্শনের পুরাতন ফাইলের মধ্যে আমাদের নতুন করে প্রবেশ করতে হবে।

বঙ্গদর্শন পত্রিকার অধিকাংশ সমালোচনা যে বঙ্কিমচন্দ্রই করতেন, তার অন্যত্রও প্রমাণ পাওয়া যায়। এ বিষয়ে বঙ্কিম-সমকালীন কবি নবীনচন্দ্র সেনের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। ১২৮২ এর চৈত্র মাসের পর বঙ্গদর্শনের প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। সে সময় নবীনচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রকে বঙ্গদর্শন পুনঃপ্রকাশের জন্য অনুরোধ জানালে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে বলেন, "নিরপেক্ষ সমালোচনায় দেশ আমার শত্রু হয়ে উঠেছিল—গালাগালির ত কথাই নেই। কোন কোন গ্রন্থকার আমাকে মারবে বলে সঙ্কল্প করেছিল। I am the worst abused man next only to Sir George Cambell. তোমরা বঙ্গদর্শন পুনরায় প্রচার করতে চাও, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আমি আর সম্পাদক হব না।" এ কথা নবীনচন্দ্র তাঁর 'আমার জীবন' গ্রন্থে লিখেছেন।

আমরা এখানে বঙ্গদর্শনের সাহিত্য-সমালোচনা বিভাগের মূল লেখক বঙ্কিমচন্দ্র কি না ; কিংবা, এই বিভাগে তাঁর রচনার পরিমাণ কতখানি— ইত্যাদি বিচার ও বিতর্কে প্রধানতঃ না গিয়ে এই পুস্তক-সমালোচনা বিভাগটিকে এক কথায় বঙ্গদর্শনের সাহিত্য-সমালোচনা রূপে গ্রহণ করে সেই সমালোচনার স্বরূপ ও বিশিষ্টতা কতখানি তা নিরূপণ করতে চেষ্টা করব।

বঙ্গদর্শনে 'নূতন গ্রন্থের সমালোচনা' বা 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন' বিভাগটির কাজ শুরু হয় পত্রিকার প্রথম বর্ষের সপ্তম সংখ্যা অর্থাৎ ১২৭৯ সালের কার্তিক সংখ্যা থেকে। কার্তিকে এই বিভাগটির নাম ছিল 'নূতন গ্রন্থের সমালোচনা', তবে অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে নাম পরিবর্তন করে রাখা

হয় 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন'। এই নামটি শেষ পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়েছিল।

সমকালে প্রকাশিত সাহিত্য বিজ্ঞান গণিত সঙ্গীত স্বাস্থ্য ইত্যাদি সকল বিষয়ক গ্রন্থ সম্পর্কেই সমালোচনা এই বিভাগে প্রকাশিত হত। আমরা এখানে মুখ্যতঃ সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থগুলি বঙ্গদর্শনে কিভাবে সমালোচিত হয়েছে তা লক্ষ্য করব।

১২৭৯র অগ্রহায়ণে অর্থাৎ প্রথম বর্ষের অষ্টম সংখ্যায় বঙ্গদর্শনের সমালোচন বিভাগে একটি মাত্র গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এটি কবিতাপুস্তক, নাম 'কাব্যমালা'। গ্রন্থমধ্যে কবির নাম নেই। সমালোচক জানিয়েছেন এই গ্রন্থের অন্তর্গত সকল কবিতাই আদিরসাত্মক। এই প্রসঙ্গে সমালোচক বিচার করতে চেয়েছেন সাহিত্যে আদিরসের স্থান কোথায় এবং কতখানি। সমালোচক লিখছেন, "কবিতাগুলির সকলই আদিরস ঘটিত। তাহা হইলেই দোষের হইল না। যাহা শারীরিক কুপ্রবৃত্তির উদ্দীপক, তাহাই দূষ্য এবং কাব্যের অযোগ্য। কিন্তু এদেশে কতকগুলি অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত লোক হইয়াছেন,—তাঁহাদিগের নিকট বিশুদ্ধ দম্পতি প্রেম—যাহা সংসারের এক মাত্র পবিত্র গ্রন্থি, এবং মনুষ্যের ধর্ম, চিত্তোৎকর্ষের প্রধান উপায়, তাহাও আদিরস ঘটিত এবং অশ্লীল বলিয়া ঘৃণ্য। তাঁহারা মনে করেন, এইরূপ কথা কহিলেই, লোকে ইংরাজিওয়ালা এবং সুসভ্য বলিবে। তাহাদিগকে গণ্ড মূর্খ বলিতে আমাদিগের কোন বাধা নাই। এ ঘৃণা তাঁহাদিগের স্বচিত্তের সমলতারই ফল। যাঁহারা কিছুই বিশুদ্ধভাবে দেখিতে জানেন না, তাঁহাদিগের চক্ষে সকলই সমল। যাঁহাদিগের চিত্ত কেবল কুক্রিয়ার অভিলাষী, বিশুদ্ধ বর্ণনাও তাঁহাদিগের কুপ্রবৃত্তির উদ্দীপক হইয়া উঠে। আমরা অনেকবার দেখিয়াছি, অতি বিমল প্রসঙ্গেরও এই পাপাত্মারা অসদর্থ বুঝিয়াছে। সে সুসভ্য শ্রেণীর মধ্যে আমরা গণ্য হইবার অভিলাষী নহি। আদিরস যদি কেবল বিশুদ্ধ প্রেমাত্মক এবং ধর্মের সহায় হয়, তবে তাহাতে আমরা সমাদর করি, ইহা বলিতে আমাদিগের লজ্জা নাই। কিন্তু কেবল শারীরিক প্রবৃত্তির উদ্দীপক রসে যে সমাদর করে, তাহাকে পশু মধ্যে গণনা করি। যে কাব্য সে রসাত্মক, তাহা সমাজের ঘোরতর অনিষ্টকারী। এই কাব্যমালা গ্রন্থখানি সেই মহাদোষে দূষিত।" এই সমালোচনা পাঠকালে 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা-সংগ্রহে'র ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য সহজেই মনে পড়ে। সেখানে তিনি

বলেছেন, "যাহা ইন্দ্রিয়াদির উদ্দীপনার্থ, বা গ্রন্থকারের হৃদয়স্থিত কদর্যভাবের অভিব্যক্তি জন্য লিখিত হয়, তাহাই অশ্লীলতা। তাহা পবিত্র সভ্যভাষায় লিখিত হইলেও অশ্লীল। আর যাহার উদ্দেশ্য সেরূপ নহে, কেবল পাপকে তিরস্কৃত বা উপহসিত করা যাহার উদ্দেশ্য, তাহার ভাষা রুচি এবং সভ্যতার বিরুদ্ধ হইলেও অশ্লীল নহে।...আর একটা কথা আছে। অশ্লীলতা সকল সভ্যসমাজেই ঘৃণিত। তবে, যেমন লোকের রুচি ভিন্ন ভিন্ন, তেমনি দেশ-ভেদেও রুচি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। এমন অনেক কথা আছে, যাহা ইংরেজরা অশ্লীল বিবেচনা করেন, আমরা করি না। আবার এমন অনেক কথা আছে, যাহা আমরা অশ্লীল বিবেচনা করি, ইংরেজেরা করেন না। ইংরেজের কাছে, প্যানটালুন বা উরুদেশের নাম অশ্লীল—ইংরেজের মেয়ের কাছে সে নাম মুখে আনিতে নাই। আমরা ধুতি, পায়জামা বা উরু শব্দগুলিকে অশ্লীল মনে করি না। মা, ভগিনী বা কন্যা কাহারও সম্মুখে ঐ সকল কথা ব্যবহার করিতে আমাদের লজ্জা নাই। পক্ষান্তরে স্ত্রী পুরুষে মুখচুম্বনটা আমাদের সমাজে অতি অশ্লীল ব্যাপার! কিন্তু ইংরেজের চক্ষে উহা অতি পবিত্র কার্য—মাতৃপিতৃ সমক্ষেই উহা নির্বাহ হইয়া থাকে। এখন আমাদের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে, আমরা দেশী জিনিষ সকলই হেয় বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছি, বিলাতী জিনিষ সবই ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। শিক্ষিত বাঙ্গালী এমনও আছেন, যে তাঁহাদের পরস্ত্রীর মুখচুম্বনে আপত্তি নাই, কিন্তু পরস্ত্রীর অনাবৃত চরণ! আলতাপরা মলপরা পা! দর্শনে বিশেষ আপত্তি। ইহাতে আমরা যে কেবলই জিতিয়াছি এমত নহে। একটা উদাহরণের দ্বারা বুঝাই। মেঘদূতের একটি কবিতায় কালিদাস কোন পর্বতশৃঙ্গকে ধরণীর স্তন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা বিলাতী রুচিবিরুদ্ধ। স্তন বিলাতী রুচি অনুসারে অশ্লীল কথা। কাজেই এই উপমাটি নব্যের কাছে অশ্লীল। নব্যবাবু হয়ত ইহা শুনিয়া কানে আঙ্গুল দিয়া পরস্ত্রীর মুখচুম্বন ও করস্পর্শের মহিমা কীর্তনে মনোযোগ দিবেন। কিন্তু আমি ভিন্ন রকম বুঝি। আমি এ উপমার অর্থ এই বুঝি যে, পৃথিবী আমাদের জননী। তাই তাঁকে ভক্তিভাবে, স্নেহ করিয়া 'মাতা বসুমতী' বলি; আমরা তাঁহার সন্তান; সন্তানের চক্ষে, মাতৃস্তনের অপেক্ষা সুন্দর, পবিত্র, জগতে আর কিছুই নাই—থাকিতে পারে না। অতএব এমন পবিত্র উপমা আর হইতে পারে না। ইহাতে যে অশ্লীলতা দেখে, আমার বিবেচনায় তাহার চিত্তে পাপচিন্তা ভিন্ন কোন বিশুদ্ধ ভাবের স্থান হয়

না।" ভাষা এবং বক্তব্য—এই উভয় দিক থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত সমালোচনার সঙ্গে 'কাব্যমালা' গ্রন্থের সমালোচনার আশ্চর্য সাদৃশ্য পাঠকের চোখে পড়বে আশা করি। পরে কেবল ভাষা বিচারের মাধ্যমে বঙ্গদর্শনের অস্বাক্ষরিত এই সমালোচনাগুলির কতগুলি বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক লিখিত তা হয়ত নির্ধারণ করা সম্ভব হতে পারে।

যে কবি 'কাব্যমালা' গ্রন্থের রচয়িতা, পৌষ সংখ্যায় তাঁরই রচিত আর একটি কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের নাম 'ললিত কবিতাবলী'। গ্রন্থে গ্রন্থকারের নাম নেই, পরিবর্তে লেখা আছে, 'কাব্যমালার রচয়িতৃ প্রণীত'। সমালোচক স্পষ্টই জানিয়েছেন, "এ গ্রন্থখানি এবং কাব্যমালা একই রচয়িতৃ প্রণীত বলিয়া সহসা বিশ্বাস হয় না। এ কবিতাগুলি ভাল।" সমালোচকের মতে কবি বিবিধ সংস্কৃত ছন্দে বাংলা কবিতা রচনা করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কাব্যমালার ন্যায় এই কাব্যের কবিতাগুলি আদিরসদোষে দুষ্ট নয়।

বলদেব পালিত প্রণীত 'ভর্তৃহরি কাব্য' ভর্তৃহরি বিষয়ে প্রচলিত কিংবদন্তী অবলম্বনে রচিত তিন সর্গে সম্পূর্ণ কাব্য। 'ললিত কবিতাবলী'র কবি বাংলা কবিতায় বিবিধ সংস্কৃত ছন্দ ব্যবহারে কৃতকার্য হয়েছিলেন; 'ভর্তৃহরি কাব্যে'র কবি বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ প্রয়োগে অধিকতর দক্ষতা ও কৃতিত্বের পরিচয় দেন। সমালোচকের মন্তব্য, "এই কাব্যগ্রন্থখানি, আদ্যোপান্ত অপূর্ব ব্যবহৃত সংস্কৃত ছন্দে রচিত। পূর্ব কবিগণ, দুই একটি সামান্য ছন্দ ভিন্ন সংস্কৃতচ্ছন্দ বাঙ্গালায় প্রায় ব্যবহার করেন নাই। সম্প্রতি 'ললিত কবিতাবলী' প্রণেতা এবং বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, এবং অন্যান্য নব্য কবিগণ উহা ব্যবহার করিয়াছেন। বলদেব বাবু ইহাতে বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষার যে রূপ গঠন, তাহাতে সংস্কৃতচ্ছন্দ ভাল বসে না। লেখকের বিশেষ শক্তি ভিন্ন ইহা শ্রুতিসুখদ হয় না। বলদেব বাবু সেই শক্তি দেখাইয়াছেন। ইহাতে ইনি যে বাঙ্গালা কবিতার বিশেষ উপকার করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মালিনী, উপজাতি প্রভৃতিতে বাঙ্গালা কবিতা যেমন স্থানে স্থানে মধুর ও ওজোগুণ বিশিষ্ট হইয়াছে, তেমনি অনেক স্থানে দুবোধ্য হইয়াছে। 'ভর্তৃহরি কাব্য' সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকে সচরাচর বুঝিতে পারিবেন কি না, তাহা সন্দেহ। যত্ন করিয়া পুনঃ পুনঃ পড়িলে বুঝিতে পারিবেন, কিন্তু কষ্ট করিয়া যে কবিতার

অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়, তাহা অধিকাংশ পাঠক পড়িতে অনিচ্ছুক।" উদ্ধৃত অংশের শেষ ছত্রে সমালোচক যা বলেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার মধ্যেও সে রকম বক্তব্য একটু লক্ষ্য করলেই খুঁজে পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র ঠিক এই রকম কথা তাঁর 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থে 'বাঙ্গালা ভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, "সাহিত্য কি জন্য? গ্রন্থ কি জন্য? যে পড়িবে, তাহার বুঝিবার জন্য। না বুঝিয়া, বহি বন্ধ করিয়া, পাঠক ত্রাহি ত্রাহি করিয়া ডাকিবে, বোধহয় এ উদ্দেশ্যে কেহ গ্রন্থ লিখে না। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে যে ভাষা সকলের বোধগম্য অথবা যদি সকলের বোধগম্য কোন ভাষা না থাকে, তবে যে ভাষা অধিকাংশ লোকের বোধগম্য—তাহাতেই গ্রন্থ প্রণীত হওয়া উচিত। যদি কোন লেখকের এমন উদ্দেশ্য থাকে যে, আমার গ্রন্থ দুই চারি জন মাত্র পণ্ডিতে বুঝুক, আর কাহারও বুঝিবার প্রয়োজন নাই, তবে তিনি গিয়া দুরূহ ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হউন। যে তাঁহার যশ করে করুক, আমরা কখন যশ করিব না।" এমন কথা বঙ্কিমচন্দ্র অন্যত্রও বলেছেন।

বঙ্গদর্শনে তীক্ষ্ণ কঠোর এবং ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপাত্মক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় প্রথম বর্ষের পৌষ সংখ্যায় অন্নদাসুন্দরী প্রণীত 'অবলা বিলাপ' কাব্যের সমালোচনায়। ঊনিশ শতকে এমন একটা সময় গেছে যখন বাংলা ভাষায় কোন মহিলা সাহিত্যচর্চায় অগ্রসর হলে বুদ্ধি বিচার ত্যাগ করে সমকালীন মানুষ সেই ঘটনাটিকে অভূতপূর্ব এক মহামূল্যবান ব্যাপার বলে গ্রহণ করে নিত। সাহিত্য সমালোচকও সাহিত্য বিচার করতে গিয়ে মূল গ্রন্থের দিকে না তাকিয়ে গ্রন্থকর্ত্রীর দিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকাতেন! ফলে গ্রন্থকর্ত্রী যাই লিখুন, তিনি সুখ্যাতির পাত্রী হতেন। অপরদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে অনাবশ্যক সহানুভূতির কোন প্রবেশাধিকার নেই, সমাজ জীবনে পুরুষ ও মহিলার মধ্যে যতই বিস্তর ব্যবধান থাকুক, সাহিত্যের বিচারালয়ে উভয়েরই বিচারের মানদণ্ড একটিই; এবং সে দণ্ড একদিকে যেমন কঠিন অন্যদিকে তেমনি তীক্ষ্ণ। বঙ্গদর্শনের সমালোচক স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, "স্ত্রী পুরুষের সমান বিচার করিব; স্ত্রীলোক বলিয়া ক্ষমা করিব না।" তাই 'অবলা বিলাপ' কাব্যের অন্নদাসুন্দরী দাসী বঙ্গদর্শনের কাছে কোন রকম সহানুভূতির সুযোগ পান নি।

মাঘ সংখ্যায় কালীময় ঘটক প্রণীত 'পদ্যময়' প্রথম ভাগ, উপেন্দ্রনাথ

রায়চৌধুরী প্রণীত 'পদ্যমালা', তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'কবিতাকুসুম' প্রথম ভাগ, শ্রীনাথচন্দ্র প্রণীত 'সদ্ভাবকুসুম' প্রভৃতি কবিতা পুস্তকের সমালোচনা অতি সংক্ষেপে দুচার ছত্রে করা হয়। কোন গ্রন্থই বঙ্গদর্শনের আনুকূল্য লাভ করে নি।

ফাল্গুন সংখ্যায় যে কটি গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হয় তার মধ্যে গজপতি রায় সংকলিত 'ঐতিহাসিক নবন্যাস' গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখেছেন, "অগ্রে ধনাঢ্য লোকের এক এক জন করিয়া কথক (গল্পবক্তা) থাকিত, প্রতি দিবস সন্ধ্যার পর নগর ও গ্রাম ভেদে পল্লীস্থ ও গ্রামস্থ প্রায় সমস্ত লোকেরা স্ব স্ব দৈনিক কার্য সমাধা করিয়া ঐ ধনাঢ্য লোকের বৈঠক-খানায় মিলিত হইয়া বহুবিধ রঙ্গরস ঘটিত গল্প শ্লোকাদি শ্রবণ করিয়া উপজীবিকার শ্রম দূর করিত। এক্ষণে সে চাল আর নাই, এক্ষণে স্ব স্ব প্রধান 'আপনি আর কপণি' কিন্তু উপজীবিকার্থে সেই প্রকার পরিশ্রম করিতে হয়, সন্ধ্যার পর বাটী আসিয়া শ্রম দূরার্থ ইচ্ছা সেই প্রকারে বলবতী, কিন্তু উপায় অভাব, সেই অভাব পুরণার্থ 'নবন্যাসাদির উৎপত্তি'।" এই গ্রন্থ সম্পর্কে বঙ্গদর্শনের বক্তব্য, "যদি এমত শ্রেণীর কোন পাঠক থাকেন যে, এরূপ উদ্দেশ্যে লিখিত গ্রন্থ পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি পাঠ করুন। কিন্তু আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, এরূপ নীচাশয় লেখকদিগের সংখ্যা দিন দিন অল্প হউক। এরূপ লেখকদিগের দ্বারা সাধারণের কোন মঙ্গল সিদ্ধ হয় না বরং অমঙ্গল জন্মে।" এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' প্রবন্ধটির কথা মনে পড়ে। সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন। যাঁহারা অন্য উদ্দেশ্যে লেখেন, তাহাদিগকে যাত্রাওয়ালা নীচ ব্যবসায়ীদিগের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে।" 'ঐতিহাসিক নবন্যাস' গ্রন্থের ভাষা সমালোচনা প্রসঙ্গে সমালোচক লিখেছেন, "আমরা লেখকের ভাষার বিশেষ প্রশংসা করিতে পারি না। তাঁহার ভাষার একটি গুণ আছে—ভাষা অতি সরল। যাঁহারা বড় বড় সংস্কৃত শব্দ ও পদ ত্যাগ করিয়া সচরাচর পরিশুদ্ধ কথোপকথনের ভাষা অবলম্বন করেন, আমাদিগের বিবেচনায় তাঁহারা ভালই করেন। কিন্তু তাই বলিয়া ইতর লোকের ভাষা অবলম্বনীয় নহে।" 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র টেকচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলালে'র

ভাষাকে বিশেষভাবে সমর্থন করলেও হুতোমী কথ্য ভাষাকে তিনি মেনে নিতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে সেই সর্বজনবোধ্য সহজ ভাষাতেই সাহিত্য রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, "তাই বলিয়া আমরা এমত বলিতেছি না যে, বাঙ্গালার লিখন পঠন হুতোমি ভাষায় হওয়া উচিত। তাহা কখন হইতে পারে না। যিনি যত চেষ্টা করুন, লিখনের ভাষা এবং কথনের ভাষা চিরকাল স্বতন্ত্র থাকিবে। কারণ, কথনের এবং লিখনের উদ্দেশ্য ভিন্ন। কথনের উদ্দেশ্য কেবল সামান্য জ্ঞাপন, লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, চিত্তসঞ্চালন। এই মহৎ উদ্দেশ্য হুতোমি ভাষায় কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না। হুতোমি ভাষা দরিদ্র, ইহার তত শব্দ ধন নাই ; হুতোমি ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাঁধন নাই, হুতোমি ভাষা অসুন্দর এবং যেখানে অশ্লীল নয়, সেখানে পবিত্রতাশূন্য। হুতোমি ভাষায় কখন গ্রন্থ প্রণীত হওয়া কর্তব্য নহে। যিনি হুতোমপেঁচা লিখিয়াছিলেন, তাঁহার রুচি বা বিবেচনার আমরা প্রশংসা করি না।" 'ঐতিহাসিক নবন্যাসে'র ভাষার সরলতা গুণ আছে, কিন্তু সে ভাষা অশালীন ও পবিত্রতাশূন্য বলে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

'সৌদামিনী উপাখ্যান', 'গঙ্গেশ্বরী বিলাপ কাব্য', 'নলদময়ন্তী কাব্য', 'প্রমীলাবিলাস'—এই কবিতা পুস্তকগুলি ফাল্গুনের বঙ্গদর্শনে সংক্ষেপে সমালোচিত হয়। অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের ন্যায় এই কবিতাগুলিও সমালোচকের কোন সহানুভূতি লাভে সক্ষম হয় নি।

চৈত্র সংখ্যায় রাজনারায়ণ বসু প্রণীত 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত 'কিঞ্চিৎ জলযোগ'—এই দুটি গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস এই সমালোচনা দুটিকে তাঁদের সম্পাদিত বঙ্কিম রচনাবলীর 'বিবিধ' খণ্ডের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা হিসেবে সংকলন করেন। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত এই রচনা দুটির পুনরুল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন।

বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসরের পুস্তক সমালোচনা বিভাগে সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে কাব্যের সমালোচনা ব্যতীত প্রহসন ও নাট্যগ্রন্থের সমালোচনা প্রাধান্য পায়। এ ছাড়া সমকালে প্রকাশিত অনেকগুলি পত্র পত্রিকার সমালোচনাও এই দুই বৎসরে প্রকাশিত হতে দেখা যায়।

'মানসরঞ্জন কাব্য', 'ঋতুবিহার' 'বিরহবিলাস, 'বঙ্গশ্রুতবোধ'— এই কবিতা পুস্তকগুলি ১২৮০র বঙ্গদর্শনের বিভিন্ন সংখ্যায় সমালোচিত হয়। সমালোচিত হয় অর্থে সমালোচনার বাণে কঠিনভাবে আহত করা হয়। বঙ্গদর্শনের চোখে এই কাব্যগ্রন্থগুলির অন্তর্গত কোনটিই প্রশংসার যোগ্য নয়। কোন গ্রন্থ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'সচরাচর বাঙ্গালা কবিতা যেরূপ অপ্রশংসনীয়, ইহাও সেইরূপ,' আবার কোন গ্রন্থ সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে বলা হয়েছে 'গ্রন্থখানি অপাঠ্য'। 'কবিতাহার' জনৈক হিন্দু মহিলা প্রণীত একখানি কাব্যগ্রন্থ। বঙ্গদর্শনের প্রথম বর্ষের পৌষ সংখ্যায় অন্নদাসুন্দরী দাসী নামে এক মহিলা কবির কাব্যের কঠিনতম সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে কাব্যসমালোচকের মন্তব্য ছিল—'স্ত্রী পুরুষের সমান বিচার করিব, স্ত্রীলোক বলিয়া ক্ষমা করিব না'। 'কবিতাহার' কাব্যের সমালোচনা করতে গিয়ে সমালোচক লিখেছেন, "শ্রুত আছি এখানি পঞ্চদশ বর্ষীয়া বালিকার প্রণীত। ইহা পূর্ণবয়স্কা কোন স্ত্রীর প্রণীত হইলেও, প্রশংসনীয় হইত। প্রৌঢ়বয়ঃ কোন পুরুষের লিখিত হইলেও প্রশংসনীয় হইত।" এ স্থানে প্রমাণিত হচ্ছে সাহিত্য সমালোচনায় বঙ্গদর্শন নারী পুরুষ, প্রাচীন নবীন, পরিচিত অপরিচিত বা খ্যাত অখ্যাত বিচার করে নি, কেবল গ্রন্থের প্রকৃত দোষগুণ বিচার করাই ছিল উক্ত পত্রিকার উদ্দেশ্য।

'উৎকল দর্শন' 'বিশ্বদর্শন', 'বঙ্গমিহির' 'তমোলুক পত্রিকা,' 'মাসিক প্রকাশি', 'পূর্ণশশী,' 'অবকাশ তোষিণী', 'হরবোলা ভাঁড়'—এগুলি এক একখানি সাময়িক পত্রিকা। বঙ্গদর্শনের বিভিন্ন সংখ্যায় এগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা প্রকাশিত হয়। বঙ্গদর্শনে কোন সংবাদপত্রের সমালোচনা প্রকাশিত হয় নি। ১২৮০র আষাঢ়ে 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন' বিভাগের শেষে মুদ্রিত হয়েছে—"আমরা কয়েকখানি অভিনব সংবাদপত্র উপহার প্রাপ্ত হইয়া তাহার সমালোচনায় অনুরুদ্ধ হইয়াছি। সংবাদপত্রের সমালোচনা আমাদের রীতি নহে, এবং আমরা সে নিয়ম ভঙ্গ করিতে ইচ্ছুক নহি। যাঁহারা পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহারা মার্জনা করিবেন।"

বঙ্গদর্শনে ১২৮০র বিভিন্ন সংখ্যায় সমকালীন অনেকগুলি নাটকের সমালোচনা মুদ্রিত হয়। শ্রাবণ সংখ্যায় লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী প্রণীত

'নন্দবংশোচ্ছেদ' শীর্ষক একখানি 'করুণরসাশ্রিত নাটক' সমালোচিত হয়। বঙ্গদর্শনের সমালোচক প্রথমেই লিখেছেন, "আমরা বলিতে পারি না যে নন্দবংশোচ্ছেদ নাটক পাঠ করিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি। আমরা ইহাও বলিতে পারি না যে ইহা পাঠ করিয়া আমরা অসন্তুষ্ট হইয়াছি।" এখানে দেখা যাক সমালোচক কেন নাটকটি পাঠ করে প্রীতিলাভ করেন নি। এর কারণ, নাটকটি সেক্‌স্‌পীয়রের হ্যামলেট নাটকের অনুকরণে রচিত, কিন্তু সেই অনুকরণে নাটকের কোন উৎকর্ষ সম্পাদিত হয় নি। সমালোচক লিখেছেন, "কাব্যের অনুকৃত কাব্য প্রায় অত্যুৎকৃষ্ট হয় না।...বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রায় অধিকাংশ অনুকরণ মাত্র— এখন অনুকরণ যত অল্প হয় ততই ভাল। অনুকরণপ্রবৃত্তিজাত উৎকৃষ্ট কাব্যের অপেক্ষা লেখকের নিজ কল্পনাপ্রসূত একখানি নিকৃষ্টতর কাব্যের অধিক আদর করিতে প্রস্তুত আছি।" বঙ্কিমচন্দ্র 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' প্রবন্ধে এই কথাগুলি বলেছেন—"কাহারও অনুকরণ করিও না। অনুকরণে দোষগুলি অনুকৃত হয়, গুণগুলি হয় না অমুক ইংরাজি বা সংস্কৃত বাঙ্গালা লেখক এইরূপ লিখিয়াছেন, আমিও এরূপ লিখিব, এ কথা কদাপি মনে স্থান দিও না।" কিছু কিছু দোষ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও নাটকটি বঙ্গদর্শনের আনুকূল্য লাভ করে। বঙ্গদর্শনের মতে, "আধুনিক নাটকের অবস্থা ভাবিতে গেলে নাটকখানি ভাল হইয়াছে বলিতে হইবে। অধিকাংশ বাংলা নাটক ইহা অপেক্ষা অপকৃষ্ট।" বঙ্গদর্শন এই নাটকটিকে অভিনীত হবার যোগ্য বলে মনে করে।

রাধানাথ বর্ধন প্রণীত 'সরোজিনী নাটক', মীর মশারফ্ হোসেন প্রণীত 'জমীদারদর্পণ নাটক' এবং 'গ্রেট বারবারস্ ড্রামা—নাপিতেশ্বর নাটক' (নাট্যকারের নাম নেই)-এর সমালোচনা দ্বিতীয় বর্ষের ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। আধুনিক নাটকের দুরবস্থার কথা নন্দবংশোচ্ছেদ নাটকটি আলোচনার সময় বঙ্গদর্শনে উল্লিখিত হয়। 'সরোজিনী নাটক' সমালোচনার সময় বঙ্গদর্শনের মন্তব্য একই—"যেরূপ অপাঠ্য, অনভিনেয় নাটক নিত্য প্রকাশ হইতেছে, ইহা তাহারই সহস্রতম সংস্করণ মাত্র।" ভাষা এবং রুচি—উভয়দিক থেকেই নাটকটির অপ্রশংসা করা হয়। 'জমীদারদর্পণ নাটক' মুসলমান লেখক মীর মশারফ্ হোসেন কর্তৃক রচিত। মুসলমানের রচিত হলেও লেখকের ভাষাটি বিশুদ্ধ, মুসলমানি

বাংলার চিহ্নমাত্র তাঁর ভাষায় অনুপস্থিত। নাটকের নামটি 'নীলদর্পণ' প্রভাবিত। 'নীলদর্পণে'র উদ্দেশ্য ছিল নীলকরদের অত্যাচারের কথা ব্যক্ত করা, বর্তমান নাটকের উদ্দেশ্য সাধারণ প্রজাদের উপর জমিদারদের অত্যাচারের বিবরণ প্রকাশ করা। উদ্দেশ্যমূলক হলেও 'নাটকখানি অনেকাংশে ভাল হইয়াছে' বলে বঙ্গদর্শন মন্তব্য করেছে।

কাব্য বা নাটকের উদ্দেশ্য কি? সৌন্দর্য সৃষ্টি না সমাজ সংস্কার? এই প্রশ্ন সমালোচক তুলেছেন 'গ্রেট বারবারস্ ড্রামা বা নাপিতেশ্বর নাটক' আলোচনা প্রসঙ্গে। সমালোচকের বক্তব্য, "নীলদর্পণকার প্রভৃতি যাঁহারা সামাজিক কুপ্রথার সংশোধনার্থ নাটক প্রণয়ন করেন, আমাদিগের বিবেচনায় তাঁহারা নাটকের অবমাননা করেন। নাটকের উদ্দেশ্য গুরুতর—যে সকল নাটক এইরূপ উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়, সে সকলকে আমরা নাটক বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। কাব্যের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য সৃষ্টি—সমাজ সংস্করণ নহে। মুখ্য উদ্দেশ্য পরিত্যক্ত হইয়া, সমাজ সংস্করণাভিপ্রায়ে নাটক প্রণীত হইলে, নাটকের নাটকত্ব থাকে না। কাজে কাজেই সে সকল নাটকের তাদৃশ উৎকর্ষ জন্মিতে পারে না এবং জন্মেও না। তবে এ সকল লেখকদিগের উদ্দেশ্য উত্তম; তাঁহাদিগের নাটক প্রণয়নের ফলও হিতকর; অতএব সে সকল নাটকে আমাদিগের আপত্তি নাই। বরং তাঁহাদিগকে সাধুবাদ প্রদান করি। নীলদর্পণ প্রভৃতি সময়োপযোগী এবং সুফলোৎপাদক এবং কবিত্বগুণবিশিষ্টও বটে বলিয়া আমরা সে সকলের আদর করি। কিন্তু যখন নাটককারেরা আরও একটু নামিয়া, ফৌজদারী আদালতের মোকদ্দমার ফয়সালার সঙ্গে সঙ্গে এক একখানি নাটক জুড়িতে আরম্ভ করিলেন, তখন নাটক নাম কলঙ্কিত হইয়াছে, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।" বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রশ্নের আরও বিস্তারিত আলোচনা করেন তাঁর 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধটিতে। সেখানে তিনি বলেন, "কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে—কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষ সাধন—চিত্তশুদ্ধি জনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা—কিন্তু নীতি ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও নীতিশিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন। এই সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রথমোক্তটি গৌণ উদ্দেশ্য, শেষোক্তটি মুখ্য উদ্দেশ্য।"

দ্বিতীয় বর্ষের মাঘ সংখ্যায় হরলাল রায় প্রণীত 'হেমলতা নাটক' এবং কৃষ্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রণীত 'অমরনাথ নাটকে'র সমালোচনা প্রকাশিত হয়। 'অমরনাথ নাটকে' প্রশংসার বিষয় কিছুই নেই, তাই সমালোচনাটি সংক্ষিপ্ত। তবে হরলালের 'হেমলতা নাটক'টির সমালোচনা বিস্তারিত ভাবে করা হয়। কতকগুলি স্পষ্ট প্রমাণে সমালোচনাটি আমার মতে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা। সে প্রমাণের কথা পরে উল্লেখ করছি; তার পূর্বে নাট্য সমালোচনাটির বক্তব্য বিষয় কি তা লক্ষ্য করা যাক। এখানে সমালোচক নাটক ও উপন্যাসের মধ্যে মূলগত পার্থক্য কোথায় তা বিশ্লেষণ করেছেন। লেখকের মতে, "অন্তঃপ্রকৃতির ঘাত প্রতিঘাত চিত্র করাই নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য। ধারাবাহিক কথোপকথন দ্বারা সুন্দর গল্প রচনা নাটকের অবয়ব হইতে পারে, কিন্তু তাহা নাটকের জীবন নহে। অন্তঃপ্রকৃতি দ্বারা অন্তঃপ্রকৃতি কিরূপ চালিত হয়, ও কিরূপে চালিত হয়, তাহা প্রদর্শনই নাটককারের প্রধান কার্য। সেইরূপ বহিঃপ্রকৃতি দ্বারা অন্তঃপ্রকৃতি কিরূপ চালিত হয় তাহা প্রদর্শন করাই নবেল রচয়িতার প্রধান কার্য।" এই প্রভেদ নির্ণয়ের প্রধান কারণ আলোচ্য নাট্যগ্রন্থটি যে পরিমাণে রসপূর্ণ উপন্যাস হয়ে উঠেছে সে পরিমাণে ঘাত প্রতিঘাতমূলক যথার্থ নাটক হয়ে উঠতে পারে নি। এই প্রসঙ্গে আলোচক সংস্কৃত নাটক 'উত্তরচরিতে'র প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। তিনি দেখাতে চেষ্টা করেছেন উত্তরচরিতের তৃতীয় অঙ্কের মধ্যে কোন্ কোন্ অংশ 'নবেল' এবং কতটুকু নাটক। সমালোচক লিখেছেন, "ছায়া রূপিনী সীতা জনস্থানে প্রবেশ করিয়াছেন; পূর্ব সুখানুস্মৃতি ক্রমে অন্তর্বিচলিতা হইয়াছেন; কিন্তু এরূপ মানস চালন নাটক নহে; ইহা নবেল। যখন মত্ত হস্তী আসিয়া সীতার পঞ্চবটী বাস সময় পালিত করিশাবকের প্রতি আক্রমণ করিল, বাসন্তী দেখিতে পাইয়া, 'সর্বনাশ হইল, সীতার পালিত করি করভকে মারিয়া ফেলিল।' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, সীতা মোহ বশতঃ যখন 'আর্য পুত্র, আমার পুত্রকে রক্ষা কর' বলিয়া রামকে সম্বোধন করিলেন, তখন উত্তরচরিত নবেল, নাটক নহে। বাসন্তীমুখ নির্গত শব্দ শ্রবণে সীতা মানস চালিতা হইয়াছিলেন, বাসন্তীর বাক্য ঘাতে নহে। ঘাত প্রতিঘাত না হইলে নাটক হয় না। আবার যখন রাম বিমান রাখিতে বলিলে সীতা তাঁহার গম্ভীর স্বর শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'একি! কে এ জল-ভরা মেঘের মত স্তনিত গম্ভীর শব্দ করিল? আমার শ্রবণ বিবর ভরিয়া

গেল! আজি এ মন্দভাগিনীকে কে সহসা আহ্লাদিত করিল?' তখনও সীতা নবেলের নায়িকা। এদিকে পঞ্চবটী দর্শনে রামের শোকপ্রবাহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে; রাম 'সীতে, সীতে' বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন; এ শোক নবেলের শোক, এ উচ্ছ্বাস নবেলের উচ্ছ্বাস। কিন্তু বাসন্তী যখন রামচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহারাজ, কুমার লক্ষ্মণ ভাল আছেন ত?' তখনই প্রকৃত নাটক আরম্ভ হইল। দুই অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে ঘাত প্রতিঘাত হইতে লাগিল। প্রশ্ন শুনিয়া রাম ভাবিতে লাগিলেন 'বাসন্তী মহারাজ বলিয়া সম্বোধন করিলেন কেন? আর প্রথমেই কুমার লক্ষ্মণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন কেন? এইরূপ অন্তঃচালন নাটকের জীবন। বাসন্তী আঘাত করিতেছেন, 'আপনি কেমন করিয়া এ কাজ করিলেন?' আঘাতের ফল: 'লোকে বুঝে না বলিয়া'। পুনরায় আঘাত: 'কেন বুঝে না?' আঘাতে অবসন্ন অন্ত প্রকৃতি উত্তর দিল 'তাহারাই জানে।' পুনর্বার কঠোর আঘাত: 'নিষ্ঠুর! দেখিতেছি কেবল যশঃ তোমার অত্যন্ত প্রিয়!' রাম প্রকৃতি-ছিন্ন হইয়া গেল। ইহার কিছু পরেই আবার বাসন্তী হৃদয়ে প্রতিঘাত হইল। রাম শোকপ্রবাহের উল্টাবাণ বাসন্তী হৃদয়ে আঘাত করিল; বাসন্তী রামকে ধৈর্যাবলম্বন করিতে বলিলেন; কিয়ৎক্ষণ পরে, রামকে অন্যত্র উঠাইয়া লইয়া গেলেন। এইরূপ ঘাত প্রতিঘাতই নাটকের জীবন।"
এখন সতর্ক ভাবে দেখা যাক 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য কি, তাঁর প্রকাশ রীতিটি কিরূপ এবং তৎসহ দেখা প্রয়োজন ভাব ও ভাষার দিক থেকে 'উত্তরচরিত' নাটকের সমালোচনা ও 'হেমলতা নাটকে'র সমালোচনার মধ্যে কোন সুস্পষ্ট সাদৃশ্য বর্তমান কি না? 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "তৃতীয়াঙ্ক অতি মনোহর। সত্য বটে যে, এই উৎকৃষ্ট নাটকে ক্রিয়াপারম্পর্য বড় মনোহর নহে, এবং তৃতীয়াঙ্ক সেই দোষে বিশেষ দুষ্ট। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম অঙ্ক যেরূপ বিস্তৃত, তদনুরূপ বহু ক্রিয়া পরম্পরায় নায়ক নায়িকাগণ কর্তৃক সম্পন্ন হয় নাই। যিনি ম্যাকবেথ পাঠ করিয়াছেন, তিনি জানেন যে, নাটকে বর্ণিতা ক্রিয়া সকলের বাহুল্য, পারম্পর্য এবং শীঘ্র সম্পাদন, কি প্রকার চিত্তকে মন্ত্রমুগ্ধ করে। কার্যগত এই গুণ নাটকের একটি প্রধান গুণ। উত্তরচরিতে তাহার বিরল প্রচার; বিশেষতঃ প্রথম ও তৃতীয়াঙ্কে। তথাপি ইহাতে কবি যে অপূর্ব কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, সেই গুণে আমরা সে সকল দোষ বিস্মৃত হই।" 'হেমলতা নাটকে'র

সমালোচনায় নাটক ও নবেলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা হয়েছে, উত্তরচরিত প্রবন্ধে নবেলের পরিবর্তে কাব্যের প্রসঙ্গ উথাপিত হয়েছে। মূলতঃ উভয় সমালোচনাতেই বলা হয়েছে, 'উত্তরচরিত' নাটকের সর্বত্র যথার্থ নাট্যগুণ বিদ্যমান নেই, বরংচ তার কাব্যগুণ বা উপন্যাসের লক্ষণ সে তুলনায় অনেক বেশি। এখন উভয় সমালোচনার মধ্যে বর্ণনা ও ভাষাগত যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে কি না লক্ষ্য করা যাক। 'হেমলতা নাটকে'র সমালোচনায় 'উত্তরচরিতে'র প্রসঙ্গ যে-অংশে আছে তা পূর্বে উদ্ধৃত করেছি, এবার বঙ্কিমচন্দ্রের 'উত্তর চরিত' শীর্ষক সমালোচনার মধ্য থেকে বর্তমান প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় ছত্রগুলি উদ্ধার করা গেল। (ক) সীতা তখন জানেন না যে, রাম জনস্থানে আসিয়াছেন। সীতাও আসিয়া জনস্থানে প্রবেশ করিলেন। (খ) তখন সীতা একটি করিশাবককে স্বহস্তে শল্লকীর পল্লবাগ্রভাগ ভোজন করাইয়া পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিলেন। এখন সেই করিশাবকও ছিল। এইমাত্র সে বধূসঙ্গে জলপানে গিয়াছে। এক মত্ত যূথপতি আসিয়া অকস্মাৎ তৎপ্রতি আক্রমণ করিল। সীতা তাহা দেখেন নাই। কিন্তু অন্যত্রস্থিতা বাসন্তী দেখিতে পাইয়াছিলেন। বাসন্তী তখন উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, 'সর্বনাশ হইল, সীতার পালিত করিকরভকে মারিয়া ফেলিল!' (গ) রব সীতার কর্ণে গেল। সেই জনস্থান, সেই পঞ্চবটী! সেই বাসন্তী! সেই করিকরভ! সীতার ভ্রান্তি জন্মিল। পুত্রীকৃত হস্তিশাবকের বিপদে বিহ্বলচিত্ত হইয়া তিনি ডাকিলেন, 'আর্যপুত্র! আমার পুত্রকে বাঁচাও!' (ঘ) এ দিকে রামচন্দ্র লোপমুদ্রার আহ্বানানুসারে অগস্ত্যাশ্রমে যাইতেছিলেন। পঞ্চবটী বিচরণ করিবার মানসে সেখানে বিমান রাখিতে বলিলেন। রামের কণ্ঠস্বর মূর্চ্ছিতা সীতার কানে গেল। অমনি সীতার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল—সীতা ভয়ে, আহ্লাদে, উঠিয়া বসিলেন! বলিলেন, 'একি এ? জলভরা মেঘের স্তনিতগম্ভীর মহাশব্দের মত কে কথা কহিল? আমার কর্ণবিবর যে ভরিয়া গেল! আজি কে আমা হেন মন্দভাগিনীকে সহসা আহ্লাদিত করিল?' (ঙ) এদিকে রাম পঞ্চবটী দেখিতে দেখিতে, সীতাবিরহপ্রদীপ্তানলে পুড়িতে পুড়িতে, 'সীতে! সীতে'! বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। (চ) বাসন্তী রামকে পূর্বস্মৃতিপীড়িত করিয়া,—সখীনির্বাসনজনিত রাগেই এইরূপ পীড়িত করিয়া, প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহারাজ! কুমার লক্ষ্মণ ভাল আছেন ত?' কিন্তু সে কথা রামের কানে গেল না—তিনি সীতাকরকমল-

বিকীর্ণ তৃণে প্রতিপালিত হরিণগণেই দেখিতেছিলেন। বাসন্তী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহারাজ! কুমার লক্ষ্মণ কেমন আছেন?' এবার রাম কথা শুনিতে পাইলেন, কিন্তু ভাবিলেন, বাসন্তী 'মহারাজ!' বলিয়া সম্বোধন করিলেন কেন? এ ত নিষ্প্রণয় সম্বোধন। আর কেবল কুমার লক্ষ্মণের কথাই জিজ্ঞাসিলেন। (ছ) বাসন্তী কহিলেন, 'আপনি কেমন করিয়া এ কাজ করিলেন?' (জ) রাম। লোকে বুঝে না বলিয়া। (ঝ) বাসন্তী। কেন বুঝে না? (ঞ) রাম। তাহারাই জানে। (চ) তখন বাসন্তী আর সহিতে পারিলেন না। বলিলেন, 'নিষ্ঠুর! দেখিতেছি, কেবল যশঃ তোমার অত্যন্ত প্রিয়।'

'উত্তরচরিতে'র তৃতীয় অঙ্কের কোথাও কোথাও নাট্যলক্ষণ প্রকাশ পেলেও এই অঙ্কের সর্বত্র যে যথার্থ নাট্যগুণ প্রকাশ পায় নি সে কথা 'হেমলতা নাটকে'র সমালোচনায় বলা হয়েছে। 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র সে কথা আরো স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "এই অঙ্কের অনেক দোষ আছে। ইহা নাটকের পক্ষে নিতান্ত অনাবশ্যক। নাটকের যাহা কার্য, বিসর্জনান্তে রাম সীতার পুনর্মিলন, তাহার সঙ্গে ইহার কোন সংস্রব নাই। এই অঙ্ক পরিত্যক্ত হইলে নাটকের কার্যের কোন হানি হয় না। সচরাচর এরূপ একটি সুদীর্ঘ নাটকাঙ্ক নাটকমধ্যে সন্নিবেশিত হওয়া, বিশেষ রসভঙ্গের কারণ হয়। যাহা কিছু নাটকে প্রতিকৃত হইবে, তাহা উপসংহৃতির উদ্যোজক হওয়া উচিত। এই অঙ্ক কোন অংশে তদ্রূপ নহে। বিশেষ, ইহাতে রামবিলাপের দৈর্ঘ্য এবং পৌনঃপুন্য অসহ্য। তাহাতে রচনাকৌশলের বিপর্যয় হইয়াছে। কিন্তু সকলেই মুক্তকণ্ঠে বলিবেন যে, অন্য অনেক নাটক একেবারে বিলুপ্ত হয়, বরং তাহাও স্বীকর্তব্য, তথাপি উত্তরচরিতের এই তৃতীয়াঙ্ক ত্যাগ করা যাইতে পারে না। কাব্যাংশে ইহার তুল্য রচনা অতি দুর্লভ।"

বক্তব্য ও ভাষারীতির এই আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখে আমার সিদ্ধান্ত 'হেমলতা নাটকে'র সমালোচনাটি 'উত্তরচরিত' নাটকের সমালোচক স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা।

১২৮০-র চৈত্র সংখ্যায় নিমাইচাঁদ শীল প্রণীত 'তীর্থমহিমা' নামক একটি নাটকের উল্লেখ করা হয়। গ্রন্থটি প্রশংসার যোগ্য না হওয়ায় বঙ্গদর্শনে এই গ্রন্থের কোন বিস্তারিত পরিচয় লিখিত হয় নি।

১২৮১ র বঙ্গদর্শনে আরও কতকগুলি নতুন নাটকের সমালোচনা প্রকাশ করা হয়। সেগুলি হল 'পল্লীগ্রামদর্পণ', 'স্বর্ণলতা নাটক', 'রামোদ্বাহ নাটক', 'পুরুবিক্রম নাটক', 'কুলীন কন্যা অথবা কমলিনী', 'তারাবাই' এবং 'গৌড়েশ্বর নাটক'। এই প্রত্যেকটি গ্রন্থের সমালোচনাই সংক্ষিপ্ত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশ করা হয়।

'প্রমোদিনী', 'হেমলতা', 'আর্যদর্শন', 'বান্ধব'—এগুলি সমকালীন সাময়িক পত্র ; ১২৮১ র বঙ্গদর্শনের বিভিন্ন সংখ্যায় সমালোচিত হয়। পাকুড় প্রমোদিনী সভা থেকে প্রকাশিত 'প্রমোদিনী' নামক সাময়িকপত্রের প্রথম খণ্ডের বিস্তারিত সমালোচনা করা হয় বৈশাখ সংখ্যায়। সমালোচক একস্থানে বলেছেন, "গদ্য প্রবন্ধ তিনটি। দুইটি উপন্যাস এবং তৃতীয়টি হুতোমী নক্সা। এখন এ সকলের কিছু বাড়াবাড়ি হইতেছে। ইহা বৃদ্ধি দেখিয়া আমরা সুখী নহি। ভাল হইলে ক্ষতি নাই—কিন্তু মধ্যশ্রেণী গল্প বা নক্সায় বিশেষ লাভ নাই। গদ্যের মধ্যে 'কল্পনা মুকুর' নামক প্রবন্ধের ভাষাটি কথঞ্চিৎ ভাল। 'পাগলের প্রলাপ' হুতোমী—সুতরাং তাহার ভাষায় ভাল কিছু নাই। 'বিচিত্র অঙ্গীকার' নামক প্রবন্ধের ভাষা সংস্কৃতবহুল এবং অপ্রশংসনীয়। ইহা আদ্যোপান্ত অনর্থক শব্দাড়ম্বরে পরিপূর্ণ। লেখক কি কাদম্বরীর অনুকরণে চেষ্টা পাইয়াছেন ? সে প্রবৃত্তি ভাল নহে। আমরা ইতর লোকের ভাষায় গ্রন্থ লিখিতে বলি না। যে ভাষা সরল, অথচ বিশুদ্ধ, তাহাই বাঞ্ছনীয়। লেখকদিগের অলঙ্কার-প্রিয়তা আমাদিগের বড় ভাল লাগে নাই।" বঙ্কিমচন্দ্র রুচিহীন হুতোমী নক্সা বা তার ভাষা পছন্দ করতেন না—সে কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এখন দেখা যাক সাহিত্যে অলঙ্কার প্রয়োগ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের কি নির্দেশ। 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "অলঙ্কার প্রয়োগ বা রসিকতার জন্য চেষ্টিত হইবেন না। স্থানে স্থানে অলঙ্কার বা ব্যঙ্গের প্রয়োজন হয় বটে ; লেখকের ভাণ্ডারে এই সামগ্রী থাকিলে, প্রয়োজন মতে আপনিই আসিয়া পৌছিবে—ভাণ্ডারে না থাকিলে মাথা কুটিলেও আসিবে না। অসময়ে বা শূন্য ভাণ্ডারে অলঙ্কার প্রয়োগের বা রসিকতার চেষ্টার মত কদর্য আর কিছুই নাই।...সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা। যিনি সোজা কথায় আপনার মনের ভাব সহজে পাঠককে বুঝাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক। কেন না, লেখার উদ্দেশ্য পাঠককে বুঝান।"

মহেন্দ্রনাথ ঘোষ সম্পাদিত পাক্ষিক পত্রিকা 'হেমলতা'র, সমালোচনা

প্রকাশিত হয় তৃতীয় বর্ষের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়। সমালোচক লিখেছেন, "সম্পাদক বলিয়াছেন ইহাতে সুশিক্ষিতা স্ত্রীলোক লিখিবেন। আমাদের অনুরোধ যেগুলি স্ত্রীলোকের, সেগুলি স্ত্রীলোকের বলিয়া চিহ্নিত করা থাক। এ সংখ্যায় সেরূপ নাই বলিয়া আমরা হেমলতার সম্যক সমালোচনা করিতে পারিলাম না। আর একটি, যাহাতে স্ত্রীলোক লিখিবে, তাহা অধিকতররূপে স্ত্রীলোকেরই পাঠ্য হইবার সম্ভাবনা। তবে হেমলতা মধ্যে, এত ইংরেজির ছড়াছড়ি কেন?" বাংলা প্রবন্ধে অনাবশ্যক কারণে বিদেশী কোটেশনের বাহুল্য বঙ্কিমচন্দ্রের কাছেও বিরক্তিকর ছিল। তিনি লিখেছেন "বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা করিবেন না। বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা পাঠকের অতিশয় বিরক্তিকর, এবং রচনারপারিপাট্যের বিশেষ হানিজনক। এখনকার প্রবন্ধে ইংরাজি, সংস্কৃত, ফরাসি, জর্মান কোটেশন বড় বেশী দেখিতে পাই। যে ভাষা আপনি জানেন না, পরের গ্রন্থের সাহায্যে সে ভাষা হইতে কদাচ উদ্ধৃত করিবেন না।" একথা বঙ্কিমচন্দ্র 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' প্রবন্ধে বলেন।

'আর্যদর্শন' ও 'বান্ধব' এই দুটি মাসিক পত্রিকা ১২৮১ র শ্রাবণ সংখ্যায় সমালোচিত হয়। কালীপ্রসন্ন ঘোষ সম্পাদিত 'বান্ধব' পত্রিকাটি ঢাকা জেলা থেকে প্রকাশিত। পশ্চিমবঙ্গের ন্যায় পূর্ববঙ্গেও উৎকৃষ্ট সাময়িকপত্র প্রকাশিত হচ্ছে দেখে সমালোচক আনন্দ প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, "পত্র আকারে ক্ষুদ্র হইলেও গুণে, অন্য কোন পত্রাপেক্ষা লঘু বলিয়া আমাদিগের বোধ হইল না। রচনা অতি সুন্দর, লেখকদিগের চিন্তাশক্তি অসামান্য। ইহা যে, বাঙ্গালায় একখানি সর্বোৎকৃষ্ট পত্রমধ্যে গণ্য হইবে, তদ্বিষয়ে আমাদিগের সংশয় নাই।" যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'আর্যদর্শন' পত্রিকাটি সমালোচনা করতে গিয়ে সমালোচক সাহিত্যে অনুবাদ ও অনুকরণের মধ্যে প্রভেদ কোথায় এবং উভয়ের মূল বৈশিষ্ট্য কি তা আলোচনা করেছেন। সমালোচকের বক্তব্য, "কোন জাতি নূতন শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে থাকিলে, সেই জাতির সাহিত্য প্রায় দুই অংশে বিভক্ত হয়, এক অনুবাদ, আর এক অনুকরণ। কদাচিৎ দুই একজন, স্ববুদ্ধিমূলক অভিনব সাহিত্য রচনায় সক্ষম হয়েন। আরব জাতীয়েরা অনুবাদ ভিন্ন প্রায় আর কিছুই করিতে পারেন নাই। রোমক সাহিত্য য়ুনানী সাহিত্যের অনুকরণ মাত্র। বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যে অনুবাদ ও অনুকরণ উভয়ই লক্ষিত হইতেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়

প্রভৃতি পণ্ডিতেরা অনুবাদ করেন ; মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি সুকবিরা অনুকরণ করেন। মেঘনাদ বধ, ইলিয়দের অনুকরণ, নবীন তপস্বিনী, 'Merry Wives of Windsor' নামক নাটকের অনুকরণ। কিন্তু অনেক সময়ে, অনুকরণ অপেক্ষা অনুবাদ সুসাধ্য, এবং সাধারণের উপকারী হয়। অনুকরণ দুই একজন বিশেষ প্রতিভাশালী লেখকের হস্তেই ভাল হইয়া থাকে ; ভাল হইলেও, উপকারিতা সকল সময়ে অনুবাদের তুল্য হয় না। আমরা দেখিলাম যে আর্যদর্শন লেখকেরা এ বিষয়ে যথার্থ কার্যকারিতা বুঝিয়াছেন। ইহা সদ্বিবেচনা এবং বিজ্ঞতার কাজ হইয়াছে। এই প্রথা অবলম্বন করিয়া তাঁহারা দেশের বিশেষ মঙ্গল সাধিতে পারিবেন, এমত সম্ভাবনা।" এই প্রসঙ্গে দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র যা বলেছেন তা উদ্ধার করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, "প্রকৃত ঘটনা, জীবিত ব্যক্তির চরিত্র, প্রাচীন উপন্যাস, ইংরেজি গ্রন্থ এবং 'প্রচলিত খোস-গল্প' হইতে সারাদান করিয়া দীনবন্ধু তাঁহার অপূর্ব চিত্তরঞ্জক নাটক সকলের সৃষ্টি করিতেন। নবীন তপস্বিনীতে ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রাজা রমণীমোহনের বৃত্তান্ত কতক প্রকৃত। হোঁদলকুঁৎকুঁতের ব্যাপার প্রাচীন-উপন্যাসমূলক ; 'জলধর' 'জগদম্বা' 'Merry Wives of Windsor' হইতে নীত। বাঙ্গালিপাঠক মধ্যে নিতান্ত অশিক্ষিত অনেক আছেন। তাঁহারা ভাবিবেন, যদি দীনবন্ধুর গ্রন্থের মূল প্রাচীন উপন্যাসে, ইংরেজি গ্রন্থে বা প্রচলিত গল্পে আছে, তবে আর তাঁহার গ্রন্থের প্রশংসা কি ? তাঁহারা ভাবিবেন, আমি দীনবন্ধুর অপ্রশংসা করিতেছি। এ সম্প্রদায়ের পাঠকদিগকে কোন কথা বুঝাইয়া বলিতে আমি অনিচ্ছুক, কেন না জলে আলিপনা সম্ভবে না। সেক্সপীয়রের প্রায় এমন নাটক নাই যাহা কোন প্রাচীনতর গ্রন্থমূলক নহে। স্কটের অনেকগুলি উপন্যাস প্রাচীন কথা বা প্রাচীন গ্রন্থমূলক। মহাভারত রামায়ণের অনুকরণ। ইনিদ্, ইলিয়দের অনুকরণ। ইহার মধ্যে কোন্ গ্রন্থ অপ্রশংসনীয় ?" 'আর্যদর্শনে'র সমালোচক ও বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যের মধ্যে কি কোন বিরোধ আছে ? মূলতঃ কোন বিরোধ নেই। আর্যদর্শনের সমালোচকের বক্তব্য, যে জাতি নতুন শিক্ষাপ্রাপ্ত হচ্ছে সে জাতির পক্ষে সাহিত্যে অনুবাদ কার্যটি সুসাধ্য এবং সাধারণের উপকারী, কিন্তু যে জাতি পূর্ব থেকেই শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং যে সাহিত্য দীর্ঘকাল সমৃদ্ধ সে জাতির সাহিত্যে অনুকরণ কার্যটি সহজসাধ্য ও মঙ্গলকর। শিক্ষিত শক্তিশালী লেখকের পক্ষেই

শুধু সাহিত্যিক অনুকরণ কার্যটি করা সম্ভব, সাধারণ লেখকের পক্ষে অনুকরণ অপেক্ষা অনুবাদ সহজতর।

১২৮১র বঙ্গদর্শনে কিছু কিছু কাব্যগ্রন্থের সমালোচনাও প্রকাশিত হয়। সেই সমালোচনার মধ্যেও বিভিন্ন প্রসঙ্গে অনুকরণের কথা ওঠে।" উল্লেখ-যোগ্য সমালোচনাগুলির প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপিত হল। মহেশচন্দ্র তর্ক-চূড়ামণি প্রণীত 'কাব্যপেটিকা' সংস্কৃত পদ্যে রচিত খণ্ডকাব্য। সংস্কৃতে রচিত হলেও বঙ্গদর্শনে এই গ্রন্থটির বিস্তারিত সমালোচনা প্রকাশিত হয়। সমালোচক লিখেছেন, "এ গ্রন্থকারের অনুকরণ স্পৃহা অত্যন্ত বলবতী। এই গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা মহদ্দোষ এই, ইহার অধিকাংশ কবিতা নিম্নশ্রেণীস্থ সংস্কৃত কবির অনুকৃতিমূলক। সত্য বটে যে, মনুষ্য স্বভাবতঃ অনুকরণপ্রিয়। আমরা যখন যাহা কিছু প্রচলিত দেখি, বিচার না করিয়া বিবেচনা না করিয়া তখনই তদভিমুখে ধাবমান হই। কিন্তু এ কথা অন্যান্য পক্ষে যাহা হউক এ পক্ষে তত শোভমান নহে। আমাদিগের অনুকরণপ্রিয়তা আছে বলিয়াই একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ বা একখানি ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করিতে গিয়া শত শত সহস্র সহস্র বর্ষ ক্রমাগত প্রচলিত কবিতা বা প্রস্তাবের ছত্রে ছত্রে অনুকরণ করিলে চলিবে না। রচনা বিষয়ে অনুকরণের আরও মহদ্দোষ এই যে, লেখকের নিজের যাহা কিছু কবিত্ব থাকে, অন্যের অনুকরণ করিতে গিয়া হয়ত তিনি তাহা হারাইয়া বসেন। এ বিষয়ে বহুবিধ প্রমাণ দর্শান যাইতে পারে, কিন্তু এ প্রস্তাবের তাহা উদ্দেশ্য নহে; পাঠক দেখিবেন অনেক আখ্যায়িকা, গীতিকাব্য ও সাময়িক পত্রিকা লেখকদিগের এই দশা। সংস্কৃত গ্রন্থকারদিগের মধ্যে এই রীতি অত্যন্ত প্রচলিত। প্রাচীন মহাকবিরা যে প্রণালীতে যে কোন বস্তু বর্ণন করিয়াছেন, অধস্তন কবিরা সেই সেই বস্তু বর্ণন স্থলে তাহাদিগের মধ্যে অবশ্যই কাহারও না কাহারও অনুকরণ করিয়াছেন। এই নিমিত্ত অনেক সংস্কৃত কবির কবিত্বশক্তি সত্ত্বেও কবিতা সুরস হয় নাই; এই নিমিত্ত অধিকাংশ সংস্কৃতগ্রন্থে সাদৃশ্য যোজনা প্রায়ই একরূপ ও এই নিমিত্তই অধস্তন সংস্কৃত কাব্যের উত্তরোত্তর অধোগতি।" মধুসূদন 'বীরাঙ্গনা কাব্য' রচনা করেছিলেন, ১২৭৯ সালে রামকুমার নন্দী 'বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর কাব্য, রচনা করেন। সমালোচক লিখেছেন, "কাব্য সম্বন্ধে, কেবল ইহাই বলা প্রয়োজন যে, কাব্যখানি আদ্যোপান্ত বীরাঙ্গনার অনুকরণ—অনুকরণের অনুকরণ—সুতরাং ইহাতে বিশেষ প্রশংসনীয় কিছু দেখা যায় না।" আশুতোষ

মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'প্রমোদকামিনী কাব্যে'র সমালোচনাতেও একই বক্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, "গোল্ডস্মিথ প্রণীত 'হর্মিট' নামক গীতিকাব্য অবলম্বন করিয়া এখানি রচিত হইয়াছে। পাঠকদিগের স্মরণ থাকিতে পারে, গোল্ডস্মিথের ঐ কাব্যও প্রাচীনতর গীতিকাব্যের অনুসারী। অতএব ঐখানি নকলের নকল। বাঙ্গালা গ্রন্থ অধিকাংশ এইরূপ হইতেছে। 'নকল' শুনিয়াই কেহ ঘৃণা করিবেন না; অনুকরণ হইলেই গ্রন্থ নিকৃষ্ট হয় না। ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে যে মহাভারত রামায়ণের অনুকরণ। বর্জিলের মহাকাব্য যে ইলিয়দের অনুকরণ ইহা সর্বত্র স্বীকৃত। স্বয়ং সেক্ষপীয়রও অনেক সময়ে নিকৃষ্টতর কবিদিগের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া আপন অপূর্ব নাটক রচনা করিয়াছিলেন। অনেক স্থলেই দেখা গিয়াছে, অনুকৃতের অপেক্ষা অনুকারী প্রতিভাশালী।" এ সব লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের কিনা তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখন আর পাওয়া সম্ভব নয়, তবে একমাত্র প্রতিভাশালী কবির পক্ষেই যে অনুকরণের মধ্য দিয়ে উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করা সম্ভব সে কথা বঙ্কিমচন্দ্র বহুবার উল্লেখ করেছেন।

বঙ্গদর্শনের মূল্যবান বিস্মৃত সাহিত্য-সমালোচনাগুলির প্রতি একালের পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই বর্তমান প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। এ প্রবন্ধে সমালোচনার সমালোচনা করার প্রয়োজন অনুভব করি নি। বঙ্গদর্শনের সমালোচনাগুলি পাঠ করে বঙ্গদর্শন-সমকালীন বাংলাদেশের সাধারণ সাহিত্য-চর্চার পরিবেশটির সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। বঙ্গদর্শনে সমকালীন যে সকল গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হয় আজ তার অধিকাংশই বিলুপ্ত। সাহিত্যের ইতিহাসে এই সকল গ্রন্থ এবং তার গ্রন্থকারদের নামটুকুও আমরা সংগ্রহ করে রাখি নি। বঙ্গদর্শনে সমালোচিত, মূল গ্রন্থগুলি সংগ্রহের কোন প্রকার উপায় না থাকায় গ্রন্থ-সমালোচনার সমালোচনা করার আপাততঃ কোন সুযোগ নেই।

সর্বশেষ আমাদের আলোচনা সম্পর্কে একটি প্রশ্ন থেকে যায়। বঙ্গদর্শন দীর্ঘকাল প্রকাশিত হয়, কিন্তু এই আলোচনার কালসীমা বঙ্গদর্শনের সূচনা থেকে তার তৃতীয় বৎসর, অর্থাৎ ১২৭৯ থেকে ১২৮১ সাল পর্যন্ত কেন? এ বিষয়ে সংক্ষেপে বক্তব্য, বঙ্কিম-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনের তৃতীয় বৎসর মাঘ সংখ্যার পর পুস্তক সমালোচনা বিভাগটি বন্ধ হয়ে যায়। এর পরেও বঙ্কিমচন্দ্র আরও এক বৎসর বঙ্গদর্শন নিজ হাতে সম্পাদন করেন। কিন্তু উক্ত বিভাগে

কোন রচনা আর প্রকাশিত হয় নি। এর পর সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং আরও পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শন সম্পাদনা করেন। উভয়ের সম্পাদিত পত্রিকাতেই পুস্তক সমালোচনা বিভাগ ছিল। কিন্তু বঙ্কিম-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন এবং পরবর্তীকালে সঞ্জীবচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত বঙ্গদর্শন এক নয়। আমাদের আলোচনা বঙ্কিম-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনকে কেন্দ্র করে।

কবিতার বাণীশিল্প

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

কবিতার বাণীশিল্প আলোচনায় একটি প্রশ্ন প্রথমেই মনে আসে—যে শব্দ দিয়ে কাব্যদেহ নির্মিত হবে তার জাত কী আলাদা?

কথাটিকে আরো স্পষ্ট করে বলা চলে:—যে শব্দ, বাক্‌রীতি, এবং প্রকাশের মাধ্যম কবিতায় ব্যবহৃত হবে তা কী শুধু কবিতার জন্যই সংরক্ষিত? গদ্যরীতির পক্ষে অচল?

কাব্যভাষার রূপনির্ণয়ে এ মৌলিক প্রশ্নটি প্রথমে উত্থাপন করেছিলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর Lyrical Ballads-এর ভূমিকায়। সেখানে তিনি এমন মতামত অসংকোচে প্রকাশ করেছিলেন, গদ্যভাষা এবং কাব্যভাষার মধ্যে মূলত কোন তফাৎ নেই, থাকতে পারে না। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজী কাব্যের ভাষাশিল্পের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি লিখেছিলেন, এ শতাব্দীর কবিরা কবিতায় একটি কৃত্রিম রীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন নিজেদের অনুভূতি-দৈন্য ঢাকবার জন্যে। উনবিংশ শতাব্দীতে কবি বিহারীলাল এবং গোবিন্দ দাসের প্রাকৃত শব্দ ব্যবহারে পক্ষপাতিত্ব এবং সচেতন প্রবণতা দেখে ওটা যে পূর্বযুগের কবি-ভাষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সূচনা করেছে—তা বুঝতে আমাদের কষ্ট হয় না।

ওয়ার্ডসওয়ার্থের পরবর্তী ইংরেজ কবিরা কবি-ভাষা সম্পর্কে তাঁর মতামত অনেকাংশে মেনে নিয়েছিলেন। তা হলেও কবিতার বাণীশিল্প সম্পর্কে একটা সাধারণ অভিজ্ঞতার কথা আমাদের মনে আসে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় কবিতার ভাষা গদ্যভাষা থেকে পৃথক। এ পার্থক্য কবিতায় ব্যবহারের জন্য বিশেষ বিশেষ কতগুলি শব্দ-নির্বাচনে। এ ধরনের শব্দগুলির মধ্যে এমন কতকগুলি অনুষঙ্গ কিংবা ইঙ্গিতময়তা জড়িত থাকে যা কবিতার প্রকাশব্যঞ্জনার সামর্থ্যকে বাড়িয়ে তোলে। অর্থাৎ কবিতায় ব্যবহৃত শব্দসমষ্টি

শুধুমাত্র একটি অর্থকে প্রকাশ করে না—অর্থের অতিরিক্ত ব্যঞ্জনাকে ফুটিয়ে তোলে :

'পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন'

কিংবা 'ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল'

অথবা, 'সুরঞ্জনা,

তোমার হৃদয় আজ ঘাস'

উক্ত কবিতাংশগুলিতে ব্যবহৃত শব্দগুলি শুধুমাত্র বিশিষ্ট কোন অর্থকে প্রকাশ করছে না, অর্থাতিরিক্ত ব্যঞ্জনাকে ফুটিয়ে তুলছে। তবে ওয়ার্ডসওয়ার্থ যখন বলেন, ঐশ্বর্যময় এবং চমকদার শব্দবিন্যাস পাঠকের মনোযোগকে কবিতার লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে নেয় এবং সে কারণে কবিতা অনেকাংশে আবেদন হারিয়ে ফেলে—সে মন্তব্য অস্বীকার করা যায় না। যেহেতু ওয়ার্ডসওয়ার্থের এ সমালোচনার লক্ষ্য সাধারণ ভাষার অনাবশ্যক বিকৃতি—যা কাব্য-অনুভূতিকে শুধু ব্যাহত করে না, ভাষাশক্তিকেও বিপন্ন করে তোলে। সুতরাং এ ধরনের ভাষার পক্ষে কাব্যে ব্যবহৃত হবার দাবী খুব স্বীকৃত নয়।

কাব্যে ব্যবহৃত শব্দের অর্থমূল্য এবং বাণীশ্রী সম্পর্কে পাঠক সচেতন হয়ে উঠলো যখন পাশ্চাত্ত্যে এবং আমাদের দেশে রেনেসাঁস যুগের কবিরা ক্লাসিক উৎস থেকে বহু শব্দ সংগ্রহ করে কাব্যকে নতুন দেহে সজ্জিত করলেন। সার্থকভাবে কাব্যে বা গদ্যে এ ধরনের শব্দপ্রয়োগ শিল্পীকে ভাষা-সচেতন করে তুললো। কাব্যে ব্য গদ্যে ক্লাসিক শব্দকে সার্থক শিল্পরূপ দিতে পেরে তাঁরা পরিতৃপ্তি পেলেন। মধুসূদন-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এবং গদ্যে ক্লাসিক রীতির শব্দ ব্যবহারে শিল্পসামর্থ্য এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তাঁদের ব্যবহৃত শব্দে রয়েছে একদিকে যেমন রেনেসাঁসের আবেগতপ্ত অনুভূতি তেমনি নতুন অর্থব্যঞ্জনা। শব্দের অর্থগূঢ় ব্যঞ্জনা, বাণীদেহের লাবণ্য মুগ্ধ করল এ যুগের লেখক সম্প্রদায়কে। শুরু হল তার অক্ষম অনুকরণ। ফলে মধুসূদনের অনুসরণকারী কবিকুল যেমন নতুন কাব্যদেহ নির্মাণে ব্যর্থ হলেন, তেমনি হলেন রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজও। সৌভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রযুগেই একজন বিদ্রোহী শব্দ সচেতন কবির প্রয়াসে কাব্যদেহ আবার নতুন রূপ পেল। ইনি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। তারপর আধুনিক কাব্যে এল আবর্তিত ভাঙা-গড়ার লীলা। কাব্যকে মধুসূদন-রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত করবার প্রয়াসের পালা। নবতর শব্দ-যোজনা, ইঙ্গিতময় বক্রোক্তিপ্রধান বাক্যবিন্যাসে আধুনিক বাংলা কাব্য আর

একটি নতুন যুগের তোরণপ্রান্তে উপনীত হল। বলিষ্ঠ অর্থব্যঞ্জনাময় শব্দ-ব্যবহারে অভিনব শক্তির পরিচয় দিয়ে আধুনিক কাব্যনির্মাণে যাঁরা অগ্রণী আবিষ্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণধন্য—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাস, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং বিষ্ণু দে। বুদ্ধদেব বসুর নামটাও এ সঙ্গে উচ্চারণ করা যেত—যদি শব্দচয়নে এবং সুরধর্মিতায় তিনি বহুস্থলে এত বেশী রবীন্দ্র-নির্ভর না হতেন। শব্দব্যবহারে, ভাবকল্পনায় এ যুগের অধিকাংশ অভিনবত্বপ্রয়াসী কবি উক্ত পাঁচজন আবিষ্কারক কবির প্রদর্শিত পথেই ঘুরপাক খাচ্ছেন, নতুনের শঙ্খধ্বনি তাঁদের কাব্যে শোনা যাচ্ছে না—এমন মন্তব্য বোধ হয় অহেতুক নয়।

রেনেসাঁস যুগে বাণীশিল্পের এ সমৃদ্ধি এবং ঐশ্বর্য শুধুমাত্র বিদগ্ধ পাঠক-মনকে যে আশান্বিত করেছিল তা নয়, কবি-মনেও এনে দিয়েছিল নতুন সৃষ্টির প্রচণ্ড আবেগ। রেনেসাঁস ছিল এমন একটি শক্তি যার যাদুস্পর্শে কবি-চিত্তের রুদ্ধ কপাট হঠাৎ খুলে গেল, বন্ধনমুক্তির দুরন্ত উল্লাসে কবি-মন সঞ্চরণ করবার অবকাশ পেল নিত্য নতুন ভাবজগতে। ধর্ম এবং শৌর্যময় সীমাবদ্ধ বীরজগতকে অতিক্রম করে রেনেসাঁস যুগের কবিকুল সন্ধান পেলেন মানব-চেতনা স্পন্দিত নতুন জগতের। ক্লাসিক সাহিত্যের সঙ্গে নব-পরিচয় কবিদের এ মানস-সম্প্রসারণে সহায়ক হয়েছিল সন্দেহ নেই। নতুন মানব-চেতনা এবং ভাবনার সাহায্যে ক্লাসিক সাহিত্যকে তাঁরা অভিনব রূপে সজ্জিত করলেন। এ নবসৃষ্টিকে সম্ভব করেছিল তাঁদের শব্দচেতনা, শব্দগৌরবের প্রতি তাঁদের বিস্মিত শ্রদ্ধা। অনুভব করেছিলেন তাঁরা মানব-মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতিকে একমাত্র বিশিষ্ট শব্দপ্রয়োগের দ্বারাই বিমূর্ত করে তোলা যায়। এ কারণেই যথাযথ ভাবদ্যোতক শব্দ আবিষ্কারে রেনেসাঁস যুগের কবিদের প্রয়াস ছিল ক্লান্তিহীন। শব্দের সাহায্যে স্পেনসারের চিত্রসৃষ্টি-প্রবণতা, মার্লো বা মধুসূদনের আড়ম্বরপ্রিয়তা, শেকসপীয়রের সাঙ্গীতিক এবং ঐন্দ্রজালিক ঐশ্বর্যসৃষ্টির প্রেরণামূলে ছিল বাণীশিল্পের শক্তি উপলব্ধিতে নতুন আনন্দ ও উল্লাস। নতুন যুগের প্রয়োজনের দাবী মেটাতে গিয়ে শব্দ এবং বাক্‌রীতিতে সচেতন ভাবে পরিবর্তন আনলেন তাঁরা—যার ফলে গড়ে উঠল নবযুগের কবিতার নতুন বাণীশিল্প।

ক্লাসিক শব্দপ্রীতির প্রভাবে নতুন 'কবি-ভাষা'র সৃষ্টি হল ইংরেজী কাব্যে মিল্টনের হাতে। বাংলা কাব্যে মধুসূদন এ ধরনের বাণীশিল্পের প্রবর্তক।

কালক্রমে ক্লাসিক শব্দ ব্যবহারে কবিরা এত অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন যে ধ্বনিগাম্ভীর্যহীন দেশীয় শব্দকে 'ইতর' (vulgar) বলে ভাবতে শুরু করলেন। পণ্ডিতী ক্লাসিক শব্দের সঙ্গে লোকব্যবহৃত সাধারণ শব্দের মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন বলে ডক্টর জনসন শেকসপীয়রের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিলেন। এ দেশীয় সমালোচকেরা মধুসূদন এবং রবীন্দ্রনাথকে গুরুচণ্ডালী কবি-ভাষা ব্যবহারের জন্য অভিযুক্ত করেছিলেন। অথচ এ কথাটা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে লোক-ব্যবহৃত ভাষার মূল রয়েছে দেশের মাটিতে, এ ধরণের ভাষার মধ্যে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট অর্থব্যঞ্জন আছে যা ক্লাসিকধর্মী পণ্ডিতী ভাষায় মিলে না। এ ভাবে ক্লাসিকধর্মী কবি-ভাষায় কাব্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে দু'টি দুষ্ট প্রভাব বিস্তার করল। প্রথম, কৃত্রিম বাক্যরীতির সৃষ্টি, দ্বিতীয় বিশেষ বিশেষ ভাব প্রকাশের বাহন হবার পরিবর্তে সর্বজন স্বীকৃত মন্তব্য প্রকাশের দিকে প্রবণতা।

ইংরেজী সাহিত্যে ওয়ার্ডসওয়ার্থই সর্বপ্রথম কবি যিনি কবিতার সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক নির্ণয়ে অগ্রসর হলেন। শুধু তাই নয়, কবিতা ও ভাষার পরস্পর নির্ভরতা কতখানি তাও স্থির করবার প্রয়াস পেলেন। লিরিক্যাল ব্যালাডের বিজ্ঞপ্তিতে তিনি সমকালীন কবিদের ভাষার জাঁকজমক এবং শূন্যগর্ভ বাক্‌রীতির সঙ্গে নিজের কবিতার ভাষার সূক্ষ্ম পার্থক্য বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে সে ভাষা সমাজের উচ্চবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত শ্রেণীর ভাষারই প্রতিরূপ। এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর ১৮০০ এবং ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত লিরিক্যাল ব্যালাডের ভূমিকায় কবি-ভাষা সম্পর্কে নিজের বিপ্লবী মতের সমর্থনে তিনি বললেন, আসলে গদ্যের এবং কবিতার ভাষার মধ্যে মূলত কোন তফাৎ নেই। কৃত্রিম কবি-ভাষাকে তীক্ষ্ণ সমালোচনা করে তিনি লিখলেন, ভাষার আবেদন যদি সুস্পষ্ট এবং লক্ষ্যভেদী না হয় তা হলে সে ভাষা প্রাণহীন হতে বাধ্য। এ ধরনের কৃত্রিম কবি-ভাষায় লিখিত কবিতা পাঠকের আবেগ জাগ্রত করতে সক্ষম নয়। অপরপক্ষে তাঁর মতে ইতর জনের ভাষাই প্রকৃত রসসৃষ্টির সহায়ক, যেহেতু সে ভাষা এমন লোক দ্বারা কথিত হয়, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বস্তুর সঙ্গে যাঁদের যোগাযোগ প্রত্যক্ষ এবং যে উৎস থেকে ভাষার উত্তম অংশগুলি উদ্ভূত হয়। এছাড়া সংস্কারান্ধ সমাজের প্রভাবমুক্ত হওয়ায় এঁরা নিজেদের অনুভূতি এবং জীবনদৃষ্টিকে সহজ অলংকৃত ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন। এক কথায়

ইতরজনের ভাষা মানবজীবনের মৌলিক পরিবেশ থেকেই উৎসারিত, এবং এ কারণে মানব-মনের আদিম ও সহজ ভাবপ্রকাশে অধিকতর উপযোগী। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের ভাবের সঙ্গে প্রকৃতির সুন্দর ও স্থায়ী সত্তার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক বিদ্যমান। ওয়ার্ডসওয়ার্থের বৈপ্লবিক দাবী হল, যে সংস্কারাচ্ছন্ন জীবনের সঙ্গে আদিম জীবনবৃত্তির সম্পর্ক শিথিল, তাকে ভিত্তি করে কবিতা রচনা-প্রয়াস চলে না। কবিতা রচিত হবে সে জীবন নিয়ে মাটির সঙ্গে যার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ অর্থাৎ কবিতার উপজীব্য হবে এমন সাধারণ মানুষ কর্ম আর ঘর্ম দিয়ে যারা গড়ে তোলে নিলে নিজের ভাগ্যকে। কবি জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত হয়ে এ ধরণের মানুষের কথা বেশী বলতে পারেন নি বলে সার্বভৌম কবি রবীন্দ্রনাথ নিজের কবিতার অপূর্ণতা উপলব্ধি করে বেদনা বোধ করেছিলেন—এ খবর কারো অজানা নয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের এ দুই মহাকবির মানস-সান্নিধ্য সত্যই বিস্ময়কর।

কবিতার ভাষায় সারল্য এবং অপকটতা সম্পর্কে ওয়ার্ডসওয়ার্থের বক্তব্য একেবারে সর্তহীন নয়। তাঁর সর্তগুলি হল,—প্রথম, কবিতার ভাষা হবে প্রকৃত লোক-ব্যবহৃত ভাষার সুনির্বাচিত সংকলন; দ্বিতীয়, সে ভাষা হবে কবির আবেগবিহ্বল মুহূর্তের জীবন-অভিব্যক্তি; তৃতীয়, সে ভাষার মধ্যে থাকবে কিছুটা কল্পনার রঙ্; চতুর্থ, কবির অনুভবের প্রকাশ হবে ছন্দোময় ভাষায়, যেহেতু এ ধরনের প্রকাশরীতি আনন্দের অনুভূতিকে বাড়িয়ে তোলে। কোলরিজের মতে কবি-ভাষা সম্পর্কে ওয়ার্ডসওয়ার্থের এ সমস্ত সর্ত তাঁর বক্তব্যের বলিষ্ঠতাকে হ্রাস করেছে। কবিতা কবির মুগ্ধ আবেগ বিহ্বল মুহূর্তের সৃষ্টি বলে কাব্যমূর্তি নির্মাণে সুনির্বাচিত শব্দ প্রয়োগ অনিবার্য। শুধু তাই নয়, কল্পনার রূপমূর্তি নির্মাণে কবিকে অনুভূতি প্রকাশক বিশেষ কাজ খুঁজে নিতে হয়। সুনির্বাচিত শব্দের সাহায্যে কল্পনার এ প্রসাধন প্রক্রিয়াকেই বোধ হয় ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছেন—Colouring of the Imagination. সুনির্বাচিত শব্দ ছাড়াও কবিতায় বিধৃত কবির মেজাজকে বিমূর্ত করে তোলে ছন্দোস্পন্দ এবং ছন্দ। কবিতাকে এ অতিমানসের প্রভাবে কবিতার ভাষা এমন একটি অতীন্দ্রিয়তা লাভ করে সাধারণ মানুষের ভাষা যে পর্যায়ে পৌছাতে পারে না। ওয়ার্ডসওয়ার্থে প্রধান অভিযোগও অবশ্য ভাষার কৃত্রিমতা এবং সাড়ম্বর অথচ প্রাণহীন বাক্যবিন্যাসের বিরুদ্ধে। নিজের কবিতার সাহায্যে বারে বারে তিনি এ

কথাই প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে একমাত্র ছন্দোবদ্ধতা ছাড়া কবিতার ভাষা এবং গদ্যের ভাষার মধ্যে কার্যত কোন তফাৎ নেই। গদ্য ভাষার অন্তঃপ্রকৃতিতে ছন্দোস্পন্দ জড়িত হলে সে ভাষাও আনন্দময় অনুভূতিতে গতিশীল হয়ে ওঠে, স্বরপ্রবাহের উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে গীতময় হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ বা অবনীন্দ্রনাথের কাব্যধর্মী গদ্য এ মন্তব্যের সমর্থক।

কবিতার শব্দ নির্বাচন নিয়ে ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কে একটু দীর্ঘ আলোচনা করা হল, যেহেতু সে তত্ত্বের সারবত্তা দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ তত্ত্বকে কাব্যালোচনার ক্ষেত্রে একটি বৈপ্লবিক ইস্তাহারের গৌরব দেওয়া যেতে পারে, যেহেতু ফরাসী বিপ্লবের মূল ভাবধর্মের সঙ্গে এর একটা সাধর্ম্য রয়েছে—যে বিপ্লব মানুষের সাম্যবাদী জীবনদৃষ্টিকে সম্প্রসারিত করেছিল। এক হিসেবে কবি বার্নস-এর চাইতেও তাঁর কৃতিত্ব বেশী গণনীয়, কেননা এমন এক যুগে তিনি কাব্যতত্ত্বকে সাম্যবাদী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করলেন যখন অভিজাত কাব্যনীতির প্রভাব ছিল সর্ববিস্তারী। তবে বৈপ্লবিক চেতনার উৎসাহে তিনি একটি সত্য বিস্মৃত হয়েছিলেন, সে সত্যটি হল কবিতা লিখতে গিয়ে গদ্যের ভাষাকে তাঁর নির্দেশিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী যদি ব্যবহার করতে হয় তাহলে সে ভাষা গদ্যভাষা থেকে একান্ত ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য কিছু হয়ে দাঁড়ায়। সমকালীন কাব্যভাষার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ অবশ্য ফলপ্রসূ হতে দেরী হয়নি, কেননা তাঁর পরবর্তী কবিরা দেখি কাব্যভাষা সৃষ্টির ক্ষেত্রে কৃত্রিম আবিষ্কার এবং দার্শনিক অহমিকাকে অতিক্রম করে এমন একটি স্টাইল আয়ত্ত করেছেন যার সাহায্যে সর্বপ্রকার কবিঅনুভূতি এবং অভিজ্ঞাকে বাঙ্ময় করে তোলা যায়। বাংলা কাব্যে এ ধরণের কাব্যপ্রয়াস যতীন সেনগুপ্ত থেকে শুরু করে এ যুগের রবীন্দ্র-কবি-ভাষা এবং রীতি-বিদ্রোহী আধুনিক কবিদের কাব্য দেখা যাচ্ছে।

তিনটি দিক থেকে কোলরিজ ওয়ার্ডসওয়ার্থের পরিকল্পিত কবি-ভাষার তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেন: প্রথমত, কবিরা গদ্যশিল্পীর মতই কবিতায় শব্দ ব্যবহার করতে পারেন এটা সত্য, কিন্তু এটা যদি তিনি বলতে চান যে কাব্যরীতি থেকে পৃথক হবে না তাহলে এর যৌক্তিকতা স্বীকার করা যাবে না। দ্বিতীয়ত, যান্ত্রিক ভাবে অলংকার ব্যবহারের বিরুদ্ধে ওয়ার্ডসওয়ার্থের অভিযোগকেও ভুল বোঝা হয়েছিল, যেহেতু দোষটা অলংকারের গতানুগতিক ও পৌনঃপুনিক ব্যবহারের নয়, এ ধরনের অলংকার ব্যবহার উৎকৃষ্ট লেখন-

রীতি বিরুদ্ধ। তৃতীয়ত, যে স্বভাবের গুণ তাঁর নিজের ছিল না সে গুণ ইতরজনের ওপর আরোপ করে তিনি ভুল করেছিলেন। শিক্ষাদীক্ষাহীন ইতর জনের ভাষা যুক্তির ধার ঘেঁষে চলে না, সুতরাং এলোমেলো। এ ধরনের ভাষা যে কোন রচনার পক্ষে অযোগ্য। সেজন্য কোলরিজ মনে করতেন কাব্যসৃষ্টি প্রয়াসে সার্থকতা লাভ করতে হলে কবির নিজেরও শিক্ষার প্রয়োজন।

ওয়ার্ডসওয়ার্থের অনুমোদিত কবি-ভাষা সম্পর্কে কোলরিজের সমালোচনাও যে সমালোচনার উর্ধ্বে একথা স্বীকার করা যায় না। তাঁর প্রথম আপত্তির মধ্যেও খুঁত আছে। সমস্ত কবিই তো সচরাচর অচলিত আলংকারিক অর্থে শব্দ ব্যবহার করেন যা সাধারণত গদ্যে ব্যবহৃত হয় না। শিক্ষিত লেখকেরাও যে ইতরজনের ভাষা যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারেন তার দৃষ্টান্ত শেকসপীয়র, ডিকেন্স, হার্ডি প্রভৃতির লেখায় অজস্র পাওয়া যায়। তাঁদের ব্যবহৃত ইতর ভাষা আমরা স্বভাবের অনুগামী বলেই গ্রহণ করি।

কবিতার শব্দনির্বাচন সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে বেশী হলেও আমাদের দেশেও যে একেবারেই হয়নি তা বলা যায় না। সংস্কৃত আলংকারিকেরা শব্দকে ব্রহ্মের সঙ্গে তুলনা করে যে আভিজাত্য ও সত্যবোধের পরিচয় দিয়েছিলেন তা তুলনাহীন। কবিতায় শব্দসচেতন কবি হিসেবে মধুসূদন স্মরণীয়। তাঁর লোকোত্তর কবি-প্রতিভার বিকাশের মূলে যে সার্থক তৎসম এবং প্রাকৃত শব্দের যুগপৎ ব্যবহার—এ তথ্য নিপুণভাবে পরিবেষণ করেছেন কোন কোন কাব্যসমালোচক। রবীন্দ্র কবি-প্রতিভাকেও ভাস্বর দীপ্তি দিয়েছে ব্যঞ্জনাধর্মী নিপুণ শব্দপ্রয়োগ। রবীন্দ্রোত্তর কবিদের মধ্যে শব্দচেতনায় তীক্ষ্ণ অভিব্যক্তি দিয়ে বাংলা কবিতাকে যাঁরা নতুন রূপে সজ্জিত করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ স্মরণধন্য সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাস এবং আরো অনেকে। ধ্বনিগম্ভীর—কোন সময় সাধারণ লোকপ্রচলিত শব্দকে ব্যঞ্জনাধর্মী বাক্যে ব্যবহার করে কাব্যের ধার এবং ভার—উভয়ই এঁরা বাড়িয়েছেন। এঁদের বাণীশিল্প নবযুগের কাব্য-সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করেছে।

ইথিওপিয়ার জারতন্ত্র

দেবব্রত ঘোষ

আদম আর ইভ বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে বেশ সুখেই ছিল ইডেন গার্ডেনে। ইভের তখন তিরিশটি ছেলেমেয়ে। তার মধ্যে পনেরটা ভারি সুন্দর। খুব চালাক-চতুরও বটে। বাকী পনেরটা কিন্তু তেমন সুবিধে নয়। ইভের মনে খুঁত খুঁত। ভগবানের বিরুদ্ধে মনে মনে অভিযোগ।

একদিন ভগবান ভিজিট করতে এসেছেন বাগানে। তাঁকে দেখেই ইভ লুকিয়ে ফেলল সুন্দর আর বুদ্ধিমান ছেলেমেয়েদের। আর বাকী পনেরটা দেখাল তাঁকে। নালিশের সুরে।

ভগবান মনে মনে হাসলেন। [যা তাঁর দস্তুর।] আর লুকিয়ে ফেলা ছেলেমেয়েদের সত্যি সত্যি অদৃশ্য করে দিলেন। তারা হল অন্ধকারের জীব। প্রকাশ্য জীবন তাদের নয়। অদৃশ্য হয়েই তারা জীবন-যাপন করছে সেই থেকে। বংশবৃদ্ধিও করেছে। [তবে প্রকাশ্য মানুষের তুলনায় বোধ করি কম; কারণ তাদের মৃত্যুর কথা শোনা যায় না।] তাদের অধিকাংশের মনে কিন্তু প্রকাশ্য জীবনের প্রতি, পৃথিবীর সম্ভোগময় জীবনের প্রতি লোভ প্রচণ্ড, আর হিংসে তাদের ভাই-বোনদার মানুষের উপর—যারা নিরেস হয়েও সারের সারটি ভোগ করছে।

এই হিংসুক, লোভী অথচ চালাকচতুর অদৃশ্য 'জীব'দের নাম Zar ওদের মধ্যে যারা একটু নিরীহ ভাল'মানুষ' তাদের নাম Wekabe.

প্রত্যেক বাড়িতেই অন্ততঃ একজন Wekabeর অবস্থান। [আমাদের বাস্তুদেবতার মত ?] তাদের চাহিদা বড় কম। রাত্তিরে খাবার শেষে একটুখানি ইজেরা, সুয়া আর জল রেখে দিতে হবে। রাত্তিরের জীব Wekabeরা খাবে। বাড়িতে ছেলে-পুলে হলে, বিয়ে-থা হলে তাদের জন্যে বিশেষ নৈবেদ্যের ব্যবস্থা থাকা চাই। যেদিন খাবার ও জল রাখতে ভুল হয়,

বাড়ির কেউ না কেউ নানারকম দুঃস্বপ্ন দেখে। দুঃস্বপ্ন জিনিসটা আর কিছুই নয়, Wekabeর শাস্তি। খাবার রেখে দিলে কোন কথা নেই। বাড়িকে তারা অশুভ অন্যান্য spirit থেকে রক্ষে করবে। যে বাড়িতে এমনি Wekabeর দিকে নজর থাকে, সে বাড়ির কেউ মারা গেলে রাত্তিরে শোনা যায় কে এক অশরীরী বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে। —তাদের আশীর্বাদে সাধারণতঃ ঘরে খাবার কষ্ট, রোগ-বালাই থাকে না।

Zar-দের কথা স্বতন্ত্র। তাদের হিংসে, সম্ভোগ-ইচ্ছা, প্রতিহিংসা বড় প্রবল। ডাক্তাররা যে নামই দিক, যত হিষ্টিরিয়া, টিটেনাস, পক্ষাঘাত, মানসিক বৈকল্য সবই এই Zar-দের কীর্তি। দুর্ঘটনায় পড়াটাও।

ইথিওপিয়ার উত্তরাঞ্চলে এই Zar-cult খুব বেশী প্রচলিত। ব্যাপারটা একটা সুন্দর গবেষণা-যোগ্য বিষয়। ভারতের সমাজতাত্ত্বিকরাও এর থেকে অনেক খোরাক পেতে পারেন।

এর চিকিৎসা নাকি প্রায়ই সফল হয়। খৃস্টান, মুসলমান, ইহুদি, প্যাগান নির্বিশেষে লোকে এই চিকিৎসার শরণাপন্ন হয়। Group-therapy'র একটা সুন্দর উদাহরণ Zar-পুরোহিতদের কার্যকলাপ। আমাদের দেশের ভূত-ঝাড়ানো ওঝাদেরও এমন পোক্ত সমাজ ও সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি নেই।

ইথিওপিয়ার উত্তরে টানা হ্রদের কাছে গণ্ডার পুরনো ঐতিহাসিক শহর। সেখানে এই Zar-চিকিৎসার কেন্দ্র। প্রতি বর্ধিষ্ণু গ্রামেই এইরকম চিকিৎসকের দেখা পাওয়া যাবে। আমি ছিলাম ইরিত্রিয়ার উত্তরাংশের এক বিভাগীয় শহরে। আদি উগরি। সেখানকার পুরুত ঠাকুরাণীর হাতে চুয়াল্লিশটি Zar. যার অধীনে যত Zar তিনি তত বড় পুরোহিত।

Zar ঝাড়ানোর পদ্ধতিটি এই রকম:

রোগীকে ওঝার কাছে আনা হল। তাকে নানান প্রশ্ন করা হল সর্বসমক্ষে। ধাঁচ বুঝে ওঝা তার মধ্যে মন্তরের সাহায্যে তাঁর নিজের একটি zar কে চালান করবেন। ওঝার Zar রোগীর ঘাড়ের Zar কে লোভ বা ভয় দেখিয়ে প্রকাশ্য স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য করবে। তারপর তার ছাড়বার শর্ত হিসেবে চলবে দীর্ঘ এক দরকষাকষি [ফ্রয়েডের সমীক্ষাকে হার মানিয়ে]। শেষ অবধি রোগীকে এক সমাজভুক্ত করে নেওয়া হবে সারা জীবনের জন্যে। এই সমাজের সভাসভ্যারা হচ্ছে যত প্রাক্তন রোগী, অশরীরী জাররা আর পুরোহিত নিজে। রোগ মুক্ত হলেও পুনরাক্রমণের হাত থেকে বাঁচতে

নিয়মিত চাঁদা দিতে হবে। Zar-এর পুজো (নাচ, গান, খাওয়া যার প্রধান আকর্ষণ) দিতে হবে।

চাঁদার হার ঠিক করার ব্যাপারে রোগী বা রোগিনীরা প্রায়শঃই টনটনে বাস্তবজ্ঞানের পরিচয় দেয়। প্রচণ্ড দর কষাকষি চলে। [এও নাকি Zar বা তার সাকরেদদের প্রভাবের ফল]। ওঝার প্রশ্নগুলোও অনেকটা leading ধরনের। প্রশ্ন শুরু হয় রোগীর সম্প্রতিক কার্যকলাপ, পাপ ইত্যাদি নিয়ে। যাই হোক্, শেষ পর্যন্ত রোগী একধরনের নাচ [gurri] নাচতে বাধ্য হয়— যে নাচ দেখে ওঝা তার ঘাড়ের Zar এর চরিত্র বুঝতে পারেন। [ওঝাকে নাচের direction দিতেও দেখেছি]। Patient তথা Zar বেয়াড়া হলে এই নাচ, প্রশ্ন ও স্বীকারোক্তির পালা চলে কয়েক রাত্তির ধরে।

কোন রোগী Zar দ্বারা আক্রান্ত হলে লক্ষণ বুঝে আত্মীয়রাই first-aid দিয়ে থাকেন। পরে রাত্তিরবেলায় নিয়ে আসা হয় ওঝার বাড়িতে। পুরুত (সাধারণতঃ মহিলা) থাকেন ঘরের ভিতর—পর্দা বা বেড়ার আড়ালে। ঘরের মধ্যে আলোর থেকে অন্ধকারই বেশী। আগুনের কুণ্ড থাকার ফলে বেশ গরম। ধুনো জাতীয় এক ধরণের জিনিস জ্বালানো হয়। শিষ্য-শিষ্যা বা সভ্য-সভ্যার দল (সব chronic case) ঘরের মধ্যে বসা। চুপচাপ। Patiant এর কোন আত্মীয় 'ধুনো-সেলামী' বাবদ কিছু টাকা জমা দেবেন। নিঃশব্দে সেই টাকা হাতে হাতে ওঝার কাছে চালান করা হবে। Patient-এর উপর zar এর দখল পুরোদস্তুর না হওয়া পর্যন্ত ওঝা কিছুই করবেন না। Patient যখন খুব বাড়াবাড়ি করবে তখনই ওঝার আবির্ভাব। তাঁর চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক উজ্জল ও অদ্ভুত। বেরিয়ে এসে সবাইকে সেলাম ও কুশল প্রশ্ন করবেন ধীরভাবে। ইতিমধ্যে তাঁর পুরুষ-সহকারী এক ধরনের মন্ত্র চেঁচিয়ে পড়বেন। মন্ত্রটা নাকি Zar-দের প্রশংসা। প্রার্থনাও বলা যায়। এই মন্ত্র বা প্রার্থনা উচ্চারণের সময় তালে তালে সকলে হাততালি দিতে থাকবে। তার পরেই শুরু হবে ওঝার প্রশ্নের পালা, Zar চালান দেওয়া আর gurri নাচ।

মন্ত্রগুলো পরীক্ষা করে দেখা গেছে, তার মধ্যে বহু Ge'ez (প্রাচীন ইথিওপীয়ান ভাষা), সুদানীজ, আমহারিক, টিগরাইয়া এমন কি হিব্রু শব্দও আছে। তবে সবই বিকৃত ও ব্যাকরণ বহির্ভূত। সাধারণ্যে বিশ্বাস এটা শুধু Zar-দের ভাষা। (মাতৃভাষা না হলেও তাদের বোধগম্য বটে !)

Patient-রা অধিকাংশই মহিলা। নিম্নশ্রেণীর এবং মুসলমান মহিলায় সংখ্যায় বেশী। মুসলমানদের মধ্যে বহু-বিবাহের পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া মহিলাদের মস্তিষ্ক-বিকৃতি বা হিষ্টিরিয়া। অবচেতন মনে স্বামীদের Zar-চিকিৎসার সেলামী দিতে বাধ্য করে এক ধরনের তৃপ্তি পাওয়া বিচিত্র নয়। Zar-পুরোহিতদের নেতৃত্বে গঠিত বিশেষ সমাজে কোন জাতিভেদ না থাকায়, নিম্নবর্ণের Patient দের অবনমিত অহং হয়ত তৃপ্তি পায়। তাছাড়া গরীব ও নিম্নবর্ণের রোগীর ঘাড়ে নিচু-শ্রেণীর zar এর আবির্ভাব হয় বলে, তাদের সেলামীও কম। Zar-সমাজের দুজনকে প্রত্যেক রোগীর বিশেষ তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয় [এদের বিয়েতেও (খৃস্টানদের) এমনি দুজন বন্ধু ও তত্ত্বাবধায়ক থাকে। জানিনা তার সঙ্গে এই চিকিৎসার কোন সম্পর্ক আছে কিনা।] এই তত্ত্বাবধায়ক বন্ধু রাখার ব্যবস্থার ফলে একট individual বা personal attention এর সুযোগ থাকে! গরীব রোগীদের সুতোকাটা সুয়া তৈরী করা ইত্যাদির মাধ্যমে 'পুনর্বাসনের' সুযোগ থাকায় খানিকটা অর্থ নৈতিক নিরাপত্তা বোধও থাকা সম্ভব। ('সুয়া' এদেশের স্বদেশী বিয়ার) এই সব কারণেই হয়ত Zar-চিকিৎসা পদ্ধতি অনেকখানি সার্থক এদেশে। আধুনিক শিক্ষা ও চিকিৎসা পদ্ধতির প্রসার আজও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তাছাড়া রক্ষণশীলতায় ইথিওপীয়ানরা প্রসিদ্ধ। জনৈক ঐতিহাসিকের মতে ইথিওপীয়ার সমাজ একটি জীবন্ত ম্যুজিয়ম। এই মন্তব্যের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়, যখন দেখি আসমারার মত উন্নত শহর অঞ্চল থেকেও শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা পুরো বিশ্বাস নিয়ে সুদূর গ্রামাঞ্চলে এই চিকিৎসার সন্ধানে চলেছেন। শহর ও আধুনিক সমাজের frustrationই হয়ত জারতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখছে ওদেশের শিক্ষিত সমাজেও।

স্বর্ণ-তিমির

চিত্ত ঘোষাল

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

॥ ২ ॥

নির্মলার মৃত্যুর পর দীপংকরের কর্মব্যস্ত মহলেও শৈথিল্য দেখা গেল। কয়েক দিন তিনি ফ্যাক্টরিতে গেলেন না। অনেক দিন পরে আবার তাঁর নির্মলার সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম দিনগুলির কথা মনে পড়তে লাগল। বাড়ি থেকে বড় একটা বেরোলেন না, নিতান্ত জরুরী ছাড়া কোনো কাগজপত্রে সইও দিলেন না, চব্বিশ ঘণ্টার খাস বেয়ারাকে ছুটি দিয়ে দিলেন। কর্মচারীরা চাপা গলায় ফিস ফিস করে কথা কইতে লাগল। চলাফেরা পা টিপে টিপে—নিঃশব্দে। যেন কর্ত্রীর মৃত্যুর পর তারা জানতে পারল যে তিনি ছিলেন।

চারদিন পরে দীপংকর ড্রাইভারকে হুকুম দিলেন গাড়ি বের করতে—ফ্যাক্টরিতে যাবেন। কর্মচারীদের মুখে হাসি ফুটল, চলাফেরা স্বাভাবিক হল। বড়সাহেবের মন আবার ভালো হয়েছে, কাজের চাকা আবার ঠিক ঠিক ঘুরতে থাকবে। বড়সাহেব না থাকলে যে সব অন্ধকার। অবশ্য এরা অনুগ্রহ-ভাজনেরা। দীপকংরের কাছে একটা শোকসভা করবার প্রস্তাবও নিয়ে গেল তারা। কিন্তু তিনি আমল দিলেন না, বললেন—ব্যক্তিগত শোক-দুঃখ সকলের মাঝে টেনে আনার মানে হয় না।

—কিন্তু স্যার—

—না।

কর্মচারীরা ভাবল বড়সাহেবের শোক বড় গভীর। যাই হোক, নির্মলার মৃত্যু কয়েকটা দিনের জন্য একটু মন্থরতা এনে দেওয়া ছাড়া আর কোনো বিপর্যয় ঘটাতে পারল না দীপংকরের গতিময় জীবনে। সামান্য আলোড়ন তুলে নির্মলা হারিয়ে গেলেন দীপংকরের জীবন থেকে।

কিন্তু এর বিপরীতটা ঘটল বাড়ির অন্য মহলে। জয়ন্ত আর নন্দিনী দিনের পর দিন চুপচাপ বাড়িতে বসে রইল। দুজনে কথা কইবার চেষ্টা করে দেখল বলার কথা খুঁজে পাওয়া যায় না, বুক যেন পাথর হয়ে আসে। নন্দিনীর

পরামর্শ চাইতে এসে বার বার ফিরে গিয়ে মালী শেষ পর্যন্ত নিজের ইচ্ছে মতই বাগানের কাজ করতে লাগল। লাইব্রেরীটাকে ওরা এড়িয়ে চলতে লাগল। ওখানে গান আর সাহিত্য আলোচনার আসর বসত মা থাকতে।

আশ্রিতা রাঙাদি মনে মনে নির্মলার ওপর রাগ করল। এমন করে ছেলে মেয়ে দুটোকে তিনি গ্রাস না করলেই পারতেন। একজনই যদি সব হয় কারো কাছে তবে সে গেলেই তো সর্বস্ব গেল। এখন কি করে বেচারীরা। রাঙাদি ওদের যত্নের কোনো ত্রুটি হতে দিল না। সে অশিক্ষিতা হলেও বুদ্ধিমতী, যত্নের ভারটা সে নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল, কিন্তু আপন হয়ে ওদের মনের ফাঁক ভরাবার মিথ্যে চেষ্টা সে করেনি।

দীপংকর আগের মতই সন্ধ্যের দিকে এ মহলে একবার আসেন। জয়ন্ত আর নন্দিনীর সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটিয়ে যান। সহজ আলাপের চেষ্টা করে ওদের মনে তিনি সাড়া জাগাতে পারেন না। ওদের এই অসহায়তার জন্য তিনিও মনে মনে নির্মলাকেই দায়ী করেন। নন্দনকাননটা যে কল্পনাই তা নির্মলা কখনো ভাবেন নি। বেঁচে থাকাই যদি জীবনের ধর্ম, তবে বেঁচে থাকার জন্য যে গুণ বা দোষগুলি দরকার সেগুলি অর্জন করতে না দেওয়ার সার্থকতা কি? এ সংসারে মিসফিট হওয়ার মত দুঃখ যে আর কিছু নেই নির্মলা শুধু যদি এই কথাটা জানত! এখন এই দেবশিশুদের নিয়ে দীপংকর কি করেন! তিনি চিন্তিত হয়ে ওঠেন।

একদিন সন্ধ্যেয় জয়ন্তর ডাক পড়ল দীপংকরের বাড়ির অফিসে। এমন কখনো ঘটেনি। জয়ন্তর কৌতূহল হল।

দীপংকরের মুখোমুখি টেবিলের ওদিকে বসেছিল একটি ছেলে। জয়ন্তর বয়েসী। নিখুঁত বিলেতী পোশাক।

দীপংকর বললেন—জয়ন্ত, এ অলকেশ—অলকেশ মিত্র। বিলেত থেকে ফিরে আমাদের ফ্যাকটরিতে এগ্‌জেকিউটিভ ট্রেনী হিসেবে জয়েন করেছে। যাও, তোমরা আলাপ কর।

অলকেশ উঠে দাঁড়াল—নমস্কার।

জয়ন্ত বলল—নমস্কার, আসুন।

পাশাপাশি হেঁটে যেতে যেতে জয়ন্ত এবার ভালো করে দেখল অলকেশকে। অদ্ভুত উজ্জ্বল গায়ের রং, ছোট ও পরিপাটি করে ছাঁটা চুল, দীর্ঘ শরীরে এক-বিন্দু অতিরিক্ত মেদ নেই, তীক্ষ্ণ চোখে একটা স্বাভাবিক কৌতুকের আলো,

চোয়াল সামান্য উঁচু, চিবুক উদ্ধত। চলনে হাবভাবে জড়তার লেশমাত্র নেই। অলকেশ যেন মূর্তিমান এফিসেন্সি।

অলকেশকে ড্রইংরুমে বসিয়ে জয়ন্ত নন্দিনীকে ডেকে আনতে গেল। রাঙাদিকে বলে এল চায়ের কথা।

নন্দিনীকে নিয়ে আসতে আসতে অলকেশ সম্পর্কে যেটুকু জেনেছে জয়ন্ত ওকে বলল।

নন্দিনীকে দেখে অলকেশের মনে হল দেশটা বিলেত হলে সে প্রথম কথাই বলত—ইউ আর সিমপ্লি চারমিং।

একটু কৃশ নন্দিনী, একটু কালো। কিন্তু তার কৃশতা, তার শ্যামল গায়ের রং অলকেশ আশ্চর্য হয়ে দেখল। আরেকটু স্বাস্থ্যবতী, আরেকটু উজ্জ্বল গায়ের রং হলে বোধ হয় মুখের ঐ করুণ লাবণ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকত না। নন্দিনীর অবয়বে, ঘন চুলের রাশিতে, কালো চোখে, ছিমছাম পোশাকে সুঠাম, সংযত, শান্ত একটি ছন্দ।

দেশটা বিলেত না হওয়ার দুঃখ চেপে অলকেশ উঠে দাঁড়াল চোখে এক রাশ সপ্রশংস বিস্ময় নিয়ে—নমস্কার।

হাত তুলে নীরবে নমস্কার জানাল নন্দিনী।

জয়ন্ত পরিচয় করিয়ে দিতে যাচ্ছিল—এ আমার বোন—

তাকে থামিয়ে দিয়ে অলকেশ বলে উঠল—নো ফর্মাল ইনট্রডাকশন প্লীজ। বসুন, নন্দিনী দেবী।

নন্দিনী অনুভব করছিল তার কিছু বলা উচিত। কিন্তু কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে পড়ছিল।

আর জয়ন্ত ভাবছিল অলকেশ সম্পর্কে বাবার এত উৎসাহের হেতুটি কি ? তিনি যে কোনোদিন জয়ন্ত বা নন্দিনীকে কারো সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে আগ্রহ বোধ করেছেন এমন তো মনে পড়ে না। নাকি এতকাল মায়ের আড়ালে ছিল বলে বুঝতে পারেনি বাবার ভালোবাসা ? মা চলে যেতে আজ তিনি হয়তো তাদের সুখদুঃখের ভাগ নিতে চেষ্টা করছেন, তাদের নিঃসঙ্গতা দূর করতে চাইছেন।

জয়ন্তর চিন্তার প্রতিধ্বনি করে অলকেশ বলল—মিষ্টার বোস বলছিলেন আপনারা বড় লোন্‌লি...। তাই ধরে নিয়ে এলেন আমাকে। বাট, আই অ্যাম পসিব্‌লি অ্যান ইনট্রুডার।

অলকেশের লক্ষ্য বিশেষ করে নন্দিনী। লজ্জা পেল ভাই-বোন। ভদ্রলোক এই প্রথম এলেন তাদের বাড়িতে। কোথায় তারা তাকে স্বচ্ছন্দ হতে সাহায্য করবে, তা নয় নিজেরাই আড়ষ্ট হয়ে আছে।

জয়ন্ত বলল—না, না, তা কেন। আপনি এসেছেন ভালোই হল। বিদেশের গল্প শোনা যাবে।

—বিদেশ মানে তো এক ইংলণ্ড, অলকেশ বলল, ওদেশটার কথা আপনারা এত শুনেছেন যে বলার মত আর কিছু নেই। তার চেয়ে আপনাদের কথা বলুন—

—আপনার কথাই আগে শুনব, কারণ আপনি গেষ্ট, জয়ন্ত হেসে বলল, বলুন কি পড়তে গিয়েছিলেন বিলেতে।

—সর্বনাশ করেছেন, অলকেশ কৃত্রিম আশংকা প্রকাশ করল, আমার সাবজেক্ট শুনলে হয়তো আমাকে বন্ধু হিসেবে মেনে নেওয়া কঠিন হবে আপনাদের।

—কেন বলুন তো? নন্দিনী শুধাল।

—আপনারা দুজনেই সাহিত্যের ভালো ছাত্র। আপনাদের কারবার এস্‌থেটিক্‌স্ নিয়ে। আর আমাদেরটা হল একেবারে বাস্তব, কাঠখোট্টা—

—সাহিত্য বুঝি অবাস্তব? নন্দিনী এতক্ষণে সহজ হয়ে আপত্তি তুলল। কিন্তু আপনি দেখছি আমাদের সব খবরই নিয়ে রেখেছেন।

অলকেশ হাত জোড় করে বলল—মাপ করবেন, সাহিত্যে বাস্তবতা নিয়ে যদি তর্ক তোলেন আমাকে চুপ করেই থাকতে হবে। সাহিত্যের আমি কিস্‌সু বুঝি না। আর ঐ যে বললেন আপনাদের সব খবর নিয়ে রাখার কথা, ওটা স্বভাবের দোষ।

—কি রকম? জয়ন্ত বলল।

—আমাদের প্রফেসর মিষ্টার ওয়ারেণ অতিষ্ঠ হয়ে বলতেন, তোমার প্রশ্নের ঠ্যালায় আমাকে ক্লাস করা ছাড়তে হবে দেখছি। যখন হাতে কলমে কাজ করবে তোমার সাবর্ডিনেটদের কপালে কি আছে বুঝতে পারছি। অবশ্য এটা ওঁর অ্যাপ্রিসিয়েশন। আমাকে খুব ভালোবাসতেন।

—আপনি বিজনেস ম্যানেজমেণ্ট পড়তে গিয়েছিলেন?

—এবং হাতে কলমে কিঞ্চিৎ শিক্ষা নিতে।

একটু চাপা গর্ব অলকেশের কথার সুরে। নন্দিনীর কানে তা ধরা পড়ল।

সে বলল—সাবজেক্টটা আপনার ভালো লাগে ?

—অবশ্যই, নিজের সাবজেক্ট নিয়ে কথা বলতে পেরে অলকেশের উৎসাহ টগ্‌বগিয়ে উঠল, এ যুগটাই বিজনেসের। বাইরে থেকে মনে হয় অত্যন্ত নীরস, ভেতরে ঢুকলে দেখতে পাবেন বৈচিত্র্য আর উত্তেজনার অন্ত নেই। ব্যাপারটা কি করে বোঝাই আপনাদের। ধরুন আপনি কোথাও আনট্যাপড রিসোর্সেস দেখলেন, আপনার ট্রেনড বিজনেস ফোরসাইট দিয়ে বুঝলেন এটাকে কাজে লাগানো যেতে পারে। এবার আপনার বুদ্ধি আর ব্যক্তিত্বকে লাগালেন ক্যাপিটাল সংগ্রহের কাজে। লোককে কনভিন্স করবার ক্ষমতা আপনার থাকা চাই, নইলে কেউ টাকা ইনভেস্ট করবে না। তারপর আপনাকে প্রয়োজনীয় ট্যালেণ্ট খুঁজে বের করতে হবে। আস্তে আস্তে গড়ে উঠবে বিরাট অর্গ্যানিজশন। আমার তো মনে হয় একটা সাকসেসফুল ছবি আঁকা বা বই লেখার থেকে এতে ক্রিয়েটিভ আনন্দ অনেক বেশি। আপনি সিন্‌ক্রোনাইজ করেছেন সমস্ত ফ্যাক্টরগুলোকে। আর সে কাজ করতে গিয়ে প্রত্যেকটা স্টেপে আপনাকে বুদ্ধি আর মনোবলের পরীক্ষা দিতে হয়েছে। দিস ইজ লাইফ....দি একসাইটমেণ্ট, দ্যা শো অব্ স্ট্রেন্‌থ্...

বলতে বলতে রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল অলকেশ, যেন বিতর্কে প্রতিপক্ষকে বোঝাতে চেষ্টা করছিল তার বক্তব্যের সারবত্তা। হঠাৎ সে সামলে নিল নিজেকে—দেখুনতো কি বোকার মত বাজে বকছি। পারহ্যাপ্‌স্ ইউ ডোণ্ট ফাইণ্ড ইণ্টারেস্ট ইন সাচ থিংস্।

জয়ন্ত হেসে বলল—আপনার দুঃখিত হবার কারণ নেই। আমাদের খুব ভালো লাগছে।

—যাক্, আই অ্যাম অ্যাশুরড। এমন ভাবে বলল অলকেশ যে নন্দিনী হেসে ফেলল।

অনেকদিন পরে এ বাড়িতে খুশির হাওয়া নিয়ে এসেছে অলকেশ। ওর কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করল নন্দিনী। জয়ন্তর মনে হল অলকেশ বন্ধু হিসেবে মন্দ হবে না।

চাকর চা এবং আনুষঙ্গিক দিয়ে গেল। নন্দিনী পট থেকে চা ঢেলে দুধ চিনি মিশিয়ে দিল অলকেশ আর জয়ন্তকে, খাবারের প্লেট এগিয়ে দিল ওদের দিকে। নিজে নিল শুধু এক কাপ চা।

অলকেশ বলল—দেখুন নন্দিনী দেবী, খাওয়ার ব্যাপারে আমার লজ্জা

নেই। কিন্তু আপনি একেবারেই কিছু না খেলে একটু অস্বস্তি লাগবে।

—আমি ওঘরে যাচ্ছি, তাহলে আর খারাপ লাগবে না আপনার।

—সেটা কি শিষ্টাচারসম্মত হবে। নিন, কিছুটা অন্তত ভারমুক্ত করুন।

—অগত্যা—, অসহায়তার ভঙ্গী করে নন্দিনী একটা পেস্ট্রি তুলে নিয়ে বলল, এবার হলো ত। সুরু করুন।

খেতে খেতে অলকেশ বলল—আপনারা ছবি দেখেন?

—দেখি। খুব বেশি নয়। জয়ন্ত বলল।

—হালের ইউরোপীয়ান ছবিটবি দেখেছেন? কেমন লাগে?

উত্তর দিতে গিয়ে একটু অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করল জয়ন্ত—দেখার সুযোগ তেমন হয়নি, তবে কিছু কিছু আলোচনা পড়েছি।

—আমি দেখেছি, অলকেশ বলল, আচ্ছা যা পড়েছেন তাতে কি মনে হয় এসব ছবি আপনার ভালো লাগবে?

—হয়তো আমি ঠিক বুঝতে পারি না, জয়ন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে বলল, মনে হয় আমার খুব ভালো লাগবে না। জীবন সম্পর্কে এদের অ্যাটিটিউড আমি ঠিক বুঝতে পারি না। হয়তো আধুনিকতার অর্থ আমি ঠিক বুঝি না।

—বাঁচালেন, স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ার মত করে হাসল অলকেশ, আপনার সঙ্গে আমার মিলবে, মশাই। বিলেতে থাকতে এসব ছবি বিস্তর দেখেছি, একদম ভালো লাগেনি। বুঝতেই পারিনি ওদের পিকিউলিয়ার সিনিসিজম্—

ওর বলার ভঙ্গীতে হেসে উঠল জয়ন্ত আর নন্দিনী।

—আমি ছবি দেখি প্লেন এণ্টারটেনমেণ্টের জন্যে। আপনারা? অলকেশ বলল।

জয়ন্ত সম্পূর্ণ একমত নয়, তাই এড়িয়ে গেল প্রশ্নটা—আমি দেখি সময় কাটানোর জন্য।

—কোয়াইট রিজনেবল। ছবিতে মশাই তত্ত্বটত্ত্ব আমার সহ্য হয় না। লাইফকে বুঝতে হলে কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। সিনেমার পর্দায় দেড়-দু'ঘণ্টায় জীবনের ব্যাখ্যা? ইমপসিবল্।

কৌতূহল নিয়ে নন্দিনী শুনল অলকেশের বক্তব্য। মনে হল, কথাটা খুব মিথ্যে নয়।

চা-পর্ব শেষ হতে অলকেশ বলল—আমাদের বাড়িতে একদিন আসুন না। মা খুব খুশী হবেন।

অলকেশ চলে যেতে জয়ন্ত বলল—বেশ ভদ্রলোক। কোনো প্রিটেনসন্ নেই।

নন্দিনী বলল—হুঁ, বাবা একটি যোগ্য শিষ্য পেয়েছেন।

॥ ৩ ॥

মাকে হারানোর দুঃখ জয়ন্ত আর নন্দিনী আস্তে আস্তে মেনে নিতে পারল। প্রথমে যে নিদারুণ সত্যটা অবিশ্বাস্য মনে হত, অসংখ্য স্মৃতির অনুষঙ্গে যে যন্ত্রণা বুকের মধ্যে তোলপাড় করে উঠত, সেটা এক সময় শান্ত হয়ে এল। মায়ের জন্য শোক ওদের মনে এক আশ্চর্য পবিত্রতায় মণ্ডিত হয়ে রইল। ওরা দুজনে মায়ের সুন্দর স্মৃতিগুলির মধ্যে তাঁকে অনুভব করতে শিখল, তাঁর নানা চিন্তা ও ইচ্ছার পর্যালোচনা করে যেন আবার তাঁকে ফিরে পেল। মার স্মৃতি এখন ওদের কাছে জীবনের সমস্ত পবিত্রতা ও সৌন্দর্যের প্রতীকের মত।

কিন্তু স্মৃতিচর্চার পরেও নিতান্ত নিজস্ব একটা জীবন মানুষের থাকেই। সেখানে জয়ন্ত দেখল সে একেবারে নিঃসম্বল। মা যখন বেঁচেছিলেন নানান পরিকল্পনা, আলোচনা আর কাজে মাতিয়ে রাখতেন ওদের। সেসব কাজের ব্যবহারিক মূল্য যাই হোক, হৃদয়ের কাছে ছিল অপরিসীম মূল্যবান। এখন কিছু একটা করার জন্য হাঁপিয়ে উঠল জয়ন্ত।

কিছুদিন আগে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে নেহাৎ খেয়ালের বশেই জলপাইগুড়ির ওদিকে এক কলেজে চাকরির দরখাস্ত করেছিল।

ভুলেই গিয়েছিল জয়ন্ত। হঠাৎ একদিন চিঠি এসে হাজির। প্রিয় মহাশয়কে তাঁহার···তারিখের পত্রের উত্তরে অনুরোধ করা যাইতেছে যে তিনি যেন···তারিখে সকাল এগারোটার সময় অত্র কলেজে গভর্নিং বডির সম্মুখে ইণ্টারভিউ দিতে হাজির থাকেন। শিক্ষার অভিজ্ঞানপত্রগুলি সঙ্গে আনা প্রয়োজন। রাহা-খরচ কলেজ কর্তৃপক্ষ দিবেন। আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থাও কলেজ কর্তৃপক্ষ করিবেন। একেবারে জয়েন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিলে ভালো হয়।

চিঠিখানা নিয়ে জয়ন্ত গেল নন্দিনীর কাছে।

নন্দিনী পোর্টিকোয় টাবে ঝোলানো ক্যাকটাসের পরিচর্যা করছিল।

—এই ছাখ। নন্দিনীকে চিঠিখানা দিল জয়ন্ত।

নন্দিনী পড়ল। পড়ে কাগজখানা জয়ন্তর হাতে দিয়ে আবার ক্যাকটাসের গোড়ার মাটি আলগা করে দিতে দিতে অন্যমনস্কভাবে বলল—কি ঠিক করলে?

—ভাবছি যাব।

—অতদূর গিয়ে যদি কাজটা না পাও?

—ফিরে আসব। তবে চিঠি পড়ে মনে হচ্ছে ইণ্টারভিউটা ফর্মাল, ওঁরা আমাকেই নেবেন।

—বাবাকে বলেছ?

—বলিনি, বলব। উনি তো কোনোদিন আমাদের ব্যাপারে থাকেননি। নিশ্চয়ই আপত্তি করবেন না।

—তখন মা ছিলেন।

—দেখিস তুই, বাবা আপত্তি করবেন না।

অল্প সময় চুপ করে থেকে নন্দিনী বলল—তুমি যেতে চাইছ কেন?

—আমি যেন কেমন হাঁপিয়ে উঠছি, নন্দি।

—আমি উঠছি না?

—তুই কি চাস আমি না যাই?

পাল্টা প্রশ্ন করল নন্দিনী—কোনদিন একা থেকেছ? কে তোমার দেখাশোনা করবে?

—একটা চাকর রাখব।

—চিরকাল মার যত্ন পেয়েছ, এখন চাকরের যত্নে শরীর থাকবে না মন টিঁকবে।

—দেখিস্, ঠিক পারব। সব সয়ে যাবে।

—তার আগে আমাকে হস্টেলে পাঠিয়ে দিও। বলে আর দাঁড়াল না নন্দিনী।

জয়ন্ত ওকে ফিরে ডাকতে গিয়েও ডাকল না। ওর ইচ্ছেটা নন্দিনী স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিয়ে গেছে।

অতএব চাকরি নিয়ে বাইরে যাবার আশা জয়ন্তকে ছাড়তে হল।

দীপংকর ইতস্তত করছিলেন। অনেক আগেই তাঁর জয়ন্তকে বলা উচিত ছিল। নির্মলার ভাবপ্রবণতাকে প্রশ্রয় দিয়ে তিনি ভালো করেননি।

এখন জয়ন্ত যদি রাজি না হয়? কিংবা রাজি হয়েও যদি নিজেকে না পারে তার কাজের যোগ্য করে তুলতে? অবশ্য অলকেশকে তিনি পেয়েছেন। ছেলেটি বুদ্ধিমান, দায়িত্ব নিয়ে কাজ করার ক্ষমতা রাখে। জয়ন্তকে সে চালিয়ে নিতে পারবে। তিনি যখন থাকবেন না জয়ন্ত আর অলকেশ নিশ্চয়ই পারবে তাঁর গড়ে তোলা প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখতে, এগিয়ে নিয়ে যেতে। অলকেশ সম্পর্কে আরো একটা পরিকল্পনা আছে তাঁর। সেটা ভবিষ্যতের কথা। আপাতত জয়ন্তর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করা দরকার। বেটার লেট দ্যান নেভার। জয়ন্তকে ডেকে পাঠালেন দীপংকর।

—আমার মনে হয় তোমার এবার বিজনেসে আসা ভালো। সময় থাকতে সব বুঝে নেওয়া দরকার।

সরাসরি জয়ন্তকে কাজে যোগ দেবার কথা বলতে দীপংকরের দ্বিধা ছিল, তাই তিনি যেন তার মতামত জানতে চাইছিলেন।

কিন্তু জয়ন্ত বলল—কবে থেকে যাব বলুন।

—ইফ ইউ আর রেডি, দীপংকর খুবই উৎসাহিত হলেন, আজ থেকেই।

—আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি।

ব্যাপারটা যে এত সহজ হবে দীপংকর তা ভাবতেও পারেননি। জয়ন্ত যেন তাঁর বলার অপেক্ষায়ই ছিল। দীপংকর সুখী হলেন। হাজার হোক তাঁরই ছেলে তো। নির্মলার আঁচলের ছায়াটা সরে যেতে আজ আর বাইরের রোদকে তার ভয় নেই।

যাহোক একটা কাজ, নিজেকে ডুবিয়ে রাখার মত কিছু তবু পাওয়া গেল। নিষ্কর্ম দিনগুলোকে বয়ে বেড়ানোর হাত থেকে এবার বাঁচা যাবে। হয়ত একাজ তার ভালোই লাগবে, অলকেশ যে বলে একাজের মধ্যেও ক্রিয়েটিভ আনন্দ আছে সেকথাটা মিথ্যে নাও হতে পারে। তবু একেবারে সংশয়মুক্ত হতে পারে না জয়ন্ত।

গাড়িতে যেতে যেতে দীপংকর বললেন—জয়, প্র্যাকটিক্যাল কাজের ভেতর দিয়ে তুমি আস্তে আস্তে বিজনেসের সমস্ত সাইডগুলো বুঝে নিতে পারবে। তোমার অভিজ্ঞতা নেই, কিন্তু আমি রয়েছি। অলকেশের সাহায্যও তুমি পাবে। হি ইজ ভেরি ইনটেলিজেন্ট। শুধু কিছুদিন সময় লাগবে, তার জন্য চিন্তা নেই, আই অ্যাম নট ইয়েট টু ওল্ড।

মৃদু হাসলেন দীপংকর। আজ তাঁকে খুব সহজ ও অন্তরঙ্গ মনে হচ্ছে। জয়ন্ত বলল—আমার কাজের নেচার কি হবে?

—তুমি চাকরি করতে যাচ্ছ না, দীপংকর বললেন, কোনো বিশেষ কাজ নয়, সমস্ত মেশিনারিটাই তোমাকে জেনে নিতে হবে। মনে রেখো ফ্যাক্টরি আর অফিস মিলিয়ে দুহাজার লোককে তোমাকেই একদিন চালাতে হবে। ইউ মাস্ট বি এ গুড সোলজার, জয়।

দীপংকরের কণ্ঠে আবেগ ও উত্তেজনার ছোঁয়া লেগেছে, যেন তাঁর অনেক দিনের একটা স্বপ্ন আজ সার্থক হতে চলেছে। ঈষৎ দুঃখিত হল জয়ন্ত। এতকাল সে মানুষটাকে বঞ্চনা করে এসেছে। তাঁর কর্মময় জীবনে নিজের হাতে তিনি যা গড়ে তুলেছেন তার ধারাবাহিকতা সন্তানের হাতে তুলে দেওয়া নিশ্চয়ই তাঁর ঈপ্সিত, শুধু মার মুখ চেয়ে ইচ্ছেটা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারেন নি। কিন্তু জয়ন্তর বোঝা উচিত ছিল। মাকে বঞ্চনা না করেও সে কি পারত না বাবাকে সাহায্য করতে? যাই হোক, বাবার আজকের আশা ও উৎসাহের মর্যাদা সে রাখবে, নিজেকে তার কাজের যোগ্য করে তুলবে।

চুরুটের ছাই ঝেড়ে দীপংকর বললেন—আরেকটা কথা, ব্যবসার একটা গাইডিং প্রিন্সিপ্‌ল্‌ আছে। শুধু আমার নয়, সব বিজনেসম্যানেরই। সেটা তোমাকে বুঝতে হবে। ব্যবসাকে বাঁচাতে হলে, বড় করতে হলে তোমার নিজের দিকটা ষড়ায় ক্রান্তিতে বুঝে নিতে হবে। লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, দয়ামায়া ইত্যাদিকে প্রশ্রয় দেওয়া সেখানে চলবে না। দয়াদাক্ষিণ্য করতে চাও করো, কিন্তু সেটা বাইরে। দেখবে সবাই নিজের লাভের দিকটা দেখছে—সাপ্লায়ার্স, কনট্রাকটরস্‌, কমপিটিটর্স—সবাই। সেক্ষেত্রে তুমি যদি দুর্বল হও দে উইল সাক ইউ হোয়াইট। দাবী যত ন্যায়সঙ্গতই হোক দাবীদারকে কখনো সেটা বুঝতে দেবে না। বারগেনিং হচ্ছে ব্যবসার মূল কথা। যাদের নিয়ে তুমি কাজ করবে অফিসর্স, ক্লার্কস্‌ অ্যাণ্ড লেবার—দে আর এ মীন লট, অর্গ্যানিজেশনকে ভালোবাসে না, শুধু চাকরি করতে আসে। যদি এদের কোনো দাবী তুমি সহজে মেনে নাও, আরো বড় দাবীর ফর্দ নিয়ে তখনই আবার হাজির হবে। তাই তুমি যে শক্ত লোক সেটা সব সময় ওদের বুঝিয়ে দেবে। কারো অভাব অনটন দূর করার দায়িত্ব আমাদের নয়। আমরা তোমার কাজের জন্য যা যোগ্য পারিশ্রমিক বলে মনে করি তাই দিচ্ছি, ইউ মে অ্যাকসেপ্ট অর কুইট।

ব্যবসার এ ছাড়া কোনো নীতি নেই। অনেক ব্যাবসায়ীদের মুখে বড় বড় কথা শুনবে—দেশসেবা, সমাজমঙ্গল এইসব, বাট হোয়েন প্রফিট ইজ ইনভলভড দে আর অল অ্যালাইক। একটা আইওয়াশ রাখতে হয়, সময় বিশেষ আমরাও রাখি। প্রফিট মোটিভটাই যদি ভাইটাল না হবে তাহলে প্রাইভেট ওনারশিপে প্রোডাকশন কেন? তাহলে ত আপসে সমাজতন্ত্র হয়ে যাবার কথা।

চুরুটটা বাইরে ফেলে দিয়ে নড়েচড়ে বসলেন দীপংকর।

তাঁর কথাগুলি মনোযোগ দিয়ে শুনছিল জয়ন্ত। শুনতে শুনতে তার উৎসাহ যেন নিভে গেল। বিরাট কর্মকাণ্ডের পিছনের উদ্দেশ্যটাকে এত ছোট ভাবতে কষ্ট হয়। বড় উলঙ্গ, বড় তুচ্ছ। হঠাৎ জয়ন্ত কেমন অসহায় বোধ করল। তারপরই মনে হল বাবা হয়তো তাকে বাজিয়ে নিচ্ছেন, বুঝতে চাইছেন কতখানি মনোবল তার আছে।

জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল জয়ন্ত। অল্প দূরেই ফ্যাক্টরি। নারকেল গাছের মাথা ডিঙিয়ে অ্যাসবেসটসের শেড দেখা যাচ্ছে। গলগল করে ধোঁয়া উঠছে চিমনির মুখ দিয়ে।

একটানা সাইরেনের মত ফ্যাক্টরির বাঁশী বেজে উঠল। দীপংকর হাতের ক্রোনোমিটারে সময় দেখলেন!

ফ্যাক্টরির সামনে গাড়ি দাঁড়াল। মেন গেট দিয়ে কর্মীরা ভেতরে ঢুকছে। পাশের আরেকটা গেট খুলে গেল, বন্দুকধারী দারোয়ান মিলিটারী স্যালুট ঠুকে দাঁড়াল। ফ্যাক্টরি কম্পাউণ্ডে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ড্রাইভার নেমে এসে দরজা খুলে দিল। চাপরাশী ছুটে এসে দীপংকরের পোর্টফোলিও আর ফ্লাস্ক তুলে নিল। অনেকগুলি সেলামের উত্তরে ডান হাতখানা সামান্য তুলে কোনো দিকে না তাকিয়ে জয়ন্তকে নিয়ে সোজা এগিয়ে চললেন তিনি।

একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোককে এদিকে আসতে দেখে এক সেকেণ্ড থেমে দীপংকর তাকে ডাকলেন—মিষ্টার লাহিড়ী—

ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে কাছে আসতেই দীপংকর আবার চলতে সুরু করে বললেন—আপনার ঘড়িটা বোধ হয় স্লো চলছে, মিলিয়ে নেবেন, হুইস্‌ল্ দেড় মিনিট দেরিতে বেজেছে।

খুবই লজ্জিত দেখাল ভদ্রলোককে, কাঁচুমাচু হয়ে সে কি বলল জয়ন্ত শুনতে পেল না।

নিজের চেম্বারে গিয়ে দীপংকর তখনই ডেকে পাঠালেন মিস্টার লাহিড়ী আর অলকেশকে।

দুজনে প্রায় একই সঙ্গে ঘরে ঢুকল। দীপংকর অলকেশকে বললেন—বস।

মিস্টার লাহিড়ী দাঁড়িয়ে রইল।

দীপংকর বললেন—মিস্টার লাহিড়ী, জয়ন্ত আজ থেকে অফিসে বসবে। মিস্টার মিত্রের ঘরে এর বসার ব্যবস্থা করে দিন। জয়ন্ত, ইনি মিস্টার লাহিড়ী, ফ্যাক্টরি সুপার।

হাত তুলে নমস্কার করল জয়ন্ত। মিস্টার লাহিড়ী নমস্কার করতে গিয়ে বেশ খানিকটা ঝুঁকে পড়ল।

মিস্টার লাহিড়ীকে যেতে বলে দীপংকর অলকেশকে বললেন—অলক, জয়ন্তকে নিয়ে যাও। কাজ কর্ম আস্তে আস্তে বুঝিয়ে দিও।

—আচ্ছা, স্যার।

দীপংকরের আদেশ এখানে মন্ত্রের মত কাজ করে। আধঘণ্টার মধ্যে দামী কাঁচে ঢাকা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি টেবিল আর গদিমোড়া রিভলভিং চেয়ার এসে গেল জয়ন্তর জন্য। ক্রিস্টাল গ্লাসের দোয়াত দান, ডেট কার্ড, কলম, পেন্সিল, পেপারওয়েট, সুদৃশ্য কলিংবেল সুন্দর করে টেবিলে সাজিয়ে দিয়ে গেল চাপরাশী। তদারকি করল মিস্টার লাহিড়ী।

কেনো অসুবিধা হলে তখনই তাকে ডেকে পাঠানোর অনুরোধ জানিয়ে মিস্টার লাহিড়ী চলে যাবার পর অলকেশ বলল—বাঁচলাম, মশাই। এবার তবু কথা বলে শান্তি পাব।

—কেন, এতদিন কথা বলার লোক ছিল না এখানে?

—সত্যিই ছিল না। যাদের আদেশ দিতে শিখছি তাদের সঙ্গে আদেশের কথা ছাড়া আর কি বলা যায় বলুন।

জয়ন্ত একথার উত্তর দিতে পারল না।

কামরার পিছন দিকে দামী পর্দায় ঢাকা বড় কাঁচের প্যানেল। চাপরাশীকে পর্দা সরিয়ে দিতে বলে জয়ন্ত সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। সামনে ছবির মত ফ্যাক্টরি, পরিচ্ছন্ন কম্পাউণ্ড। কিছু লোক ব্যস্তভাবে এদিক ওদিক আসা যাওয়া করছে। যান্ত্রিক শব্দের মিশ্র কলতান শেডের ভিতর থেকে উঠে আসছে। কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী বেরুচ্ছে চিমনির মুখ দিয়ে। নারকেল

গাছের পাতাগুলি ধোঁয়ায় বিবর্ণ হয়ে গেছে। এর আগেও জয়ন্ত ফ্যাকটরিতে এসেছে, ঘুরে ঘুরে সব ডিপার্টমেণ্ট দেখেছে, সে দেখায় কৌতূহল ছাড়া আর কিছু ছিল না। আজকের দেখা অন্য রকম। আকাশ পাতাল ভাবতে লাগল জয়ন্ত।

অলকেশ একখানা বই হাতে নিয়ে জয়ন্তর পাশে এসে দাঁড়াল—নিন জয়ন্তবাবু, বইটা পড়ে ফেলুন। ফ্যাকটরি অ্যাক্ট। এটি ছাড়া আমাদের এক পাও চলার উপায় নেই। অন্যমনস্কভাবে বইখানা নিয়ে জয়ন্ত চেয়ারে এসে বসল।

ক্রমশঃ

অগ্নিদগ্ধ

সাধন চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

৪

পরদিন স্কুলে যাওয়ার পথে পাড়া থেকে বড় রাস্তায় উঠবার মোড়েই হঠাৎ কে যেন পিছন থেকে ডাকদিল। মনে হল খানিকটা দূরের চায়ের দোকান থেকে আওয়াজটা ভেসে এসেছে।

"এই যে খোকা···ও খোকা।"

পরশু ঘুরে দাঁড়ায়।

বই হাতে একটি ছেলে দোকান থেকে বেরিয়ে এল। লম্বায় সে পরশুর চাইতে বেশ খানিকটা উচুঁ, বলিষ্ঠ দেহ, মাথার চুলগুলো যত্ন করে আঁচড়ানো। নাকটা মোটা, ঠোঁট দুটো কাল ও পুরু। সাধারণের চাইতে কপালটাও একটু উচুঁ ধরনের।

দূর থেকে পোষাক দেখেই পরশু ধরতে পেরেছে সোদপুর হাইস্কুলের ছাত্র। কাল হাফ প্যাণ্ট ও সাদা শার্ট। কাছে এগিয়ে আসতে সে খানিকটা অবাক হল। মুখটা তার চেনা চেনা। স্কুলেই দেখেছে, কিন্তু কোথায় ঠিক মনে করে উঠতে পারছে না। "নামটাই ভুলে গেলাম তোমার...কি যেন ?···কি যেন ?...ও হোঃ পরশু পরশু।" পরশু অবাক হয়ে যায়। প্রচণ্ড বিস্ময়ে তার চিন্তা তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। সে এ মুহূর্তে কিছুই ভাবতে পারে না।

দুজনে এক সাথে হেঁটে চলছিল। ছেলেটির চালচলনে একটু বেপরোয়া ভাব। হাতের বই আর বাঁধান খাতাটা বগলদাবা করে হঠাৎ কোৎ কোৎ করে নস্যি নিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে বল্লু, "আমার নাম বিধান বোস।"

"কোন ক্লাশ আপনার ?"

বিধান একটু অবাক হয়। "আপনি কিহে ? একই ক্লাশতো। কাল

খেয়াল হয়নি ?" পরশু একটু লজ্জা পায়। না হলে, সে পরশুর নাম জানল কি করে ?

এমনি ভাবে আলাপ আরও জমে উঠল। বিধান সোদপুর স্কুলের পুরোন ছাত্র, তাই মাষ্টারমশাইদের প্রসঙ্গ উঠতে সে প্রত্যেকের সম্বন্ধে নিজের একটা ফিরিস্তি দিয়ে দিল। অবিশ্যি, এ ফিরিস্তি শুধু তার একলার নয়, স্কুলের সমস্ত ছেলেরাই জানে।

ক্রমে লাইনের দুধারটা দেখে ওরা এ পারে চলে এল। বিধান তাড়া দিয়ে বল্ল, "চল, একটু তাড়াতাড়ি চল, জানলার ধারটায় বসতে হবে।" পরশুরও এইটেই পছন্দ। আস্তে বল্ল, "দেরী আছে'ত...পাওয়া যাবে না ?" জবাবে বিধান এমন একটা মুখের ভঙ্গি করল যেন অর্থটা দাঁড়ায়, "হ্যাঁ হ্যাঁ, বিশেষ অসুবিধা হবে না, পাওয়া যাবে জায়গাটা।"

আবার সেই অস্বস্তিকর প্রথম চল্লিশটা মিনিটের ব্যাপার। নামডাকা শেষ হয়ে গেলে পরশু জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে।

"well"—ঝরঝরে গলায় প্রভাতমাষ্টার বলে উঠল, "পড়া ধরব।" সব ছেলেরা অবাক। সবে গতকাল থেকে স্কুল শুরু, বই কেনা হয়নি কারও, কি পড়া ধরবেন উনি ?

"কি নিয়ে তোরা এ ক্লাশে উঠলি, একটু যা চাই করি।"

ক্লাশময় স্তব্ধতা, কেবল শেষ দিকের ছেলেরা একটু উস্‌খুস্ করছিল।

"জিরাণ্ড কাকে বলে ?···you···হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুই।"

একটি রোগা মত কাল ছেলে উঠে দাঁড়াল। মনে হল আগে কোনদিন সে এ শব্দটা শোনেনি। প্রাণহীন চোখজোড়া নিয়ে মিনিটখানেক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। প্রভাতমাষ্টার কপাল কুঁচকে দুবেঞ্চ পেছনের একটি ছেলেকে বল্লেন, "তু-ই ?"

"পারব না স্যার।"

এমন সাহস ভরে না পারার কথাটা জানানো মাষ্টারমশাইএর কাছে অশোভন ঠেকল। রেগে চীৎকার দিয়ে উঠলেন, "you-stupid." চোখদুটো তার চশমার ফাঁক দিয়ে পিট্‌পিট্ করতে থাকে।

বিধান পরশুকে আস্তে একটা খোঁচা দিল। "শকুনী-শকুনী।"
পরশু তাকিয়েছিল বাইরে, ঘুরে তাকাতেই ফিক্ করে হেসে ফেলে সে।

"you—হ্যাঁ, তুই...বল জিরাণ্ড কাকে বলে ?

এমনভাবে ধরা পড়ে যাবে পরশু ভাবতে পারেনি। প্রথমটা সে ঘাবড়ে গেল। রাগ হল বিধানের ওপর। যেন ষড়যন্ত্র করে তাকে প্রভাতবাবুর কাছে ঠেলে দেয়া হয়েছে। কি দরকার ছিল খোঁচা দেয়ার! খানিক বাদে কোন রকমে সে জিরাণ্ডের ডেফিনেসানটা দিয়ে দেয়।

"তবে তুই হাসছিলি যে?......কে হাসতে বলেছিল?"

পরশু জবাব দেয় না। মাথাটা নীচু করে থাকে।

"দাঁড়িয়ে থাক সমস্ত ঘণ্টা।"

এক অস্বস্তিকর লজ্জা ও গ্লানিতে পরশু মর্মাহত হচ্ছিল। সমস্ত ক্লাশটা তখন ভয়ানক স্তব্ধ হয়ে পড়েছে।

শুধু পরশু আর 'পারব না স্যার' বলেছিল যে ছেলেটা—সুশীল, দাঁড়িয়ে রইল।

বাইরে সাইডিংসে মাল ওঠান-নামান চলছিল তখন। জনাপনের কুলী শ'তিনেক চৌকো লোহার থাম এক এক করে ছাদ-খোলা একটা মালগাড়ির কামরায় তুলছিল। তারই ঠং ঠাং শব্দ, মানুষগুলোর হৈ হৈ চীৎকার তেতলার এ ঘরখানাতে আসছিল ভেসে।

দ্বিতীয় ঘণ্টাতে কোন ক্লাশ হল না। নিখিলবাবুর আসার কথা ছিল, কিন্তু তিনি আজ অনুপস্থিত। অনেকক্ষণ ধরে ছেলেরা ক্লাশের মধ্যে হৈ হৈ করল, বারান্দায় বেরিয়ে এল, তারপর দরজা-জানলা বন্ধ করে বেঞ্চি পিটোতে শুরু করল। বিধান গতকাল বিকেলে একটা সিনেমা দেখেছিল, সে তা থেকেই একটা হিটগান শুরু করে দেয়।

দ্বিতীয় ঘণ্টার পর স্কুল ছুটি হয়ে যেতেই বিধান, সুশীল এবং আরও পাঁচ ছটি ছেলে গেটের বাইরে এসে একটা চায়ের দোকানের সামনে আলাপ করছিল ষ্টেশনের প্লাটফর্মে খানিকটা আড্ডা দেয়ার জন্য। সমস্তটা দিন বড়িতে বসে বসে কাটান একটা বিরক্তিকর ব্যাপার। তা ছাড়া বিধানের পিপাসা পেয়েছিল, সে সিগারেট খাবে।

পরশু এ সময়টা আপন মনে গেট পেরিয়ে যেতেই, বিধানের ডাকে ফিরে তাকায়।

"এখনি বাড়ি চল্লে? ......কি করবে গিয়ে?

"যাব। একটু দরকার আছে।"

"আমিও যাব। একইত রাস্তা। চল, প্লাটফর্মটা খানিক ঘুরে-টুরে যাই।"

পরশু গেল না। একেই প্রথম ঘণ্টার জন্য তার মনে একটা জ্বালাময়ী অনুশোচনা দেখা দিয়েছে, হঠাৎ যেন মা'কে ফাঁকি দিয়ে সে অনেককিছু অন্যায় করে ফেলেছে, তারপর, ষ্টেশনে আড্ডা মারার এত বড় দুঃসাহস তার নেই। সুতরাং পরশু ধরে বাড়ির পথ।

আকাশটা পরিষ্কার এবং মৃদু মৃদু হাওয়ার সাথে শীতের এ রোদটা বেশ আরামদায়ক। খানিকটা লোকালয় পেরিয়ে ফাঁকা মাঠ, সেটা পেরোলে আবার লোকালয় অর্থাৎ পরশুদের পাড়া। সমস্ত মাঠটা জুড়ে ধানের গোড়া, অসংখ্য পথের চিহ্ন এবং আরও ওপাশটায় নারকেল বন। ঘন সবুজ পাতারা মাথা দোলায়। পরশু তাকিয়ে দেখে এক ঝাঁক বনটিয়া গাছগুলোর মাথায় মাথায় উড়ে বেড়াচ্ছে। ডাকে টি টি।

পরশু মুগ্ধ হয়ে হয়ে। পাখী তার জীবনের বিস্ময়। অসীম শূন্যের একটা রহস্যময় বার্তা যেন ওর ডানায় ডানায় লেগে আছে। খানিকটা দাঁড়িয়ে বাড়ির দিকে ক্রমে চলতে থাকে সে।

বাঁশের ছোট গেটটা দিয়ে ঢুকবার অনেক আগে থেকেই পারুল পরশুকে লক্ষ্য করছিল। তাই আরও কাছে আসবার অপেক্ষায় সে দাওয়ায় দাঁড়িয়ে মাথাটা চুলকোতে থাকে। স্নান করেনি আজ, তাই উস্কোখুস্কো দেখাচ্ছিল পারুলকে। পরশু কাছে আসতেই বল্ল, "এত সকাল সকাল ছুটি হইল যে?"

"নতুন স্কুল'ত তাই। এ ক'দিন এমনি যাবে।"

পারুল বলে, "শোন, একটু শুনবা?"—বোঝা গেল তার কিছু একটা প্রয়োজন আছে, স্কুল ছুটি হওয়ার কথাটা নিছকই কিছু বলতে হবে তাই বলা, নইলে যে পারুল আজকের দিনে নিজের নামটাও ঠিক করে লিখতে পারেনা, তার আবার অহেতুক স্কুলের খোঁজখবর নেয়ার দরকার কি? পরশু একটু অবাক হয়। পারুলকে সে চেনে, পাশের ঘরটাই তাদের কিন্তু গভীর আলাপ পরিচয় হয়নি বলেই হঠাৎ এ দুপুরে ডাক দেয়ায় প্রথমটায় সে কিছুই বুঝে উঠতে পারলনা।

ঘরে ঢুকে পরশু চারধারটা ভাল করে দেখতে থাকে। উপরে টালি পুরন চাঁচের বেড়া আর অসমতল মাটির মেঝের চারধারটা স্যাঁত স্যাঁতে এবং অন্ধকার। এক কোনে কিছু নোংরা বিছানা এবং পাশেই একটা খাটিয়ায় পারুলের বাবা সূর্য শুয়েছিল। অনেক বয়স এবং শরীরটা অস্বাভাবিক

রকমের ভেঙ্গে যাওয়ায় বুড়ো জুল্ জুল্ করে তাকিয়ে থাকে। "কে আসছে পারু ?'

পারুল ভাঙ্গা একটা বাক্স খুলতে খুলতে আস্তে জবাব দেয়, "ঐ পাশের ঘরে …তুমি চিনবানা।"

"কেন ? না চিনবার কি আছে ? …নাম কি তোমার ?"

আস্তে জবাব আসে "পরশু রায়।"

সূর্য্য তারপর পরশুকে বাপ, ঠাকুর্দা থেকে চোদ্দগুষ্টির নাম ধাম, গোত্র, গ্রাম, জিলা জিজ্ঞেস করতে থাকে।

সূর্য্য চক্রবর্তী মানুষটিই এধরনের ! অন্যের সাথে বক বক শুরু করলে শেষ করতে চায়না। পাড়ার শেষে যে ক'ঘর গয়লা থাকে, তাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়ায়, টুকটাক গাছগাছড়ার বিদ্যা জাহির করে আর প্রধান ব্যবসা হল পুরুতগিরি।

পারুল একখানা পোষ্টকার্ড আর ভোঁতা সস্তাদরের কলম এনে বল্ল, "একটু চিঠি লিখবা। কাল থিকা তোমায় খুঁজছি।" পোষ্টকার্ডটা পাশে রেখেই একটু হেসে ফেলে পারুল, যেন লিখতে না পারার লজ্জাটা হাসি দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে। পরশু হাসিটা লক্ষ্য করেনা। তার মনে তখন অন্য চিন্তা। কয়েক বছর আগে বাবার ওখানে পরশু দেখেছিল ইট ভাটার কুলীদের চিঠি বাবাকে লিখে দিতে হয়। তাদের সে ব্যাপারটাও এতখানি পরশুকে আশ্চর্যান্বিত করেনি।

সে পোষ্টকার্ডটা ঠিকমত রেখে কলমটা খুলে বল্ল, "বলুন কাকে লিখতে হবে।"

পরুল উকুনে চুলগুলো চুলকোতে চুলকোতে ক্রমশ গম্ভীর হতে থাকে। কি লিখতে হবে মনের মধ্যে গুছোচ্ছে। শেষ এককালে বলে উঠল, "লেখ… ।"

চিঠিটা লিখতে হবে মায়ের কাছে। পাকিস্তানে সূর্যের বউ ভাইএর কাছে থাকে। এতদিন পারুলও মামার কাছে থাকত। সবে মাস তিনেক হয় এদেশে ফিরে এসেছে—এখনও কথার ভাঁজ ভাঙ্গেনি।

তাই মায়ের খোঁজখবর চেয়ে, দেশের অন্যান্য খবর জানিয়ে চিঠি লিখতে বলে এখানের কুশল জানিয়ে দিল। একটা পুরোন চিঠি থেকে ঠিকানা সংগ্রহ করে পারুল পরশুর পাশে রাখতেই, সে ঠিকানাটা লিখে দেয়। চিঠি-

খানা হাতে নিয়ে পারুল মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে লেখাগুলোর দিকে। তারপর কয়েকবার এপিঠ ওপিঠ করল।

হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকে বিমলাকে বল্ল, "পারুলদি লিখতে পারে না, মা!"

"কি?"

"ঐ সামনের ঘরের পারুলদি একদম পড়াশুনো জানে না।......আজ এতক্ষণ চিঠি লেখালে আমাকে দিয়ে।"

বিমলা জবাব না দিয়ে গম্ভীর হয়ে নিজের কাজে চলে যায়। খানিকটা দুশ্চিন্তা আর ক্রোধের চিহ্ন তার চোখে মুখে। একটু ক্ষুণ্ণ হয় পরশু, খানিকটা রাগও জন্মে মা'য়ের পর। এ কেমনধারা ব্যবহার? এমন একটা ঘটনা সে পারুলদের বাড়ি থেকে বেরিয়েই ঠিক করেছিল মা'কে গিয়ে প্রথম বলবে। মা তার এ ঘটনাটাকে কোন আমল না দেয়ায়, বিরক্তিতে সে বাইরে এসে খাঁচাটার সামনে দাঁড়াল। পাখীটা ঝিমোচ্ছিল, ওর আগমন অনুভব করে দুবার ডানা ঝাপটাল। পরশুর হাসি পায়। সে মগটা খুঁজে জল আনতে যেতেই, বিমলা বাইরে এসে কঠিন স্বরে বলে," খেয়ে যা।...আমি ঘুমোব।" পরশু খানিকটা ইতস্তত করে নীরবে খেতে বসল। হঠাৎ এককালে বিমলা চিন্তিত মুখে বল্ল "কা'কে চিঠি দিল পারুল?" পরশু খাওয়ার থালা থেকে মুখ তোলে।

"কা'কে চিঠি লিখে দিলি পারুলের হয়ে?"

"ওর মা'কে···পাকিস্তানে থাকে।"

বিমলা হঠাৎ যেন খানিকটা হাল্কা হয়ে যায়। রান্নার সামগ্রী ঝুড়ি দিয়ে এঁটো হাতটা ঘটির জলে দাওয়ায় দাঁড়িয়ে ধুয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলে, "অত মেলামেশা করবে না বাইরে···পড়াশুনোর চাপ বেড়েছে না?" পরশু জবাব দেয় না। খানিকটা অবাক হয়ে ভাবে। পারুলদিকে সামান্য একখানা চিঠি লিখে দেয়ার ব্যাপারে মা এত বিরক্ত কেন? কৌতুহল মাথা চাড়া দেয়।

৫

মাস দুয়েক পর। সোদপুর স্টেশনের লেভেল ক্রশিংটা পেরিয়েই পরশু লক্ষ্য করে স্কুল গেটের সামনে ছেলেদের ভীর। বইখাতা নিয়ে কেউ কেউ

মাছের দোকানগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে, রাস্তার পর জড়ো হয়েছে কতকগুলো, দুটো লম্বাপানা ছেলে গেটটা আগলে আছে। কি ব্যাপার? স্কুল হবে না? খানিকটা এগিয়ে সামনে আসতেই প্রশান্তর সাথে দেখা। বই হাতে চুপ করে সে এককোণে দাঁড়িয়েছিল।

"স্কুল হবে না রে?"—পরশু জিজ্ঞেস করতেই প্রশান্ত মাথা নেড়ে বলে," দেখ না, কি আশ্চর্য! ঢুকতে দিচ্ছে না?"

"ষ্ট্রাইক?...কিসের জন্য?"

"কে জানে?"—প্রশান্ত বিরক্তিতে কথাগুলো শেষ করে দেয়। পরশু এ জবাবে খুশী হয় না। কেন ষ্ট্রাইক, হঠাৎ এ অঘটন ঘটল কেন, জানবার জন্য সে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল।

"কেউ ঢোকেনি স্কুলে?"

"না, দিচ্ছে কোথায়? ফাঁক পেলে'ত আমি'ই ঢুকি।"

প্রশান্ত নিরীহের মত দাঁড়িয়ে থাকে। সে এবার ক্লাশে প্রথম হয়ে উঠেছে।

খানিকটা এখানে দাঁড়িয়ে, পরশু গেটের সামনে এগিয়ে যায়। যে ছেলে দুটো গেট আগলে ছিল, তাদের কাছে ধর্মঘটের কারণ জেনে নেয়। গতকাল কলকাতায় হিন্দী-বিরোধী এক ছাত্র মিছিলের পর পুলিশের নির্মম লাঠি চার্জ হয়েছে, কাঁদানে গ্যাস এবং শতাধিক ছাত্র গ্রেপ্তারের ফলে আজ সমস্ত বাংলা দেশ জুড়ে ছাত্র ধর্মঘট।

পরশুর মনে এক রোমাঞ্চিত আবেগের ছোঁয়াচ লাগে। ছাত্রটির বলার ভঙ্গি তার গায়ের লোমগুলোকে খাড়া করে দিচ্ছিল।

হরতাল বা ধর্মঘটের কোন অভিজ্ঞতা পূর্বে পরশু দিনগুলো কাটিয়েছে সেখানে। তাই মজায় মজায় সে দূরে একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

ইতিমধ্যে স্কুলের পশ্চিমদিক ধরে জনাপঞ্চাশেক ছাত্রের এক মিছিল আসতে দেখা গেল। সবাই একটু চঞ্চল হয়ে উঠল এখানে, তারপর হাঁ করে তাকিয়ে রইল ওদিকে। পরশু অবাক হয়ে বলে, "কোথাকার ছেলে সব?"

"সুখচর হাইস্কুলের।

ক্রমে মিছিল এখানে এসে জমতে লাগল। সবাই মিলে যাবে এলাকার অন্যান্য স্কুলে। কোথা থেকে সুশীল হাজির হয়ে বল্ল, "তুই যাবি না'কি

ওদের সাথে?" বিধান মাথা নাড়িয়ে বলে, "না, আমার যাওয়া হবে না। আজ মঙ্গলবার...রেশনের লাইন আছে আমার।" সুশীলও জানায় বাড়িতে তার জরুরি একটা কাজের দরকার, নইলে যাওয়ার তার খুব ইচ্ছে।

মানুষের জীবনে কৌতূহলের স্তরগুলো বুঝি এমনি ভাবে একের পর এক খুলে যায়। প্রতিটি ঢেউ এসে তীর ভাসিয়ে দেয়ার মত, বিচিত্র ঘটনার দোলায় হৃদয়ের অনুভূতিগুলোও দুলতে থাকে। কোথায় রামকৃষ্ণ মিশনের অচল, অনড় ছাত্র জীবন আর এ এক প্রকাণ্ড জগৎ! প্রতিদিনের সামাজিক ঘাত প্রতিঘাত, ক্রোধ, উল্লাস স্কুলের দরজায় দরজায় এসে ধাক্কা মারে। তাই পরশুর এতদিনের আবদ্ধ মনটা আবেগে একাকার হয়ে গেল। ঠিক এমনি ভাবে প্রথমদিন নিখিল বাবুর ক্লাশে সে প্রথম বিস্ময়ের ছোঁয়াচ পেয়েছিল। ব্যধিগ্রস্থ ছাত্রজীবনে প্রথম পেয়েছিল সে সুস্থ, সবলতার স্পর্শ। তাই নাটাগড়ে আসার পর থেকেই পরশুর জীবনের ভিত্তিমূলই যেন নড়ে উঠতে শুরু করেছে।

বিধান জিজ্ঞেস করল, "তুই বাড়ি যাবি এখন?"

পরশু বলে, "কেন?"

"তবে চ, একটু ষ্টেশনে ঘুরে বাড়ি চলে যাই!"

অন্য দিন হলে সে যেত কিনা সন্দেহ কিন্তু আজ রাজী হয়ে গেল। ও, বিধান আর সুশীল।

এ সময়ে প্ল্যাটফর্মে ঘোরার এক অপূর্ব অনুভূতি। ওরা দুজন সিগরেট টানছিল, পরশু ছিল তাই একটু ব্যবধানে। লজ্জা বা সংকোচের কোন বালাই নেই এ দু'জনের মধ্যে। কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে, পুরোদস্তুর অভিজ্ঞ মানুষের মত চলাফেরা করছিল, এ দু'জন। পরশুর মনে আপশোষ ও ভয় জন্মাল। এ যেন মাকে ফাঁকি দিয়ে ছাত্রজীবন থেকে অনেক দূর সরে এসেছে। যদি এই মুহূর্তে পরিচিত কেউ দেখে ফেলে আর রক্ষে নেই। হঠাৎ বিধানকে বলে, "তুই যাবি?...আমি চল্লাম।"

আর বিধান! কোন শুভক্ষণেই যে পরশুর সাথে এর পরিচয় হয়েছিল! তার দোষগুণমণ্ডিত চরিত্রটা আলোছায়ার মত অখণ্ড ভাবে ধরা দেয় বলেই পরশু ইচ্ছে করেও এর সাথে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে না। কেমন মোহাবিষ্ট হয়ে থাকে। নইলে ওর দোষগুণগুলো আলাদা ভাবে উপস্থিত হলে,

গোল্লায়ের পথে যাওয়া, নানা দোষে দুষ্ট বিধানকে সে কোন দিন বন্ধু হিসেবে নিতে পারত না।

সুশীলকে ছেড়ে দিয়ে এরা দু'জন বাড়ির পথ ধরে। একই এলাকার দুই প্রান্তে দু'জনের বাড়ি। বিধানদের বাড়িটা পাকা রাস্তা ছেঁড়ে একটু ভিতরে আর পরশুর বেশ খানিকটা ভিতরে থাকে।

পাড়ার মুখে আসতেই বিধান বলে, "চল, আমাদের বাড়ি হয়ে যাবি।"

"কোথায় ?

"এই'ত তোদের বাড়ির পথে যেতেই পড়বে।"

'ইটের দেয়াল, ওপরে করোগেটেড টিন। অর্দ্ধেকটা প্লাষ্টার করা, বাকিটায় শুরকি—গাঁধুনি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। বাড়িটা একেবারে রাস্তার পাশে। এই রাস্তাটা বাঁয়ে মোড় বেঁকে অন্য একটা রাস্তায় পড়েছে যেটা সেই বুঁদি গাছের তলা দিয়ে ঢুকেছে নাটাগড়ে অর্থাৎ পরশুদের পাড়ায়।

বারান্দার দড়িতে কয়েকটা ময়লা কাপড় ঝুলছিল, একটা চৌকি পাতা খানিকটা দূরে। একটা ছেড়া পাটি, কতকগুলো সিনেমা পত্রিকা ও সকালের জলখাবার খাওয়া শুকনো বাটি পড়েছিল চৌকিটার পর। আর ছিল হাজার খানেক মাছি। সমস্ত ঘর বাড়িতে একটা অপরিচ্ছন্নতার ছাপ।

বিধান পরশুকে চৌকিটার পর বসতে বলে, দ্রুত ঘুরে ঢুকে একটা ভাঙ্গা কেরোসিন কাঠের বাক্সর পর বইগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিল। মাথা নীচু করে শার্টটা খুলতে খুলতে বল্ল, "রুটি-ফুটি থাকলে কিছু দাও··· মঙ্গলবার আজ··· রেশনে এখনই ভীড় জমেছে।"

ওর মা শাড়ি পরছিল। ব্লাউজটা হাত দুটোর ভিতর দিয়ে গলিয়ে বুকের বোতামগুলো টিপ্ টিপ্ করে আটকাতে আটকাতে আস্তে দরজার পাল্লাটা ভেজিয়ে দেয়।

"একেবারে ঘরের তালু অবধি দেখা যায়। দরজাটাকে একটু আটকে রাখতে পারিস না ?' বিধান এর কোন জবাব দেয় না। আপন মনে ঘরের মধ্যে কি যেন সে করছিল। আশ্চর্য বোধ করে পরশু। বলতে গেলে সে খানিকটা আহত হয়। এ আবার কোন ধরণের সম্ভ্রম ! কি বেয়ারা ধরনের লজ্জাজ্ঞান ! প্রথমে এ চৌকিতে বসবার কালেই'ত কনক পরশুকে দেখতে পেয়েছিল ! কৈ সে'ত নিজে আড়ালে যায় নি ?

বিধান ঘর থেকে চীৎকার দিল, "কি, খেতে-টেতে দেবে কিনা ?···খু-ব'ত চল্লে সিনেমায়।"

কনক জবাব দিল না। ভাঙ্গা একখানা আয়না মুখের সামনে ধরে ভ্রু দু'টো কুঁচকে দেখল, কপালের সরু চুলগুলো যত্নে অবিন্যস্ত করল, চোখের কোলের পাউডারের গুড়ো ঘষে ঘষে মিলিয়ে দিয়ে পিছন ঘুরে এক ঝলক দেখে নিল—পাছে যদি শাড়িটা কুঁচকে থাকে !

বিধান একবার বাইরে এসে বল্ল, "বস্ খেয়েনি।" এ সময়ে বছর তিরিশের একটি ছোকরা মাথায় খানিকটা টাক, কিছুটা রুগ্ন—বাড়িতে ঢুকে সিঁড়ির পর দাঁড়িয়ে বল্ল, 'কি হ'ল বৌদি ?'···আরও দেরী করুন, তা'লেই টিকিট পাবেন।" কনক হেসে বলে," দেরী কোথায় ? খেয়ে দেয়ে'ত একটু মিশ্রামও করিনি।"

"তা'লে বলুন আমার দেরী হয়েছে।" চোখে সস্তা দরের একটা গগল্‌স্ ছিল ভদ্রলোকের। খুলে পকেটে রাখতে রাখতে ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে বলে, "কে ?···বিধান ?···এখনই ছুটি হল যে ?" কনক চটিটা পরতে পরতে বলে, "যেমন মাষ্টারগুলো হয়েছে, তেমন এরা। ছুটির গন্ধ পেলেই হল···বসে বসে পয়সা মারার যত ফন্দী।" ঘর থেকে বিধান বলে, "না কাকু, ছুটি না···ষ্ট্রাইক !"

ওরা দু'জন বেরিয়ে রাস্তায় উঠতেই বিধান ঘর থেকে চেঁচিয়ে উঠল, "কৈ. দিয়ে গেলে না কিছু ?"

কনক পিছন ফিরে চড়া গলায় বল্ল "ঐ'ত রয়েছে গামলায় ঢাকা।"

"ঐ দু খানা রুটি !···ও আমি খাব না।"

হাঁটতে হাঁটতে কনক বলে, "খেলে-খাও, না খেলে মর'গে।" বিধান ক্ষুব্ধ হয়ে গুন্ গুন্ করে উঠতেই পরশু জিজ্ঞেস করে, "ভদ্রলোক কে রে ?"

হঠাৎ শান্ত হয়ে হেসে জবাব দেয়, "ও ভজন কাকু, পাড়াতে থাকে। দেখিস নি ? স্কুলে যাওয়ার পথে কাঠের দোকানটা যে আছে না ?...ভজর কাকুর।"

শেষের হাসিটুকু পরশুর কাছে অনর্থক ঠেকল। বিধানকে কোনদিন সে শিশুর হাসি হেসে জবাব দিতে দেখেনি। তাই কিছু বুঝে উঠতে না পেরে বল্ল, "চলিরে আমি।"

"দাঁড়া আমি যাব।"

রেশনের থলি হাতে বিধান বেরিয়ে এল। (ক্রমশ)

গল্প

শিকার

বিধুভূষণ বসু

বাংলাদেশের প্রবীণতম সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বসুর পঞ্চনবতিতম জন্মবার্ষিকী কদিন আগে উদযাপিত হল। শতাব্দীর সমীপে উপনীত এই অগ্রজতম কথাসাহিত্যিক আজকের পাঠকের কাছে বিস্মৃত হলেও, এক সময় ইংরেজ সরকার এবং দেশীয় কায়েমী স্বার্থ তাঁর সাহিত্যের বস্তু-উপাদানে ভীত হয়ে রাজদণ্ড দেওয়া থেকে শুরু করে হত্যার প্রয়াস করা অবধি কিছুই বাকী রাখেনি। যে গল্পটি এখানে আমরা মুদ্রিত করছি, এটি প্রকাশিত হবার ফলে ১৯০৯ সালে বিধুভূষণকে রাজদ্রোহের অভিযোগে কারাদণ্ড বরণ করতে হয়। এটি ব্যতীত তাঁর 'সতীলক্ষ্মী' উপন্যাস, 'রক্তযজ্ঞ' এবং 'মীরকাসিম' নাটক এবং 'বঙ্গবাসীর সোনার স্বপন' গীতিনাট্য ঐ একই অভিযোগে বৃটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। 'ভোটরঙ্গ', 'দুই বিঘা জমি' প্রভৃতি নাটিকা লেখার ফলে কায়েমী স্বার্থের বাহক জমিদার শ্রেণীর অপ্রিয়ভাজন হন বিধুভূষণ, যার পরিণতিতে তাঁকে হত্যা করারও চেষ্টা হয় ঐসব মহল থেকে।

আইনঅমান্য আন্দোলনের অংশ হিসেবে "কাজের কথা" গ্রন্থখানা প্রকাশ করেও বিধুভূষণ পরবর্তী জীবনে আবার কারাদণ্ডেও জরিমানায় দণ্ডিত হন। দেশ-বিভাগের পর থেকেই তিনি কলকাতাবাসী।

ভূদেব জমিদারের ছেলে, তিন ভাইয়ের কনিষ্ঠ। পিতা নাই, মাতা আছেন। মাতা ভ্রাতারা তাঁহাকে বড় স্নেহ করেন। বউদিদিরাও খুব ভালবাসেন। ভূদেবের যখন ২০ বৎসর বয়স, তখনও তাঁহার কলেজের পড়া শেষ হয় নাই, তখন ভ্রাতারা তাঁহার বিবাহের উদ্যোগ করিলেন। ভূদেব তাহা শুনিয়া বিবাহে নিতান্ত অসম্মতি জানাইলেন, কারণ কি, তাহা কাহাকেও বলিলেন না, আরও কিছু পড়াশুনা করিয়া বিবাহ করিবেন বলিয়া ভ্রাতা ও মাতাকে নিরস্ত করিলেন। এইরূপে আরও পাঁচ বৎসর কাটিল। ভূদেবের কলেজের নিয়মিত অধ্যয়ন শেষ হইল। তখনও তিনি বিবাহ করিতে অসম্মত। বরং সেই অসম্মতি দিন দিন বাড়িয়াই চলিতে লাগিল। ইহার খাঁটি হেতু কেহই জানিতে পারিলেন না, কিন্তু আমরা জানি। ভূদেব দেখিলেন একে একে তিনটি বউদিদি যেমন তাঁহাদের

সংসারে প্রবেশ করিলেন, তেমনি তাঁহাদের শান্তির সংসারে দিন দিন অশান্তি দেখা দিতে লাগিল! সংসারের সুখ সুবিধাটুকুর ভাগবাঁটরা লইয়া একটা অবিশ্রান্ত সতর্ক চেষ্টায় বউদিদিদের সুন্দর মুখ সর্ব্বদাই রুক্ষ থাকিত, ক্রমে তাহা ভ্রাতাদিগের মুখেও যেন তিল তিল করিয়া সংক্রামিত হইতেছে। তাঁহারা জমিদার, কিন্তু গ্রাম্য বড় মানুষ। সে জমিদার গৃহে প্রজারা সর্ব্বদা যাতায়াত করিত। বিশ পঁচিশটা গোলাভরা ধান থাকিত, প্রজারা তাহা খাইয়া নিঃশেষ করিত। ভূদেব মাতা ও পিতামহীকে স্বহস্তে প্রজাদিগকে অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করিতে দেখিয়াছেন। আজ দুই বৎসর মাতা কাশীবাসিনী হইয়াছেন, এখন আর প্রজারা ভাত পায় না। চাকরবাকরেরা দলে দলে দরিদ্র প্রজাদিগের আহার যোগাইবার পরিশ্রম করিতে আর রাজী নয়। প্রজারা দুই-চারিদিন রান্নাবাড়ীর দাওয়ায় বসিয়া খালি পেটে ফিরিয়া গিয়াছে, আর এখন খাইতে আসে না। দরবারে আসিতে হইলে চিড়াগুড় বাঁধিয়া আনে। বউদিদিরা এখন নীচে নামেন না, প্রজাদিগকেও চিনেনই না। বিশেষ অন্তরঙ্গ আত্মীয় আসিলেও তত্ত্ব লওয়া আবশ্যক বোধ করেন না। এ সবের চেয়ে ভ্রাতাদিগের মধ্যে যে একটা অপ্রীতিভাব বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাতেই ভূদেববাবু নিতান্ত ক্ষুণ্ণ। বিবাহ করিলে, তাঁহাকেও বিসম্বাদের ভাগ লইতে হইবে, ইহা নিশ্চিত জানিয়া ভূদেববাবু বিবাহ করিতে রাজী নন। তাঁহার এখন মাতার সঙ্গে কাশীবাসী হইয়া জননীর বুকে শিশুটির মত থাকিতেই একান্ত ইচ্ছা। ভূদেববাবু মাতার কাছেই অনেক সময়ে থাকেন, মাতা যখন বিবাহ করিবার জন্য নিতান্ত পীড়াপীড়ি আরম্ভ করেন, তখন মাঝে মাঝে দেশে আইসেন। গৃহে থাকা তাঁহার দয়া। বউদিদিরা তাঁহার অনুচিত কুমারব্রত গ্রহণের জন্য সর্ব্বদাই তাঁহাকে বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে উৎপীড়িত করিতেন। সুতরাং তিনি এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। ব্যবসায়ের মধ্যে শিকার বড় ভালবাসিতেন, মাঝে মাঝে গ্রাম্য মাঠে জঙ্গলে শিকার করিতে যাইতেন।

এখন আবার ভ্রাতাদিগের বিসম্বাদ ব্যাপার মাঝে মাঝে ভূদেবের কানে উঠিতে লাগিল। ভ্রাতারা একে অন্যের অসাক্ষাতে বৈষয়িক স্বার্থপরতার কথা ভূদেবের কানে তুলিতে লাগিলেন। ভূদেব যখন এত বয়সেও বিবাহ করিলেন না, তখন তিনি যে বিষয়কর্ম্ম ছাড়িয়া সন্ন্যাস

ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন এমন একটি ধারণা দাদারা ও বউদিদিরা বুঝিয়া লইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার জমিদারীর অংশ নিশ্চয়ই কোন এক ভ্রাতুষ্পুত্রকে দান করিবেন এ কল্পনা করা নিতান্ত অসঙ্গত নয়। এই লুব্ধ আশ্বাসের বশবর্ত্তিনী হইয়া বউদিদিরা স্ব স্ব পুত্রদিগকে ছোট কাকাবাবুর যথেষ্ট অনুগত ও প্রিয় করিতে সাধ্যমত ত্রুটি করিতেন না। ভূদেব তাহা বুঝিতেন, আর মনে মনে হাসিতেন, কিন্তু কোনরূপ মনোভাব ব্যক্ত করিতেন না। ঘর ছাড়িয়া প্রায়ই বাহিরে বাহিরে থাকিতেন।

একবার জ্যৈষ্ঠমাসের শেষে গাঙ্গে জোয়ারের জল বড় বাড়িয়া উঠিয়াছে। ভূদেব তাঁহার ছোট বজরাখানি সাজাইয়া পল্লীবাহিনী একটি ছোট নদী বাহিয়া যাইতেছেন—উদ্দেশ্য দেশভ্রমণ ও শিকার। জল কূলে কূলে ভরা,—অপরাহ্নের রবিরশ্মি নদীতরঙ্গের গায়ে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া জ্বলিতেছে। দুই পার্শ্বে আম, কাঁঠাল, জাম, বট, পাকুড় প্রভৃতি কতরকমের বৃক্ষরাজি গায়ে গায়ে মিলিয়া ছায়াপাতে নদীবক্ষ স্থানে স্থানে আঁধার করিয়া বসিয়াছে। ঘাটে ঘাটে পল্লীরমণীরা কলসী ভরিয়া জল তুলিতেছে, কেহ কাপড় কাচিতেছে, কেহ একগলা জলে দাঁড়াইয়া অপরার সঙ্গে আলাপ করিতেছে। সকলেই ভূদেববাবুর বজরাখানা কৌতূহলের সঙ্গে দেখিতেছে। বালকেরা সচ্ছিদ্র বংশখণ্ড বড় বড় গাছের আগায় বাঁধিয়া রাখিয়াছে,—বায়ু প্রবাহ সে ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকিয়া 'পবনবাঁশী' বাজিতেছে। জ্যৈষ্ঠের অপরাহ্নে বজরার ছাদের উপর বসিয়া ভূদেববাবু যেন কত পুলকে বিভোর রহিয়াছেন। যাইতে যাইতে দেখিলেন, একটি ঘরের উপর একদল পায়রা উড়িয়া পড়িয়া খাদ্য অন্বেষণ করিতেছে, ভূদেব শিকারপ্রিয়—তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে বন্দুকটি তুলিয়া লক্ষ্য করিলেন। একটি পায়রা হত হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে নদীতীরে লুটিয়া পড়িল। ঠিক সেই সময়ে একটি ১০। ১১ বৎসরের বালিকা কলসী কক্ষে ঘাটে জল লইতে আসিতেছিল। হত পায়রাটি তাহারই পায়ের কাছে লুটিয়া পড়িল। দেখিবামাত্র বালিকা চমকিয়া উঠিল। তাহার চঞ্চল গতি পলকের মধ্যে রুদ্ধ হইল। বালিকা কলসী রাখিয়া পায়রাটি ধরিয়া তুলিল। তাহার চোখে জল আসিল। বালিকা মুখ ভার করিয়া বলিল, "আহা, কে এমন কাজ করেছে। এমন লক্ষীর পায়রাটি এমন করে মাল্লে। ধর্ম্ম কি তাঁর ভাল করিবেন।" কথাগুলি ভূদেববাবুর

কানে পৌঁছিল। বালিকার সুন্দর মুখে শোককালিমাটুকু তাঁহার নয়নে বিদ্ধ হইল। তাঁহার অন্তরে জাগিল—

মা নিষাদপ্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃসমা।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥

ভূদেব সেই স্থানে নৌকা লাগাইতে বলিলেন। যতক্ষণ নৌকা কূলে লাগিল, ততক্ষণ বালিকা কলসী পুরিয়া, যেন ভয়ে ভয়ে ভূদেবের বজরার পানে চাইতে চাইতে দ্রুতপদে চলিয়া গেল। ভূদেবের যেন ইচ্ছা হইতেছিল, এ অপরাধের জন্য ঐ বালিকার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেন; কিন্তু কেমন একটা লজ্জাসঙ্কোচ আসিয়া তাহাতে বিলম্ব ঘটাইয়া দিল, ততক্ষণ বালিকা সেস্থান হইতে চলিয়া গেল। তথাপি ভূদেববাবু সেই স্থানেই নৌকা বাঁধিয়া রহিলেন। সে বালিকা কলসী লইয়া আবার আসিল। একবার ও দুইবার তিনবার বালিকা জলভার কক্ষে লইয়া চলিয়া গেল। ঘর্ম্মে ও জলে বালিকার পরিহিত শাড়ীখানি সম্পূর্ণ ভিজিয়া গিয়াছে। তথাপি সে চতুর্থবার কলসী কক্ষে ঘাটে আসিল। তখন ভূদেববাবু নৌকা ছাড়িয়া কূলে বিচরণ করিতেছিলেন। সন্ধ্যা হয় হয়, আকাশে বড় মেঘ উঠিয়াছে। নদী ছোট, ভয়ের কোন কারণ নাই। তথাপি ভূদেব আকাশের দিকে চাহিয়া চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময় সেই বালিকা ঘাটে আসিয়া দুই একবার বাবুর মুখপানে চাহিয়া বলিল, "আপনি বুঝি পায়রাটিকে গুলি করেছেন?"

নিতান্ত অপরাধীর মত ভূদেব বলিলেন, "হ্যাঁ, বড় অন্যায় করেছি।"

বালিকা আর কিছু না বলিয়া জলে নামিয়া কলসী পুরিয়া উপরে উঠিল। যাইবার বেলা বলিল, "বড় মেঘ করেছে, আপনি কি নৌকায় থাকিবেন?"

ভূদেববাবু বলিলেন "নৌকায় ভিন্ন আর কোথায় থাকিব?"

বালিকা। "কেন, গ্রামে গিয়ে অতিথি হন না কেন?"

ভূদেব। "এ গ্রামে আমি কাহাকেও ত চিনি না।"

বালিকা এবার হাসিয়া ফেলিল "অতিথির আবার চেনা কি? আপনি আমাদের বাড়ী অতিথি হবেন?"

ভূদেব মনে মনে যেন এতটুকু হইয়া গেলেন। এতবড় শিক্ষিত পুরুষ, এই বালিকার কথার উত্তর দিতে তাঁহার ভাষা যোগাইল না—তাঁহাকে

নিরুত্তর দেখিয়া বালিকা বলিল, "এই ত আমাদের বাড়ী কাছেই, আমার সঙ্গে আসুন।"

ভূদেব কথা।০ মাত্র না বলিয়া বালিকার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। অদূরেই কয়েকখানা চালাঘর সমন্বিত একটি লোকালয় দৃষ্টিগোচর হইল। বালিকা বলিল, "এই আমাদের বাড়ী, আপনি মণ্ডপ ঘরে বসুন। আমি বাড়ীর ভিতর কলসী রেখে আসি।" এই বলিয়া বালিকা তাহার জননীকে ডাকিয়া বলিল, "মা! মা! আমাদের বাড়ীতে একজন অতিথি এসেছেন।"

তৎক্ষণাৎ দুইটি ব্রাহ্মণ বালক আসিয়া ভূদেববাবুর তত্ত্ব লইতে লাগিল। ভূদেব পরিচয় জানিলেন, এই বাড়ীটি একজন অধ্যাপক ব্রাহ্মণের, কন্যাটি তাঁহারই। বালক দুইটি তাঁহার টোলের ছাত্র। এই কন্যাটি ছাড়া তাঁহার আরও দুইটি শিশু পুত্র সন্তান আছে। কন্যাটি জ্যেষ্ঠা, নাম গৌরী।

একটু বাদে ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল। গৃহস্বামী ব্রাহ্মণ অন্যান্য ছাত্রগণ সহ একপাল গাভীবৎস তাড়াইয়া লইয়া বাড়ীতে আসিলেন। গাভী ও বৎসগুলি একে একে বাড়ীর প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল, গৌরী ও তাহার মাতা এক গামলা ভাতের মাড়, এক ঝুড়ি আম কাঁঠালের খোসা আনিয়া তাহাদিগকে খাইতে দিল।

প্রৌঢ়বয়স্ক ব্রাহ্মণ আসিয়া ভূদেববাবুর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ভূদেববাবু নমস্কার করিয়া নামধাম বলিলেন। যখন পিতার নাম বলিলেন— তখন ব্রাহ্মণ তাঁহার সর্ব্ববিধ পরিচয় বুঝিয়া লইলেন এবং ভূদেব বড় জমিদারের সন্তান, দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হইয়াছেন বলিয়া নিতান্ত বিনয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

ইহার পর আহ্নিকের আয়োজন, জলযোগ, আহারাদি সমাদরে যথারীতি সম্পন্ন হইল। ভূদেব এই দরিদ্র পরিবারের শৃঙ্খলা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। ষোলজন ছাত্র এগৃহে নিত্য প্রতিপাল্য, গৃহিণী একাকিনী, দাসদাসী একজনও নাই। দুইটি শিশুসন্তান, অথচ সেবা সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি-স্বরূপিনী ব্রাহ্মণ-পত্নী অনায়াসে শৃঙ্খলার সহিত সর্ব্বকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। তাঁহার অকৃত্রিম মাতৃভাবে এই ষোলটি ব্রাহ্মণকুমার যেন আপন সন্তানের ন্যায় স্নেহমুগ্ধ! ভূদেব-চন্দ্রের সম্পদ বিতৃষ্ণা যেন আরও প্রবল হইল। আর দেখিলেন ঐ বালিকা গৌরী সর্ব্বকর্ম্মে মাতার অনুবর্ত্তিনী, সর্বদা সুশীতল শুশ্রূষারূপে সেই দরিদ্রের গৃহটি সদা স্নিগ্ধ রাখিয়াছে। ভূদেবচন্দ্রের প্রাণে এসব যেন বড় ভাল লাগিল।

তখন গৌরী তাঁহার শয্যা রচনা করিতে আসিয়া বলিল, "আপনি আর কখনও এমন পায়রা গুলি করিবেন না।"

"না, আর কখনও এমন কুকর্ম্ম করিব না, শিকারের ছল করিয়া আর কখনও অহিংস্র প্রাণী বধ করিব না, তোমার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, গৌরী, আমায় তুমি কি ক্ষমা করিতে পারিবে না?" বলিয়া ভূদেব বালিকার ছোট হাতখানি ধরিলেন। কিন্তু এই একদিনের ক্ষুদ্র ঘটনাটি উপলক্ষ করিয়া বিধাতা তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দিলেন। চিন্তার অনেক ঘাতপ্রতিঘাতের পরে ভূদেবের মনে নিশ্চিত প্রতীতি হইল, বুঝি গৌরীকে গৃহলক্ষ্মী করিয়া সংসারধর্ম্ম গ্রহণ করিলে সংসার অনন্ত শান্তির হেতু হইবে।

এতকাল পরে ভূদেবের বিশৃঙ্খল জীবনে একটি কর্ম্মে শৃঙ্খলা দেখা দিল। মাসান্তে একবার গৌরীর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ ভূদেবের নিয়মিত কর্ম্ম হইয়া পড়িল। আর বিদায়ের কালে গৌরী যখন বলিত, "আবার কবে আসিবেন?" তখন ভূদেব যে দিন নির্দ্ধারিত করিয়া দিতেন, তাহার একটিতেও ব্যতিক্রম ঘটিত না। যাহা হউক, দুই বৎসরকাল এমনি গত হইলে ভূদেবচন্দ্র আর আত্মাকে বশে রাখিতে পারিলেন না, গৌরীর পাণিগ্রহণ প্রার্থনা তাঁহার পিতার কাছে বিজ্ঞাপন করিলেন। এতবড় জমিদারপুত্রকে কন্যাদান করা পরম সৌভাগ্যের বিষয়, সুতরাং গৌরীর পিতা প্রার্থনামাত্র গৌরীকে ভূদেবের কাছে সম্প্রদান করিয়া গৌরবান্বিত হইলেন।

গৌরী পিতার পর্ণকুটীর হইতে স্বামীর অট্টালিকায় আসিল। তখন ভ্রাতাদিগের বিসম্বাদ বহ্নি প্রবলভাবে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সকলেই পৃথক হইবার জন্য ব্যস্ত। এতদিন ভূদেব সম্মতি দেন নাই, তাই হয় নাই। এখন ভূদেব ভ্রাতাদিগের প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। বৈষয়িক বিসম্বাদের জন্য নয়,—বালিকা গৌরীর স্বভাব সরল মাধুর্য আর সেবাব্রতটি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য। ভ্রাতৃবধূদিগের বিলাস সম্ভোগ যাহাতে গৌরীর অভ্যস্ত না হয়, ভূদেব সর্ব্ব প্রযত্নে তাহার চেষ্টা করিলেন।

বালিকা গৌরী গৃহিণী হইল। আপন হাতে রাঁধে, আপন হাতে স্বামীকে খাওয়ায়, অতিথি অভ্যাগতদিগকে খাওয়ায়, প্রজাগণকে খাওয়ায়। সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুবর্ত্তিনী থাকিয়া সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহার মনোরঞ্জন করে। কিন্তু মাঝে মাঝে কি জানি কি কারণে গৌরীর মুখচ্ছবি মলিন হইয়া উঠে। মাঝে মাঝে হাসিতে হাসিতে বালিকা গৌরী চমকাইয়া স্থির হইয়া পড়ে।

ভূদেব ভাবিলেন পিতামাতা ও পিতৃগৃহ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়াতেই বালিকা গৌরী এমন বিষণ্ণ হইয়া উঠে। সে জন্য তিনি প্রায়ই গৌরীকে তাহার পিতামাতার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিতেন। তথাপি গৌরীর সে ভাব দূরীভূত হইল না।

একদিন ভূদেবের গৃহে অনেক অতিথির সমাগম হইয়াছিল। তাহারা ভূদেবের দরিদ্র প্রজা, অজন্মার জন্য খাজনা মাপ লইবার দরবার করিতে আসিয়া ছিল। তাহারা দুর্ভিক্ষ-পীড়িত, অনশনে জীর্ণ শীর্ণ। ভূদেব তাহা-দিগকে দেখিবামাত্র সে বৎসরের কর হইতে রেহাই দিলেন। আর গৌরী তাহাদিগকে ভাল করিয়া খাওয়াইয়া দিবার ইচ্ছা করিলেন। এতগুলি লোকের আহারাদি প্রস্তুত করিতে গৌরীদেবীর সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে হইল। সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর তিনি রাত্রিতে স্বামীর পদসেবা করিতে বসিলেন। আজ যেন তাঁহার বড় আনন্দ, তাঁহার সরল মুখপত্রখানি যেন উল্লাসে ফুটিয়া উঠিয়াছে,—তিনি অন্নহীনকে অন্ন দিয়াছেন। সে আনন্দ দেখিয়া ভূদেব মুগ্ধ হইলেন। মুগ্ধ নেত্রে প্রিয়তমার মুখপানে অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন। ভূদেবের এই দৃষ্টি সুখ-তৃপ্ত হইতে না হইতেই গৌরীর মুখমণ্ডল তেমনি সহসা বিষাদ কালিমাগ্রস্ত হইল। ব্যথিত হইয়া ভূদেব আজ প্রিয়তমার কর ধারণ করিয়া বলিলেন যে গৌরি! তোমার এমন সুন্দর মুখখানি মাঝে মাঝে কেন মলিন হয়, তা আমি অনেকবার জিজ্ঞাসা করেও সদুত্তর পেলেম না। বল না গৌরি! মাঝে মাঝে এমন ভাবে তোমার মনে কি ব্যথা লাগে?

গৌরী আজ কাতরা হইলেন। বলিলেন, "সে কথা বল্লে তুমি আমার উপর রাগ করবে।"

ভূদেব। "না গৌরি, তোমার উপর রাগ করব না, বরং না বল্লে তোমার উপর আমার গুরুতর সন্দেহ জন্মাবে।"

গৌরী। "তবে শোন, সেই যেদিন তোমার সঙ্গে নদী ঘাটে দেখা হয়, সেই দিন তুমি একটি পায়রা বধ করেছিলে। আমি তাতে বড় দুঃখ পেয়ে বলেছিলাম ধর্ম তোমার ভাল করবে না। সেই কথাটি আমি এখনও ভুলিতে পারি নাই। তাই মনে হইলে আমার প্রাণ কেঁপে উঠে।"

ভূদেব শুইয়াছিলেন, উঠিয়া বসিলেন এবং আবেগময় কণ্ঠে বলিলেন, "কি, আমার সেই অপরাধ তুমি এখনও ক্ষমা করিতে পার নাই; তবে কেন আমাকে বিবাহ করিয়াছিলে?"

গৌরী স্বামীর পাদুখানি জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, “আমার কাছে তোমার আবার অপরাধ কি? কিন্তু সেই যে আমি বলিয়াছিলাম ধর্ম্ম তোমার ভাল করবে না। আমার সর্ব্বদাই মনে হয় যদি আমার সেই অভিশাপ ফলে, তোমার কোন অমঙ্গল হয়, এ ভাবনায় আমার প্রাণ কেঁপে উঠে।' আমি অনেক চেষ্টা করেও এ কথাটি ভুলতে পারি নি।”

শুনিয়া ভূদেব স্তম্ভিত হইলেন। অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া ভাবিলেন, “আচ্ছা কোনও প্রায়শ্চিত্ত করিলে কি আমার এ পাপ যাইবে না?”

গৌরী। “আচ্ছা তাই কর। কোন তীর্থস্থানে গিয়া একটা পায়রার ওজনের স্বর্ণ দীন দুঃখীকে দান কর।”

ভূদেব। “তাই করব গৌরি। তোমার মনস্তুষ্টি, তোমার ভালবাসা লাভের জন্য আমি তাই করব। তুমিও সঙ্গে যাবে।”

শুনিয়া গৌরী যেন বড় সুখী হইলেন।

পত্নীকে সঙ্গে লইয়া ভূদেব কাশী যাত্রা করিলেন। দুই দিন নৌকা যোগে কলিকাতায় গিয়া গাড়ী চড়িতে হইবে। পথিমধ্যে এক স্থানে নৌকা বাঁধিয়া অপরাহ্ণ সময়ে ভূদেব গৌরীকে সঙ্গে লইয়া একটি নির্জ্জন নদীতীরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সহসা পার্শ্ববর্ত্তী বনান্তরাল হইতে একটি বন্দুকের আওয়াজ শুনিতে পাইলেন। পর মুহূর্ত্তেই শোনা গেল যেন কোন শিশু চিৎকার করিয়া উঠিল, “মাগো যাই গো।”

পতি পত্নী সেই দিকে ছুটিলেন। ব্যস্ততা বশতঃ ভূদেব গৌরীকে রাখিয়া যাইতে ভুলিয়া গেলেন।

একটু পরে আবার রোদন ধ্বনি শোনা গেল, “হায়! হায়! কে আমার সর্ব্বনাশ কল্লে গো!”

ব্যস্তভাবে অন্বেষণ করিতে গিয়া ভূদেব ও গৌরী দেখিতে পাইলেন, মৃত শিশুপুত্র বক্ষে জড়াইয়া, এক অনাথিনী চিৎকার করিয়া কাঁদিতেছে। পার্শ্বে এক বন্দুকধারী সাহেব হাতে একটি নোট লইয়া বলিতেছে, “বুড়ি, না দেখিয়া যাহা হইয়াছে, তাহাতে দুঃখ করিয়া কি করিবে। এই লও তোমার পুত্রের মূল্য স্বরূপ তোমাকে আমি এই ১০০ টাকার নোট দিতেছি।” ভূদেব ও গৌরীকে দেখিবামাত্র সাহেব দ্রুতবেগে পলাইয়া গেল। তখন ভূদেব বিশেষ তত্ত্ব জানিতে পারিলেন। এই অনাথিনী শিশু পুত্রটি লইয়া মাঠে মেষ চরাইতেছিল, সাহেব শিকারে আসিয়াছিল, তাহার লক্ষিত গুলি শিশুর বক্ষে

লাগিয়া মৃত্যু ঘটাইয়াছে। সাহেব টাকা দেখাইয়া অভাগিনী জননীকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছিল।

দেখিয়া শুনিয়া গৌরী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। ভূদেব মহা বিপদ গণিলেন। একদিকে মৃত পুত্র কোলে শোকাতুরা জননী আত্মঘাতিনী হইতে যাইতেছে, অন্যদিকে প্রিয়তমা পত্নী মূর্চ্ছিতা। ভূদেব কোনদিক রক্ষা করিবেন? মুক্ত বাতাসের উপর গৌরীর শুশ্রূষার ভার দিয়া ভূদের অনাথিনীর শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন।

বহুক্ষণ পরে গৌরী যখন চৈতন্যলাভ করিলেন, তখন বলিলেন,—"একি কাণ্ড?"

উত্তেজিত কণ্ঠে ভূদেব বলিলেন,—"এ কাণ্ড অভিনব নয়। এইরূপই অহরহ ঘটিতেছে। বিদেশীর হাতে হতভাগ্য দেশীয় দরিদ্রের প্রাণ এমনিভাবে শৃগাল কুকুরের ন্যায় হত হইতেছে। সাহেবদিগের নির্ম্মম স্বেচ্ছাচারিতায় এমনি ভাবে শত শত অনাথিনী পুত্রহীন হইতেছে। আর নূতন কি? আমি একটি পায়রা বধ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে যাইতেছি, এরা শত শত নরহত্যা করিয়াও পাপ মনে করে না।"

· উত্তেজিত কণ্ঠে গৌরী বলিলেন, "এর কি কোন প্রতিকার নাই?"

ভূদেব। "প্রতিকার আর কি আছে? আমরা পরাধীন, ঐ শ্বেতাঙ্গদিগের অনুগ্রহ ভাজন, তাহাদের কাছে আমরা শৃগাল কুকুরের ন্যায় পরিগণিত। আমাদের আর প্রতিকার করিবার কি শক্তি আছে?"

এ কথা শুনিয়া পুত্রশোকাতুরা জননী রোদনের স্বর রূপান্তরিত করিয়া কহিলেন, "কি বল্লে তুমি, তোমার হাতে বন্দুক দেখিতেছি, গায়েও বল আছে বলিয়া বোধ হয়। এই দেখ তোমার ভাই-এর বুকে গুলি মারিয়াছে, তুমি প্রতিকার করিতে পারিবে না?"

সেই বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া গৌরী বলিলেন, "যথার্থ কথা, বন্দুক ধরিয়া নিরীহ পায়রা বধ করিতে পার আর ভ্রাতৃঘাতী অত্যাচারীর প্রতিশোধ লইতে পারিবে না? তবে ও সব কেন? চল দেশে ফিরিয়া যাই, কাশীতে গিয়া স্বর্ণদান করিয়া প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক নাই। আমার মনের গ্লানি গিয়াছে। এর চেয়ে উৎকৃষ্টতর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। এইসব রাক্ষসের অত্যাচার হইতে মাতা ভগিনীদিগের জীবন রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।"

ভূদেব কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। তারপর দৃঢ় স্বরে কহিলেন, "তাই ঠিক। আমি আজ এই পুত্রশোকাতুরা জননীর সম্মুখে, আর প্রিয়তমা পত্নীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম। আমি সর্ব্বস্ব দেশের এই অত্যাচার নিবারণের জন্য উৎসর্গ করিলাম।*"

* চৈতন্য লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত 'মাসিক পল্লীচিত্রের' ২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা (আষাঢ়) ১৩১৬ সাল হইতে সংগৃহীত।

অনুক্ষণ স্বদেশযাত্রায়

মুকুল গুহ

পার হওয়া কঠিন সাঁকো দোলে
কারেও দোষি না
অনুক্ষণ তার জন্য বসে থাকি
দর্পনে যার মুখ ভেসে ওঠে
তাকে আমি চিনে নিতে চাই
তাকে আমি ফিরিয়ে দেবোনা।

মাঠ আর মানুষের মধ্যে কোলাহল
খেয়া পারাপার হয়ে ছড়ায় কুটিরে গ্রামে
অলস সংবাদ
জলে হাত স্পর্শ দিলে তোমার দেহের ঘ্রাণ
অম্লানমধুর
বয়সে তোমার কি আসে যায়
তবু তুমি বর্ষিয়সী মহিলার মতন গোপন
বিরহবিধুর অসহায়।

মা মণি তোমার জন্য রেখেছি বুকের মধ্যে ঘর
গৃহ নাই উচ্চখণ্ড প্রবাহে,
পার হওয়া কঠিন সাঁকো দোলে
কারেও দোষি না

ও কার চোখের মধ্যে বাংলা নতুন করে জাগে
ও কোন গৌরীর হাত বাংলার কিশোর ছুঁয়ে আছে,
থাক্ ওরা কিছুক্ষণ থাক্ অতঃপর,
রণক্ষেত্রে দেখা হবে, দেখা হবে
তাই নদী মাটি অপ্রবাসী,
তাই তাকে ফিরিয়ে দেবোনা।

বুঝলে বন্ধু

মানব মিত্র

এ-হল তোমার ঝড়ের পুর্বাভাস।

ঘুমিয়ে পড়েছে যেহেতু ছায়ার কোলে
মেঘের বালিশে দুপুরবেলার রোদ,
যে হেতু ভীরুর বিচ্ছিন্নতা বোধ
দলছাড়া হয়ে নামছে নীড়ের দিকে
যেহেতু মাঝিরা গুটিয়ে নিচ্ছে পাল
অথচ এগিয়ে যাচ্ছে ঘাটের দিকে,
মৎসশিকারী ডাঙায় ফিরবে বলে
জল থেকে টেনে তুলছে যেহেতু জাল—
সন্দেহ নেই, ঝড়ের পুর্বাভাস।

শরীরের ঘাম ঝরছে অনবরত,
এই যে এখন মৃতের চোখের মত
পাতা নড়ছে না—আমাদের বিশ্বাস
বড় রকমের ঝড়ের পুর্বাভাস।

সকালের পদাবলী

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

রিক্ত ঘরের চালা থেকে
কত রাতে দেখেছি আমি আকাশের নীল,
সেই নীল কাল নাকি অন্ধকারে
মরে গেছে বলেছে অনিল ;

সেদিনও সকালে কারা যেন চলে গেছে
দুপায় জড়ানো রাতের তুহিন
স্মিত বুকে রোদ্দুরের উজ্জ্বলতা নিয়ে
হাতে নিয়ে পাখিদের খেলা
দেওয়ালের লিখনে পড়ি 'তারা মৃত্যুহীন'।

অথচ সামনেই ঝড়
তুমি কোন মুখে হৃদয় বিলাও
চেতনার উচ্চস্বরে দৃশ্যান্তরে
গাঁথা আছে দিন, দুহাতে
সৃষ্টির রক্ত লাল পতাকা ওড়াও,

তথাপি ফসলের সোনা ক্ষেতে জীবনের গান
অদ্যাবধি বেঁচে আছে পেয়েছি প্রমাণ।

দরজা

শ্যাম রায়

যাকে খোঁজ করতে যাই প্রাসাদ বিস্তারে, অথবা
সিঁড়ি পেরিয়ে যাকে চাই সে নেই।
সময়টা খান খান হয়ে ভেঙে যায়
মুহূর্ত ঝাপটে ধরি, পলায়নপর্ব তার,
খুঁজে ফেরার সময় পুরোনো সুরের তারে
চেনাচেনা রাগ গুমরে ওঠে
হারিয়ে যায় আশেপাশে যা খুঁজি।
তা হলে শূন্য মূলে বসে থাকা যায় না
কৃতঘ্ন সময়ের অপেক্ষায়—যাকে ফেরানো যায় না।
কতটুকু বুঝতে পারি ? কতটুকু বলতে পারি ?
বুকের সংসক্ত নিবেদন—কতটুকু সাজাতে পারি ?
যাকে চাই সে ফস্কে যায়, যাকে খুঁজি সে পালায়।
তবু দরজা খোলো, দরজা খোলো,
এ যুগটা বসে থাকতে পারছে না
ভীষণ ছট্‌ফট্ ছট্‌ফট্ করছে।

দরজা খোলো—শস্যের, কুসুমের বিস্তীর্ণ শীতল দরজা।

সূর্য নেমে আসা মাঠে

অমিতা মিত্র

এখন সূর্য নেমে আসা মাঠে
কুয়াশা নিড়ানো এই স্বচ্ছ মাটিতে
ছাখো, হেমন্তের পরিপূর্ণ শস্যের মতো মুখগুলি
কী উজ্জ্বল আর প্রসন্ন !

অথচ এতকাল আমরা কিছুই দেখিনি
কুয়াশার কালো পর্দার অন্তরালে
আমরা দেখতে পাইনি রক্তিম মেঘের বিদ্যুৎ-শিহরণ,
আগাছার ঝোপঝাড়ে আমাদের প্রতিহত দৃষ্টি
দেখতে পাইনি বুকে পোষা কালবৈশাখীর ঝড়।
তবু এক অনাগত জ্যোতির্ময় পদধ্বনি
ওদের হৃদয় জুড়ে ডম্বরু বাজাচ্ছিল
ওরা অনুভব করছিল সময় হবে,
ঘড়ির কাঁটায় নিশ্চিত বিদ্ধ হবে অন্ধকারের পর্দা।
তাই কুয়াশার পর্দা ঠেলে ওদের অতন্দ্র চোখগুলি
বারংবার খুঁজে ফিরছিল জবাকুসুম সঙ্কাশং সূর্য
মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে চেপে ধরছিল মৃত্যুর টুঁটি।

এখন সূর্য নেমে আসা মাঠে
কুয়াশা নিড়ানো এই স্বচ্ছ মাটিতে
ছাখো, ঐ উজ্জ্বল আর প্রসন্ন মুখগুলি
যেন প্রস্ফুটিত গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তিম গোলাপ।

কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে 'জাতীয় ফিনান্স কমিশন' গঠনের প্রস্তাব

ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে চুক্তি সাধনের মাধ্যমে আমাদের যুক্তরাষ্ট্র গড়ে ওঠে নি। ইংরেজ আমল থেকে কেন্দ্রীয় সরকার ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন বিষয়ে শাসনের ভার রাজ্যসরকারগুলোর হাতে ছেড়ে দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। তাই আয়ের উৎসগুলোকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-সরকারগুলোর মধ্যে বণ্টনের সমস্যার মোকাবিলা করতে হলে বা এই সম্পর্কে কোন আলোচনা করতে হলে মোটামুটি চারটি বিষয়ের উপরে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন : ১. কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির শাসনগত সুবিধা, ২. সকল রাজ্যসরকারের প্রতি কেন্দ্রের অপক্ষপাত দৃষ্টি, ৩. সকল রাজ্যের সমতালে অর্থনৈতিক উন্নয়ন (regional balanced growth), ৪. কর শাসনের কাজে যাতে ব্যয় সংক্ষেপ সঠিক ও সম্পূর্ণ হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখা।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারী অর্থনৈতিক সমস্যা আবার নানাভাবে দেখা দিয়েছে। সমগ্র দেশের দিকে লক্ষ্য রেখে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচিত হলেও অর্থাৎ পরিকল্পনার রূপ 'জাতীয়' হলেও, অনেক ক্ষেত্রে পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণ রাজ্যসরকারের উপর ন্যস্ত। পরিকল্পনা কমিশনই স্থির করে দেয়, রাজ্যসরকারগুলোকে কোন্ কোন প্রকল্প (project) গ্রহণ করতে হবে। কাজেই রাজ্যসরকারগুলো যাতে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে উন্নয়নমূলক কাজ চালিয়ে যেতে পারে সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই যুক্তরাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রয়োজন হলে রদবদলও প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সরকারের মর্জি বা খেয়ালখুসী অথবা কেন্দ্রীয় বাজেটের উপরে যদি রাজ্যসরকারগুলি নির্ভর করতে অধিকমাত্রায় বাধ্য না হয়, তবেই কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক চাপের থেকে রাজ্যসরকারগুলি অস্তিত্ব বজায় রাখার কথা ভাবা যেতে পারে। আজ যখন কেন্দ্রে কংগ্রেসী সরকার এবং বিভিন্ন রাজ্য অকংগ্রেসী.

সরকার দেশের শাসনযন্ত্র পরিচালনা করছে, তখন অনেকেই এই প্রশ্ন অতি সংগতভাবেই তুলতে পারেন।

ভারতের সংবিধান অনুযায়ী ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর অন্তর অথবা প্রয়োজন হলে তার পুর্বেই একটি ফিনান্স কমিশন নিয়োগ করেন, বর্তমানে পঞ্চম ফিনান্স কমিশনের কাজ চলছে।

বর্তমানে পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থাতে ফিনান্স কমিশন সম্পর্কিত সংবিধানের ধারাটির বিলুপ্তিসাধন করে দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদে 'পরিকল্পনা কমিশনের' ন্যায় একটি "জাতীয় ফিসক্যাল কমিশন" (National Fiscal Commission) গঠন করা যায় কিনা, এই সম্পর্কে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনার প্রয়োজন আছে।

জাতীয় ফিসক্যাল কমিশনের স্বপক্ষে যুক্তিগুলি নানাভাবে দাঁড় করান যেতে পারে: ১. রাজ্যসরকারগুলোর ওপরে কেন্দ্রের খবরদারী যদি হ্রাস করাতে হয় এবং একই সঙ্গে যদি সমগ্র অবস্থাকে একটি 'জাতীয়' রূপ দিতে হয়, তবে তা জাতীয় ফিসক্যাল কমিশনের গঠনের মাধ্যমে ত্বরান্বিত হতে পারে। যারা রাজ্যসরকারগুলির ক্ষমতা ক্রমাগত সংকুচিত করতে চান ও কেন্দ্রীয় সরকারের রাজনৈতিক চাপ ও প্রভাবকে ক্রমবর্ধমান করতে চান, তারা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে এইভাবে একই ভিত্তিতে (on the same footing) বিচার করতে নিশ্চয়ই নারাজ হবেন। কারণ এমনতর জাতীয় ফিসক্যাল কমিশন গঠিত হলে পর, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাকে নানাক্ষেত্রে জাতীয় ফিসক্যাল কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে নীতি রচনা করতে হবে। ২. জাতীয় উন্নয়ন কাউন্সিল এবং বিশেষতঃ কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারগুলির অর্থ মন্ত্রীদের বার্ষিক সম্মেলনে এবং নানাক্ষেত্রে গৃহীত সুপারিশ ও নীতিগুচ্ছ যখন ফিসক্যাল নীতিতে কোন 'জাতীয় রূপ' দিতে নানাভাবে ব্যর্থ হয়েছে, এবং যার ফলে বিভিন্ন অংকংগ্রেসী রাজ্যসরকারগুলি যখন প্রায়ই বলছে— 'আমরা জনসাধারণের যুক্তিসংগত দাবী-দাওয়া মেটাতে অক্ষম, কারণ কেন্দ্র আমাদের অর্থ দিচ্ছে না', তখন জাতীয় ফিসক্যাল কমিশন গঠনের মাধ্যমেই এই সমস্যার সমাধানের কথা ভাবা যেতে পারে।

কিছুদিন পুর্বে প্রশাসন সংস্কার কমিশন (Administrative Reform Commission) সুপারিশ করেছিলেন—ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ফিস্ক্যাল ক্ষমতার বিভাজন হওয়া প্রয়োজন, পরিকল্পনা কমিশন ও ফিনান্স কমিশনের

মধ্যে এই সম্পর্কিত কার্যাবলীর বিভাজন হওয়া উচিত। তবে প্রশাসন সংস্কার কমিশন কিন্তু ফিনান্স কমিশনকে আরও শক্তিশালী করার কথাও বলেছে। ক্ষমতা বিভাজনের মধ্যে যে মূল সংগঠনকে কিভাবে শক্তিশালী করা যায়, তা এই কমিশন তার সুপারিশসমূহে আলোচনা করেছে। কিন্তু তাতেও পরিবর্তিত অবস্থাতে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করা সম্ভব হবে না বলে আশঙ্কা করার অনেক কারণ রয়েছে। গণতন্ত্রের অর্থ যদি ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হয়, তবে মৌল ক্ষমতাসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে কেন্দ্রীভূত করলে এবং রাজ্যসরকারগুলিকে দড়ি বেঁধে তার চারদিকে ঘোরালে গণতন্ত্রের পরিপুষ্টি সাধন হতে পারে না।

অকংগ্রেসী রাজ্যসরকারগুলি কি জাতীয় ফিনান্স কমিশন গঠনের কথা ভাবছেন?

ভারতীয় সংবিধানের কাঠামো যুক্তরাষ্ট্রীয় হলেও আপৎকালীন অবস্থাতে (emergency conditions) যে হঠাৎ আলাদীনের প্রদীপের স্পর্শে এককেন্দ্রিক (unitary) শাসনব্যবস্থায় রূপান্তরিত করা যায়, এ' সম্পর্কে আজ সংবিধানের ছাত্রমাত্রেই সজাগ। এই আপৎকালীন অবস্থা যুদ্ধের জন্য, অথবা বৈদেশিক আক্রমণের জন্য অথবা আভ্যন্তরীণ বিশৃংখলার জন্যও রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করতে পারেন। রাষ্ট্রপতি আরও বলতে পারেন—[সংবিধানের ৩৫৪ (১) ধারা অনুযায়ী] আপৎকালীন অবস্থাতে সমস্যার মোকাবিলার জন্যে কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারসমূহের মধ্যে অর্থসংগ্রহের উৎস-সমূহের (financial resources) বণ্টনের পদ্ধতি তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী পরিবর্তন করবেন! ভারতরাষ্ট্রের কোন অংশে যদি আর্থিক ক্ষেত্রে অপশাসন (financial maladministration) দেখা দেয়, অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি যদি তা' মনে করেন, তবেও তিনি এ ধরনের আপৎকালীন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন! কংগ্রেস-অধ্যুষিত কেন্দ্রীয় সরকার ও কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী রাষ্ট্রপতিরূপে নির্বাচিত ও ক্ষমতায় আসীন থাকলে, বিভিন্ন রাজ্যে অকংগ্রেসী সরকারসমূহকে তাই কেন্দ্রীয় সরকারের অভিরুচি অনুযায়ী অনেক পরিমাণে রাজ্যসরকারের আর্থিক নীতি গ্রহণ করতে হবে। তা' না হলে কি হতে পারে? সে আলোচনা এই স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। তবে সম্ভাব্য অবস্থার গুণগত প্রকৃতি নির্ধারণের জন্য আমরা বলতে পারি—সংবিধানে প্রদত্ত ক্ষমতা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কোন রাজ্যে আর্থিক আপৎকালীন অবস্থা

(financial emergency) ঘোষণা করলে, কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রপতির নির্দেশমাফিক যে কোন আর্থিক নীতি গ্রহণ করতে পারেন ; যেমন প্রয়োজন মনে করলে, রাজ্যসরকারের বেতনভুক কর্মচারীদের বেতনও হ্রাস করতে পারেন এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সকল অর্থ-বিল (Money Bills) রাষ্ট্রপতির অনুমোদন-লাভের জন্য রাজ্যসরকারকে বাধ্য করতে পারেন। পশ্চিমবংগে যুক্তফ্রন্ট সরকার রাজ্যসরকারের কর্মচারীদের বেতন ক্রম-পর্যায়ে বৃদ্ধি করলেও, ভবিষ্যতে যে এমন অবস্থার উদ্ভব হবে না, এ' কথা কে বলতে পারে ? তাই বেতন-কাঠামোকে সুনিশ্চিত করবার জন্যও রাজ্যসরকারের কর্মচারীরা কি কেন্দ্রীয় সরকারের সম্ভাব্য আঘাতের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারেন ? অকংগ্রেসী সরকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রায় নিরঙ্কুশ ক্ষমতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে কি এইজন্য রাজ্যসরকারের কর্মচারীদের সহায়তা পাবেন ? আগামী দিনের ঘটনাবৃত্ত এই সবের সত্যতা যাচাই করবে।

সংবিধানের প্রকৃতি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাও প্রভাব নানাক্ষেত্রে প্রসারিত থাকা সত্ত্বেও, ১৯৪৭ সালের পর কি কি অবস্থা কেন্দ্রকে আরও শক্তিশালী করতে এবং স্বভাবতই রাজ্যসরকারগুলিকে আরও দুর্বল করতে সাহায্য করেছে ? সংক্ষেপে তা হল : ১. কেন্দ্র ও রাজ্যে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত (কয়েকটি রাজ্য ছাড়া) কংগ্রেসের অর্থাৎ একক পার্টির বিপুল গরিষ্ঠতায় ক্ষমতা লাভ ; ২. ১৯৫০ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত শ্রীনেহেরুর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা ; ৩. দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ ; ৪. ১৯৬২ সালে চীন-ভারত এবং ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত সংঘর্ষ। কিন্তু এই পরিপ্রেক্ষিতের অনেক রদ-বদল আজ হয়েছে। তবুও কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও গভর্নর নিয়োগে পূর্বের মত প্রতিভাত হয়েছে। জাতীয় সংহতির নামে কি কেন্দ্রীয় সরকারকে শক্তিশালী করার ব্যাপক আয়োজন হচ্ছে না ? রাজ্যসরকারগুলির ক্ষমতা বাড়লেই যে তা' জাতীয় সংহতির বিরুদ্ধে যাবে, এমন কথা কি হলফ করে বলা যায় ? এই পরিপ্রেক্ষিতেই কি 'জাতীয় সংহতি কাউন্সিল বা সম্মেলনসমূহের' (National Integration Council & Conferences) কার্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে না ?

ভারতের সংবিধানের যদি যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রকৃতি সত্যই আনতে হয়, তবে নানা সংশোধন আজ দরকার। ভারতের সংবিধান গড়ে তুলতে ভারতের

জনগণ কোন অংশই গ্রহণ করে নি, যদিও সংবিধানে 'জনগণের' কথাই বলা হয়েছে। এই সংবিধান রচনা করতে কংগ্রেসই একমাত্র দায়ী আর তাই এই সংবিধানকে 'কংগ্রেস সংবিধান' (Congress Constitution) বলে অনেকে আখ্যা দিয়েছেন। পরিহাস হলেও একথা সত্য। যে সংবিধান রচনায় জনগণ অংশগ্রহণ করেনি, সেই সংবিধানের প্রতি জনগণ ও জনগণের, প্রতিনিধিদের আনুগত্য প্রদর্শন বাধ্যতামূলক !

তাই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে রাজ্যসমূহের সংগ্রামে ভারতে গণতন্ত্রের নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা আজ দেখা দেবে। ১৯৪৭ সালে ২২শে জানুয়ারী কন্‌ষ্টিটুয়েণ্ট এ্যাসেম্ব্লিতে শ্রীনেহেরু বলেছিলেন—"A Free India will see the bursting forth of the energy of a mighty nation. What it will do and what it will not, I do not know but I do know that that it will not consent to be bound down by anything. Some people may imagine that what we do know may not be touched for *twenty years*. That seems to me a complete misapprehension,...This House cannot bind down the next generation or people who will succeed us in this task." (italics আমার)

আজ ২০ বছর পরে কি সেই সম্ভাবনাই দেখা দিয়েছে ? কেন্দ্রের খবরদারি কমাবার তাগিদে অকংগ্রেসী রাজ্যসরকারসমূহ কি নানা ক্ষেত্রে আজ সজাগ ? তার সূচনা কি সংবিধানের অর্থ-সূত্র বণ্টনের (distribution of financial resources) ছাঁচ ভেঙে নতুন ছাঁচ গড়বার কার্যসূচীতে প্রকাশ পাবে ? ফিনান্স কমিশনের মত একটি আধা-বিচারবিভাগীয় (semi-judicial) কমিশনের পরিবর্তে অকংগ্রেসী সরকারসমূহ একটি 'জাতীয় ফিনান্স কমিশন' গঠনের কথা ভাবছেন, যেখানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার-সমূহ একই স্তরে বিরাজ করবেন ? আর তাতে, উঁচুতে বসিয়ে-দেওয়া কেন্দ্রীয় সরকারের তদারকি ও খবরদারি হ্রাস পাবে ও গণতান্ত্রিক শক্তির বিকাশে তা' সহায়ক হবে ?

কৃষ্ণ উপাধ্যায়
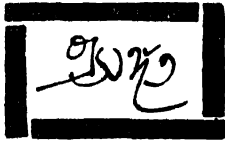
নজরুল ৭০

এ-বাংলার গঙ্গাতীরবর্তী কোন এক অখ্যাত গ্রামে প্রাক্-সন্ধ্যায় নজরুলের ছবিখানি রক্তজবার মালায় সাজিয়ে হ্যারিকেনের অনুজ্জ্বল আলোতে পুরনো হারমনিয়মের রীড্ সজোরে চেপে ধরে অসম্ভব আবেগে যখন গেয়ে উঠছিল একটি তাজা কিশোর-কণ্ঠ, 'এ শিকল পরা ছল মোদের, এ শিকল পরা ছল…'

ঠিক তখনই পদ্মাতীরবর্তী এক অখ্যাত গ্রামের একটি কচি কিশোরী কণ্ঠ একইভাবে গান ধরেছিল, 'তোরা সব জয়ধ্বনি কর, তোরা সব জয়ধ্বনি কর। ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কাল বোশাখীর ঝড়…'

আর '৭৬-এর ১১ই জ্যৈষ্ঠে দুই বাংলার হৃদয় এক হয়ে গিয়েছিল। মকরবাহিনী গঙ্গা পদ্মায় মিশেছিল। দুই বাংলার হৃদয়কে, রবীন্দ্রনাথ ছাড়া, আর কোন্ কবি এমন করে বাঁধতে পেরেছেন?

৭০ বছর পূর্ণ করলেন নজরুল। বাক্যহীন, বোধহীন, লুপ্ত-চৈতন্য জীবন্মৃত কবি। কিন্তু তাঁর শারীরিক অস্তিত্বের কথা এক ডাক্তার বৈদ্যি ছাড়া আজ আর কে মনে রাখে! জন্মদিনে অবশ্য ফুলের তোড়া হাতে কেউ কেউ কবিকক্ষে হাজির হ'ন, দু'একটা সভা সমিতিতে কবিকে নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া চলে, কবিকে সামনে রেখে নাম ও অর্থের আকাঙ্ক্ষাও করেন কেউ কেউ। কিন্তু এহো বাহ্য। আসলে কবি এখন ষোল আনাই চিত্রাপিত, স্মৃতিময়। দেহ নিয়েও আজ দেহভার উত্তীর্ণ। বহমান সময়ের সুদৃশ্য ফ্রেমে, অখণ্ড বাংলার শ্রদ্ধাচিত পটভূমিকায়, শোষিত মানুষের মরণজয়ী রক্তরেখায় আঁকা হয়ে গেছে তাঁর বিদ্রোহী-ছবি। এখন সেই নজরুলকেই আমরা চিনি। চিনি তাঁর গানে। তাঁর কবিতায়।

সেই কবে কোন্ শৈশবে সাদা প্যান্টের তলায় সাদা হাফ শার্ট গুঁজে বুকে ব্যাজ্ এঁটে তালে তালে ফরোয়ার্ড মার্চ করেছি আমরা। ব্যাণ্ডে বেজেছে নজরুলের গান, 'চল্ রে চল্ রে চল্, ঊর্দ্ধ গগনে বাজে মাদল…।' সে গানে

শৈশবের রক্তেও জ্বালা ধরত। লালমুখো কাউকে সামনে দেখলেই মনে হত, বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ি, ধরি টুঁটিটা চেপে!

একবার ব্রহ্মপুত্রের জল বিপ্লবীদের রক্তে লাল হ'ল। নদীর ধারে একটা সরকারী অফিসে আগুন দিতে গিয়েছিলেন ওঁরা। অনেকেই ফিরলেন না। পরের দিন সারা সহর তোলপাড় করে লক্ষ লোকের মিছিল বের হ'ল। মিছিলের অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে অগ্নিঝরা গান, 'কারার ঐ লৌহ কপাট, ভেঙে ফেল কর রে লোপাট, রক্ত জমাট শিকল পুজার পাষাণ বেদী…'

আর একবার দাঙ্গা লাগল। মন্দির-মসজিদ থেকে বেরুল ধারাল তরবারি, তীক্ষ্ণ বর্ষাফলক। তাজা রক্তের ফোয়ারা উঠল। তারপর গভীর রাতে মশাল জ্বালিয়ে কারা বেরুল পথে। তাদের চোখও অশ্রুসিক্ত, কণ্ঠে জলদগম্ভীর স্বর, 'লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁসিয়ার হে…।'

দেখতে দেখতে তপ্ত রক্ত ফুল হয়ে ফুটে উঠল।

যৌবনে এসে শুনলুম, লম্বিত-কেশ-লুণ্ঠিত কোঁচা অধ্যাপক মশাই ঢুলু ঢুলু নয়ানে বলছেন, 'নজরুল কাব্যে কোলাহল যত, সুর তত নেই।'

সেদিন বললেন এক প্রৌঢ় কবি, 'রাজনীতির চালে রবীন্দ্র-নজরুল যে এক হয়ে গেল হে!'

আর আমি নজরুলের ছবি দেখলাম: ঝড়ের বাতাস কেটে দুরন্ত আবেগে ছুটে-চলা খরশান এক মুখচ্ছবি। হলাহলে নীল তার কণ্ঠ। তার ডানার ঝাপটায় দূরাগত বিপ্লবের ধ্বনি!

আর আমি রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখলাম: সকল ঝড়ের শেষে যেন নবীন বর্ষার মেঘ। প্রভাত সূর্যের মত উজ্জ্বল তার মুখ। তার অজস্র অকৃপণ ধারায় ধন্য হ'ল দেশ, পুণ্য হ'ল জীবন।

মনে হ'ল, রবীন্দ্রনাথ আমাদের হৃদয়ের আনন্দ, প্রাণের শান্তি, আত্মার আরাম।

মনে হ'ল, নজরুল আমাদের ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল, যুদ্ধের অস্ত্র।

দুই-ই ত চাই আমাদের!

বাঁচতে গেলে লড়তে হবে, লড়াই করে বাঁচতে হবে। তখন চাই নজরুলকে। কেননা নজরুল কৃষকের হাতে কাস্তে, মজুরের হাতে হাতুড়ি, সৈনিকের হাতে বন্দুক।

আবার লড়াইয়ের শেষে জীবনের উজ্জ্বল শস্যে যখন পূর্ণ হবে ভাণ্ডার,

গৃহে গৃহে তখন সপ্তরং আলপনায় নবান্নের উৎসব। তখন চাই রবীন্দ্রনাথকে। কেননা রবীন্দ্রনাথ পৌষের গান, ফাল্গুনের ছন্দ, বৈশাখের নৃত্য।

নজরুল ছাড়া আমরা বাঁচি না। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আমরা বেঁচেও মরে থাকি!

সুতরাং রাজনীতির চাল চেলে একীকরণের প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন শ্রেণী-সচেতনতার, শ্রেণী-দ্বন্দ্বের।

আর যাঁরা নজরুল-কাব্যে শুধু কোলাহলই দেখেন তাঁরা ত নজরুলকেও বোঝেন না, রবীন্দ্রনাথকেও না। কেননা তাঁরা জীবনকেই বোঝেন না। মূর্খের স্বর্গে আশ্চর্য নির্লিপ্ততায় তাঁদের অধিষ্ঠান!

২৫শে বৈশাখ ১১ই জ্যৈষ্ঠকে ডেকে আনে। দুই বাংলার খণ্ডিত হৃদয় এক হয়। এই দুটো দিন অনেক দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণার মধ্যেও স্মরণ করিয়ে দেয়, রাজনীতিতে আমরা বিভক্ত হয়েছি কিন্তু কবি-প্রণামে আমরা একত্রিত।

পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের অনুষ্ঠান

এ বছর নজরুল জন্ম-জয়ন্তীর উল্লেখযোগ্য ঘটনা, পশ্চিমবঙ্গ যুক্তফ্রণ্ট সরকার কর্তৃক রবীন্দ্রসদনের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে কবির জন্মোৎসব পালন। এই উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করে লোকপ্রিয় ফ্রণ্ট সরকার একদিকে যেমন সংস্কৃতি-মনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন অন্যদিকে তেমনি সমগ্র জাতির হয়ে একটি মহৎ কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। উৎসব-প্রাঙ্গণ থেকে শিক্ষামন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, অবিলম্বে কবিকে প্রশস্ততর বাসভবনে স্থানান্তরিত করা হবে, কবির সেবাকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় পরিচারিকা নিযুক্ত করা হবে এবং সরকারী প্রচেষ্টায় সুলভমূল্যে সমগ্র নজরুল-রচনা প্রকাশের কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হবে। নজরুলের জীবন অবলম্বনে একটি সরকারী তথ্যচিত্রও ইতিমধ্যেই প্রদর্শিত হচ্ছে। 'বিদ্রোহীকবি' নামে এই তথ্যচিত্রের কাহিনীকার মন্মথ রায়, পরিচালকও তিনি। গ্রন্থনায় আছেন বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র।

কবির জন্মদিন উপলক্ষে সরকার যে সুদৃশ্য পুস্তিকাটি প্রকাশ করেছেন তাও মুক্তকণ্ঠে প্রশংসার যোগ্য। মুজফ্ফর আহ্মেদ, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ রবীন্দ্র গুপ্ত, কল্পতরু সেনগুপ্ত প্রভৃতির মূল্যবান প্রবন্ধে স্বল্পমূল্যের এই সংখ্যাটি বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। পরিশিষ্টে নজরুল-উদ্ধৃতি ও নজরুল-রচনার সমগ্র-

তালিকা সংযুক্ত হওয়ায় এর আকর্ষণ আরো বেড়েছে। নজরুল-বিষয়ে প্রাথমিক পাঠ গ্রহণের পক্ষে এই গ্রন্থটি অত্যন্ত মূল্যবান।

তপোবিজয় ঘোষ

শিলাবতী উপত্যকায় প্রস্তরযুগ

পশ্চিম বাংলার শৈলাঞ্চল ও তরঙ্গায়িত উচ্চভূমিতে যে সব নদনদী ও স্রোতোধারাগুলি প্রাচীন মানব-ইতিহাসের স্বাক্ষর বহন করছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রাচীন নদী শিলাবতী। এই নদীর ভূতাত্ত্বিক গুরুত্ব ও বৈচিত্র্য যেমন আকর্ষণীয় তেমনই মূল্যবান। এর দুই তীরে ও উপত্যকায় আবিষ্কৃত বিভিন্ন পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন প্রাগৈতিহাসিক যুগের রহস্যময় হাতিয়ার।

মেদিনীপুর জেলার গড়বেতার পাশেই দেখা যাবে এক দিগন্ত-বিস্তৃত কংকরাবৃত প্রান্তর—এর নাম গনগনির মাঠ। স্থানীয় কিম্বদন্তীর বর্ণাঢ্য কাহিনীতে বর্ণিত আছে যে সুদূর অতীতে এই ধূসর প্রান্তরেই নাকি সংঘটিত হয়েছিল পাণ্ডববীর ভীম ও বকাসুরের সংগ্রাম। এখানে আবিষ্কৃত বিভিন্ন প্রস্তরীভূত কাঠের অংশগুলি লোকপরম্পরায় প্রচলিত উপকথায় নিহত বকরাক্ষসের অস্থিখণ্ড বলে প্রতীত হয়ে থাকে।

সাম্প্রতিককালে পশ্চিমবংগ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিকার গনগনির মাঠ ও গড়বেতা তথা শিলাবতীর অদূরে কয়েকটি স্থানে তাদের সমীক্ষা ও অনুসন্ধান-কার্য পরিচালনা করেন। এই সমীক্ষার ফলে আজ প্রাগৈতিহাসিক বাংলার একটি বিস্মৃত যুগের কাহিনী আবিষ্কৃত হয়েছে। এর মূক সাক্ষ্য দেবে নানা তাৎপর্যপূর্ণ ক্ষুদ্রাশ্মর (Microlithic) হাতিয়ার ও আরও বহু পূর্বেকার একশ্রেণীর আয়ুধ। এই অনুসন্ধান যেমন একদিকে এখানকার পুরাতাত্ত্বিক দিগন্তকে আলোকিত করেছে তেমনি এখানে পরিচালিত সমীক্ষার ফলে এখানকার ভূতাত্ত্বিক সংগঠন ও বিবর্তনের এক উল্লেখযোগ্য পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে। এখানে যে বহু লক্ষ বছর আগে এক আগ্নেয় শৈল-সংগঠনের অবস্থিতি ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ রইল না। সে যুগের এই শৈলসংগঠনটি হয়তো একদা একটি ক্ষুদ্রাকার পাহাড়ের মতো হলেও আজ তা বিলুপ্তির পথে—তার মজ্জাগত প্রস্তরীভূত বালুকাসমষ্টি আজ বিবর্ণ ক্ষয়িষ্ণু এবং বিপুল Feldsper সমষ্টি যুগ-যুগান্তরের ক্রমান্বয় আর্দ্রতায় 'কেওলিন' (Kaolin) বা তথাকথিত চীনে মাটিতে পর্যবসিত। গনগনির মাঠের নিম্নভাগের এই

স্তরবৈচিত্র্য পাশেই প্রবাহিত শিলাবতী ও ওপারের নিম্নভূমিকে নিসর্গ বৈচিত্র্যে এবং লালমাটির দেশের নয়নাভিরাম বর্ণাঢ্যতায় অপরূপ করে তুলেছে। এই ভূসংগঠনের সর্বোচ্চ স্তরেই প্রতিভাত হয়েছে প্রাচীন মানবের জীবনলগ্নের ইতিহাস। এখানে আবিষ্কৃত পাথরের ছোট বড় হাতিয়ারগুলিকে আকৃতি-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য বিচারে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়:

(ক) শেষ প্রত্নাশ্মীয় (Upper Paleolithic),

(খ) ক্ষুদ্রাশ্মর আয়ুধ (Microlithic) ও

(গ) নবাশ্মীয় আয়ুধ (Neolithic)।

প্রাচীনতম যুগের (ক) শ্রেণীর (শেষ প্রত্নাশ্মীয়) অস্ত্রগুলিকে যেমন বৈশিষ্ট্যগত বিচারে প্রায় পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বের Pleistocene যুগের বলে নির্দিষ্ট করা যায় তেমনই অনুমান করা যায় যে এগুলির পেছনে হয়তো আরও কোনো প্রাচীনতর যুগের বিবর্তনের ইতিহাস রয়েছে। অবশ্য এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে গড়বেতা অঞ্চলে Quartzite পাথরে নির্মিত এই শ্রেণীর ক্ষুদ্র কুঠার কিংবা শল্কায়ুধের (Flake tool) উপস্থিতি বিশেষ আশ্চর্যের নয়—কেননা সন্নিহিত বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত শুশুনিয়া পাহাড়ের চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলে এশিয়ার এক অন্যতম প্রত্নাশ্মর আয়ুধনির্মাণক্ষেত্র অবস্থিত হয়েছে।

(খ) শ্রেণীর আয়ুধগুলি স্বভাবতই প্রস্তর যুগের সমাপ্তিকালের ইতিবৃত্তকে বহন করছে—যে যুগে মানুষ প্রথম শুরু করেছে কৃষিকার্য কিংবা প্রকৃতির ঐশ্বর্য ভাণ্ডার শস্যের নিয়ন্ত্রণ এবং পশুপালন। মোটামুটিভাবে পৃথিবীর নানাস্থানেই ক্ষুদ্রাশ্মর অথবা শেষ প্রস্তরযুগে দেখা যায় মানবসংস্কৃতির তথা জীবনযাপনের এই বিশিষ্ট পরিবর্তন। প্রমাণদৃষ্টে জানা যায় এই ভাবেই শিলাবতী উপত্যকায় মানুষ তার খাদ্য সংগ্রাহকের ভূমিকা থেকে অবতীর্ণ হয়েছিল শস্যফলনের অভিনব কর্মপরিক্রমায়। প্রকৃতপক্ষে কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রাশ্মীয় ছুরিকা (Blade) এবং শস্যচ্ছেদনকারী আয়ুধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অর্ধচন্দ্রাকৃতি ধারালো অস্ত্রগুলি (খ) শ্রেণীর অর্থাৎ নবাশ্মীয় হাতিয়ারগুলির সাংস্কৃতিক দিগন্ত থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন না-ও হতে পারে। গনগনির মাঠে আবিষ্কৃত পাষাণবলয়ের নিদর্শন ও মসৃণ কুঠার নিঃসংশয়ে এক অগ্রসরমান মানবসভ্যতার সাক্ষ্য বহন করছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে অতীতের এই নবাশ্মীয় পাষাণবলয় কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারতো সেযুগের কৃষিদণ্ডের (Digging stick) ভারস্বরূপ। গণগণির মাঠে আবিষ্কৃত

প্রস্তরযুগের নিদর্শনগুলি আরও মূল্যবান হয়ে উঠেছে ভ্রাম্যমান প্রাগৈতিহাসিক মানবের গতিপথ নির্ধারণে। কয়েকমাস আগে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের পক্ষ থেকে পুনর্বার এক সমীক্ষাকার্য পরিচালনা করা হয়। তখন শিলাবতীর ওপারে প্রায় বাঁকুড়ার প্রত্যন্তসীমায় প্রাচীন ও বিশীর্ণ স্রোতোপথ চম্পাখাল বা চাঁপাখালের ধারে শালবনের অভ্যন্তরে ও সীমানায় এক ক্ষয়িষ্ণু ও কংকরাবৃত ঢালুভূমির প্রস্থচ্ছেদে (Section) এবং হলুদবর্ণের কিংবা লোহিতাভ বালুকাগর্ভে এই আয়ুধসমূহের এক বিশিষ্ট উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করা গেল। চম্পাখাল অঞ্চলে আবিষ্কৃত আয়ুধগুলিকে সাধারণত দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় :

(ক) শেষ প্রত্নাশ্মীয় আয়ুধ,

(খ) ক্ষুদ্রাশ্মীয় নিদর্শন।

এগুলির মধ্যে শেষ প্রত্নাশ্মীয় গোষ্ঠীর বিভিন্ন অস্ত্রগুলি যেমন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে তেমনই ক্ষুদ্রাশ্মীয় আয়ুধগুলির মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে chert, flint, agaete, chalcedony ইত্যাদি সূক্ষ্মকণাবিশিষ্ট পাথরে নির্মিত বিভিন্ন শ্রেণীর ছুরিকা, সূক্ষ্মাগ্রফলা ও অপরাপর নিদর্শনাদি। একদা এখানে যে ক্রমপরম্পরায় মুক্তপ্রান্তরীয় আয়ুধনির্মাণ ক্ষেত্র ছিল সে বিষয়ে স্থির নিশ্চিত হওয়া চলে। এখানকার ক্ষুদ্রাশ্মর ছুরিকাগুলি স্মরণ করিয়ে দেবে অজয় উপত্যকায় অবস্থিত পাণ্ডুরাজার ঢিবির বিভিন্ন ক্ষুদ্রাশ্মর আয়ুধকে—এর দ্বারা অনুমান করা চলে এক সভ্যতার অগ্রগমন এখান থেকে শুরু হয়েছিল। তাম্রাশ্মীয় সভ্যতায় ও সৌন্দর্যবোধে এই সংস্কৃতির উত্তরণ হয়তো প্রতিভাত হবে শিলাবতীর ধার ঘেঁষে আরও দক্ষিণ-পুর্বে প্রাচীন মহাবন্দর তাম্রলিপ্তের নবাশ্মীয় সংস্তরে। সভ্যতার এই প্রসারণের ইতিহাস প্রকৃতই আজ পুরাতাত্ত্বিকের একান্ত আগ্রহের বস্তু। আমরা আশা করব আগামী দিনে সভ্যতার এই পদবিক্ষেপের কাহিনী আরও উদ্‌ঘাটিত হবে ; ভূস্তরে অবলুপ্ত অধিবসতির চিহ্নগুলি এবং অন্যান্য পুরাকীর্তিসমূহ বহু শতাব্দী-বিধৃত জীবন-সংগ্রাম ও সৌন্দর্যভাবনার বিস্মৃত অধ্যায়কে তুলে ধরবে।

অশোককুমার ভট্টাচার্য

[তথ্যসমূহ দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নতত্ত্ব অধিকর্তা শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত]

ডঃ মুহম্মদ আবদুল হাই

পূর্ব বাংলার ঐতিহাসিক ভাষা সংগ্রামের অন্যতম নায়ক অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই-এর কদিন আগে জীবনাবসান হয়েছে অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে। ঢাকার সন্নিকটে খিলগাঁওতে গত তেসরা জুন ট্রেন চাপা পড়ে এই বিশিষ্ট পণ্ডিতের মৃত্যু ঘটেছে।

পঞ্চাশ বছর আগে হাই সাহেবের জন্ম হয় মুর্শিদাবাদ জেলায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে বাংলা সাম্মানিক পাঠক্রমের প্রথমতম স্নাতক্ শ্রীহাই স্নাতকোত্তর পরীক্ষাতেও সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছিলেন। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজসাহী, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গায় অধ্যাপনা করার পর শ্রীহাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। মৃত্যুর পূর্ব অবধি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা এবং সংস্কৃত বিভাগ দুটির অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত ছিলেন তিনি।

ঢাকার বাংলা একাডেমীর পরিচালনা এবং প্রখ্যাত "সাহিত্য" পত্রিকার সম্পাদনা করতে গিয়ে শ্রীহাই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পূর্বতোয়া ধারাটির নেতৃত্ব করেছিলেন এমন কথা স্বচ্ছন্দে বলতে পারি। পাকিস্তানে বাংলা ভাষার কণ্ঠরোধ করে যখন একনায়কতন্ত্রী শাসকরা উৎপীড়ন শুরু করেছিলেন, তার বিরুদ্ধে সোচ্চার বিদ্রোহী ছিলেন অধ্যাপক হাই। সুদীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর যখন বাংলা ভাষা পাকিস্থানে যথাযোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন এই বিদ্রোহী অধ্যাপকই তার নবতর সমৃদ্ধির সেবায় আত্মনিয়োগ করেন শিক্ষণ, সম্পাদনা, গবেষণা পরিচালনা এবং সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে।

শ্রীহাই-এর প্রখ্যাত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল "সাহিত্য ও সংস্কৃতি", "বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত", "ভাষা ও সাহিত্য", "ধ্বনি-বিজ্ঞান ও ধ্বনিতত্ত্ব" প্রমুখ। ধ্বনিবিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর স্বকৃত এবং পরিচালিত বিভিন্ন

গবেষণাকে বাংলা ভাষাতত্ত্বের চর্যায় পরম মূল্যবান বলে গণ্য করা হয়ে থাকে পণ্ডিতমহলে।

তাঁর সম্পাদিত একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল "মধ্যযুগের বাংলা কাব্য।" তবে তাঁর দায়িত্বে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান হল রেভারেণ্ড জেমস লং-কৃত বাংলা গ্রন্থের বিস্তৃত তালিকার পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ, যা ডঃ মহাদেব প্রসাদ সাহার সহযোগিতায় তিনি শতাব্দীর ধূসর ধূলি সরিয়ে বিদ্বৎজনের হাতে তুলে দিয়েছিলেন কিছুদিন আগে।

পল্লব সেনগুপ্ত

॥ নবশক্তি প্রেস : স্বত্বাধিকারী : নবশক্তি নিউজপেপার্স
কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-১৪ ॥

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার আঙ্গিক প্রসঙ্গ (২)

নীলরতন সেন

ব প্রবন্ধে রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিদের শব্দ-চয়ন বিষয়ক মেজাজের কিছুটা পরিচয় ভের চেষ্টা করা হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে তাদের বাক্-রীতি সম্পর্কে রিচয় নেওয়া যেতে পারে। কবিভাবনার-নূতনত্বের সঙ্গে পূর্বোল্লেখিত াঙ্গিকগত মুখ্য চারটি বৈশিষ্ট্যই স্বকীয়তা লাভ করে। তবে সেক্ষেত্রেও শব্দ ও চিত্রকল্পের তুলনায় বাক্‌বিন্যাস ও ছন্দে নূতনত্বের অবকাশ অপেক্ষাকৃত ম রয়েছে বলা যেতে পারে।

বাংলা বাক্যগঠন-রীতি ইংরেজি থেকে পৃথক। এমনকি প্রাতিবেশী ারতীয় ভাষা হিন্দী, গুজরাটি, মারাঠি থেকেও ক্রিয়াপদের ব্যবহারে তার কিঞ্চিৎ পার্থক্য রয়েছে। বাংলা বাক্‌রীতির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল, প্রয়োজন ত ক্রিয়াপদের উহ্যতা বা বিলুপ্তি। এই ভাষাসংহতির প্রচেষ্টায় বিশেষণ, মধাতু, ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য ইত্যাদির ব্যবহারকে কতটা নিয়ন্ত্রিত করা যেতে ারে এ-যুগের কবিরা তার নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। এক্ষেত্রে সর্ব থ ..মনে আসবে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের নাম। শব্দচয়ন ও বাক্‌বিন্যাসে তাঁর যম সুবিদিত। ছন্দোরক্ষার খাতিরে অথবা মিলের গরজে সাধু ও প্রাকৃত ার সংমিশ্রণ, নামধাতুর বাহুল্য, বিভক্তি-বিপর্যয়,—এজাতীয় ত্রুটি তিনি দৌ সহ্য করতে রাজি নন। তাঁর এই অতি মার্জিত, পরিশীলিত প্রকাশ- শব্দগ্রন্থনা ও বাক্‌বিন্যাসে একান্ত অপরিহার্যতার প্রতি সদা সতর্ক দৃষ্টি ্যাদেই যেমন ক্লাসিক ভাস্কর্য এনে দেয়, তেমনি কিছুটা কৃত্রিম কাঠিন্যও ভব করা যায়। পাঠক এমন অনভ্যস্ত কঠিন পথে চলতে গিয়ে, কোথাও থিল্যের অবকাশ না পেয়ে একটু বেশী হাঁপিয়ে ওঠেন। যে কোনও লেখা কেই এই অতি সংহত ভাষাভঙ্গীর নিদর্শন পাওয়া যাবে। একটি দৃষ্টান্ত ানে তোলা যেতে পারে,—

উত্তীর্ণ পঞ্চাশ : বনবাস প্রাচ্য প্রাজ্ঞদের মতে
অতঃপর অনিবারণীয় ; এবং বিজ্ঞানবলে
পশ্চিম যদিও আয়ুর সামান্য সীমা বাড়িয়েছে
ইদানীং, তবু সেখানেই মৃত্যুভয় যৌবনের
প্রভু, বার্ধক্যের আত্মাপহারক। আশ্রুত তারক
অন্যত্রও অনাগত ; জাতিভেদে বিবিক্ত মানুষ ;
নিরঙ্কুশ একমাত্র এক নায়কেরা। কিন্তু তারা
প্রাচীর, পরিখা, রক্ষী, গুপ্তচর ঘেরা প্রাসাদেও
উন্নিদ্র যেহেতু, তাই ভগ্ন সেতু নদীতে নদীতে,
মরু নগরে নগরে। [যযাতি, স্ব. কা. স.]

এ-অংশের ছোট বড়ো বাক্যাংশগুলি গদ্যভঙ্গীতে সাজাতে গেলেই ধরা যাবে তিনি শব্দ বাহুল্য কি নির্মমভাবে ছেঁটে দিয়েছেন। তাঁর শব্দ সংকোচের নমুনা অসংখ্য কবিতায় ছড়িয়ে আছে। ক্রিয়াপদের সহায়ক অংশটি বর্জনের দুএকটি নমুনা তোলা যেতে পারে।—

মন্দির নিশায় ভিক্ষুরে **অভিষেকি** [মহানিশা]
ত্রস্ত তারকা **সন্ধানে** সংক্রান্তি [জন্মান্তর]
দীন ভিখারীর হীনতা **বাখানে** ভিক্ষা [জন্মান্তর]

ভাষাকে সংহত করতে গিয়ে এখানে অভিষেকি (অভিষেক করে), সন্ধানে (সন্ধান করে), বাখানে (বাখান করে) ইত্যাদি ক্রিয়া ব্যবহার করেছেন। অনুরূপ ভাবে, অপব্যয়িত, চিরভিলসিত, লজ্জিত, আস্ফালিবে, মায়ামুকুন্দিত, শাপবিমোচিত, বিষায়িত জাতীয় পদের প্রাচুর্য তাঁর বাক্যবিন্যাসে লক্ষিত হয়।

উপসর্গ সহযোগে যেখানে বাক্যের শব্দ কমানোর সুযোগ আছে (যেমন পূর্বোক্ত কাব্যাংশে অনিবারণীয়, নিরঙ্কুশ, বিবিক্ত, উন্নিদ্র ইত্যাদি শব্দ), বা যেখানে সহায়ক ক্রিয়া ছেঁটে দেবার অবকাশ আছে (পূর্বোদ্ধৃত তিনটি পংক্তির ক্রিয়াপদ লক্ষণীয়) সুধীন্দ্রনাথ সে জাতীয় শব্দের সন্ধানে নিজেও বহু নতুন শব্দ গড়েছেন, পুরোনো শব্দাবলীর নতুন ব্যবহার করেছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। যেমন, নির্ভার প্রমোদ (বিনয়), কাম-কারণ-কর্দম (বিনয়), অপুষ্পক ত্রিভঙ্গিম নীপ (প্রতিপদ), যুগ্মগিরি শোথযন্ত্রে পীবরতা (প্রতিপদ), কুহেলি কলুষ (শাশ্বতী), সমুচ্চ সপ্তম, সান্তর গুর্জন

(অর্কেষ্ট্রা), দ্বিবায় তনিক অনুকৃতি (সিনেমায়), অনভিজাতিক দম্ভ (সিনেমায়), প্রকীর্তিত সে কন্দরে (শর্বরী), উন্মুখর বিনির্মোক আত্মার মর্মরে (মৃত্যু)' ইত্যাদি। এর মধ্যে অতি কৃত্রিম প্রয়াস ফুটে উঠেছে ; এবং বহু শব্দই পরবর্তী কবিরা আর গ্রহণ করেন নি।

তবে অল্প কথায় ভাবকে ফোটাতে তাঁর ব্যবহৃত কিছু জোড় শব্দ ও বিশেষণ পদ পরবর্তী তরুণ কবিদের খুবই প্রভাবিত করেছে। তেমন কয়েকটি দৃষ্টান্ত তোলা যেতে পারে। যেমন, ফসল-বিলাসী হাওয়া (শাশ্বতী), শেফালী সেজ (শাশ্বতী), স্মৃতি পিপীলিকা (শাশ্বতী), দ্বিধাথরোথরো (শাশ্বতী), শটিত স্মৃতি (বিস্মরণী), রতিপরিমল (অর্কেষ্ট্রা), অজ্ঞানগোচরগতি (বর্ষপঞ্চক), সৃজনবেদনাস্ফীত (বর্ষপঞ্চক), কালাবর্তপরিস্ফীত (পরাবর্ত) ইত্যাদি।

সুধীন্দ্রনাথ এই সব শব্দগুচ্ছ ব্যবহারে, ভাবসংহতির পরিস্ফুটনায় মুখ্যতঃ মধুসূদনের এবং সম্ভবতঃ কিয়দংশে রবীন্দ্রনাথ ও মোহিতলালের রচনারীতির সহায়তা পেয়েছেন। তবে পুর্বোক্ত কবিরা ভাষার প্রকাশশক্তি বৃদ্ধি ও নমনীয়তার প্রতি লক্ষ রেখেই যেখানে নতুন শব্দ চয়ন ও তার নানা বিশিষ্ট প্রয়োগ করেছেন, সুধীন্দ্রনাথ সেখানে বাহুল্য বর্জিত সংহত প্রকাশভঙ্গির প্রতি অতিমাত্রায় মনোযোগী হয়েছিলেন। সম্ভবতঃ সে কারণেই সুধীন্দ্রনাথ কবিতার আঙ্গিকে এত নিখুঁত হলেও পাঠক মনে তেমন সাড়া তুলতে পারেন নি। পরবর্তী কবিরাও তাঁর প্রকাশভঙ্গী অনুসরণে ততটা উৎসাহ বোধ করেন নি।

রবীন্দ্র পরবর্তী কবিদের মধ্যে নিঃসংশয়ে জীবনানন্দই সব থেকে বেশী পাঠক মনকে আকৃষ্ট করতে পেরেছেন। যদিও চিত্রকল্পে, বর্ণনায় তিনি এক অজানা নতুন জগতের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন, ভাষাবিন্যাসে তিনি পরিচিত ধারাতেই পদচারণা করেছেন। তার মধ্যেই যতটা স্বকীয়তা আনা সম্ভব তারই পরীক্ষা করেছেন। এ যুগের একশ্রেণীর কবিরা কবিতার ভাষাকে কথ্য মুখের ভাষার যতটা সম্ভব কাছাকাছি আনতে চেয়েছেন। জীবনানন্দেও সে বৈশিষ্ট্য কিছুটা চোখে পড়বে। দু একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।—

(১) অশ্বত্থের শাখা
করেনি কি প্রতিবাদ? জোনাকির ভিড় এসে সোনালি
ফুলের স্নিগ্ধ ঝাঁকে
করেনি কি মাথামাখি?

থুরথুরে অন্ধপেঁচা এসে
বলেনি কি : 'বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে
চমৎকার !—
ধরা যাক্ দু-একটা ইঁদুর এবার !'
জানায়নি পেঁচা এসে এ তুমুল গাঢ় সমাচার ?
[আট বছর আগের একদিন, শ্রে. ক.]

(২) মনে হয় যেন অমিতা সেনের সাথে সুবলের ভাব,
সুবলেরই শুধু ? অবশ্য আমি তাকে
মানে এই—আমি অমিতা বলছি যাকে—
কিন্তু কথাটা থাক ;
কিন্তু তবুও—
আজকে হৃদয় পথিক নয় তো আর,
নারী যদি মৃগতৃষ্ণিকার মতো—তবে
এখন কি ক'রে মন কারাভান হবে।
[লোকেন বোসের জর্নাল, শ্রে. ক.]

বক্তব্য ও ভাবের গুরুত্ব ফোটাতে একই বাক্য বা বাক্যাংশের পুনরাবৃত্তি জীবনানন্দের লেখাতেও রয়েছে। এ যুগের কবিদের ক্ষেত্রে এটি একটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য। আগের যুগের কবিতার ধুয়ার বিকল্প বলা যেতে পারে একে। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক,—

(১) ধানসিঁড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়েছিলাম—পউষের রাতে—
কোনোদিন জাগবোনা জেনে
কোনোদিন জাগবোনা আমি—কোনোদিন জাগবোনা আর—
[অন্ধকার, শ্রে. ক.]

(২) তোমার বুকের 'পরে আমাদের পৃথিবীর অমোঘ সকাল ;
তোমার বুকের 'পরে আমাদের বিকেলের রক্তিল বিন্যাস ;
তোমার বুকের 'পরে আমাদের পৃথিবীর রাত ;
[তোমাকে, শ্রে. ক.]

(৩) তাই
লাসকাটা ঘরে
চিৎ হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের পরে

আমাদের ক্লান্ত করে
ক্লান্ত—ক্লান্ত করে ;
লাসকাটা ঘরে
সেই ক্লান্তি নাই ,
তাই
লাসকাটা ঘরে
চিৎ হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে।

[আট বছর আগে একদিন শ্রে. ক.]

উপরোক্ত দুটি রীতিই এ-যুগের অন্য কবিরাও অনুশীলন করেছেন। সংলাপী বাক্‌ভঙ্গীতে পরবর্তী কবিরা জীবনানন্দকে বহুলাংশে ছাড়িয়ে গেছেন। তার কারণ জীবনানন্দের দেখার মধ্যে একটি স্বপ্নদৃষ্টি ছিল, তাতেই কিছুটা নর্ম জীবন থেকে, তার আটপৌরে ভাষা থেকে কিছুটা রোমান্টিকতার দূরত্ব সৃষ্টি করে।

এ-যুগের অপর বৈশিষ্ট্য, বিশদ বর্ণনার পরিবর্তে টুক্‌রো ছবির চলচ্চিত্র সৃষ্টি। ছোট বাক্যাংশ, তার থেকেই পাঠক মনে ছবিটি ফুটে উঠবে। জীবনানন্দ কম ব্যবহার করলেও এ আঙ্গিক একেবারে বর্জন করেননি। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে,—

একটা অদ্ভুত শব্দ।
নদীর জল মচকা ফুলের মতো লাল।
আগুন জ্বললো আবার—উষ্ণ লাল হরিণের মাংস তৈরী হয়ে এলো।
নক্ষত্রের নীচে ঘাসের বিছানায় বসে অনেক পুরোনো শিশির
ভেজা গল্প,
সিগারেটের ধোঁয়া ;
টেরিকাটা কয়েকটা মানুষের মাথা ;
এলোমেলো কয়েকটা বন্দুক—হিম—নিস্পন্দ নিরপরাধ ঘুম।

[শিকার, শ্রে. ক.]

এই কবিই প্রয়োজন মতো কত দীর্ঘ যৌগিক বাক্য ব্যবহার করেছেন, তার মাঝে ছোটবড়ো অনেকগুলি বাক্যাংশ গেথে, তাও লক্ষণীয়। একটি উদাহরণ তোলা যেতে পারে,—

নরম ধানের গন্ধ—কলমীর ঘ্রাণ,
হাঁসের পালক, শর, পুকুরের জল, চাঁদা সরপুটিদের
মৃদু ঘ্রাণ, কিশোরীর চাল-ধোয়া ভিজে হাত—শীত হাতখান,
কিশোরের পায়ে দলা মুথা ঘাস,—লাল লাল বটের ফলের
ব্যথিত গন্ধের ক্লান্ত নীরবতা—এরি মাঝে বাংলার প্রাণ :
আকাশে সাতটি তারা যখন উঠেছে ফুটে আমি পাই টের।

[আকাশে সাতটি তারা, রূপসী বাংলা]

এ-সব বৈশিষ্ট্য নিয়েও জীবনানন্দের ভাষাবিন্যাস সুবোধ্য। রবীন্দ্র-বাক্-বিন্যাসে অভ্যস্ত পাঠক এ রীতির কবিতা পড়তে অসুবিধা বোধ করবেন না। চিত্রকল্পের চমক্ বা স্বপ্নময়তা পৃথক প্রসঙ্গ। সুধীন্দ্রনাথে যে ভাষা অতিকাঠিন্যের দোষে দুষ্ট মনে হয়, জীবনানন্দে সে ভাষা নম্র স্নিগ্ধ। তরুণতর কবিরাও বোধ হয় সেকারণেই জীবনানন্দের রচনাভঙ্গীর দ্বারা অনেক বেশী প্রভাবিত।

বুদ্ধদেব বসু পরিণত স্তরে পৌঁছেও বাক্-গ্রন্থনায় একটি দীর্ঘদিনের আয়ত্ত ভঙ্গি ছাড়তে পারেননি, হয়তো বা ছাড়তে চাননি। এটিই আয়াসলব্ধ তাঁর কবিভাষা বলা যেতে পারে। প্রথম একটি উদ্ধৃতি দিয়ে, তারপর বিশ্লেষণের সাহায্যে সেই ভাষাভঙ্গীটি ধরার চেষ্টা করা যেতে পারে।—

সমাপ্ত চাঁদের মতো, স্থির
অথচ, স্বর্গীয়
গতির দ্যোতনা যাকে ধীরে এনে দেয়
আমাদের জানালায়, ঝাউবনে পার্কের বেঞ্চিতে :
এবং সুদূর—
যারা কাঁদে, ঝগড়া করে, ক্লান্ত হয়,
কুঁজো পিঠে সস্তার বাজারে ফেরে,
কিংবা যারা প্রাসাদের
সচিত্র গলিতে জমে ষড়যন্ত্রে,
মন্দিরের উদার অলিন্দে মাতে ষড়যন্ত্রে—
তাদের করুণা, ঘৃণা, প্রলোভনে অবিচল—দূর,
দূরতর নীলিমায়—যেন,
ইতিহাস বেলেল্লা মিছিল ছাড়া কিছু নয়,
চুন-কালি-সঙের মুখোশ ছাড়া কিছু নয়—

শুধু
ধ্রুব
অদহন দীপ্তির উদ্ভাসে
উদাসীন, স্বাধীন, অফেন
দেবতারা এখনো আছেন। [হেল্ডার্লিন, হেল্ডার্লিনের কবিতা]

প্রথম স্তবক একটি দীর্ঘ বাক্য। গঠনভঙ্গির দিকে দৃষ্টিপাত করলেই ধরা যাবে অথচ, এবং, যেন, কিংবা, শুধু, ছাড়া জাতীয় সংযোজক অব্যয়ের সাহায্যে যাদের তাদের, যারা তারা জাতীয় সংযোগকারী সর্বনামের সহায়তায় কবি সুদীর্ঘ বাক্যটিকে পংক্তি থেকে পংক্ত্যান্তরে টেনে নিয়ে গেছেন। টুক্‌রো টুক্‌রো ছবি (জানালা, ঝাউবন, পার্কের বেঞ্চি), টুক্‌রো টুক্‌রো কাজ (কাঁদে, ঝগ্‌ড়া করে, ক্লান্ত হয়), টুক্‌রো টুক্‌রো গুণ (করুণা, ঘৃণা, প্রলোভন), টুক্‌রো টুক্‌রো বিশেষণ (উদাসীন, স্বাধীন, অফেন)—সব মিলিয়ে একটি শিল্প চিত্র রচনার প্রয়াস। এতে পাঠকমনে একটি অনুভূতি, চিত্ররূপ জাগে অবশ্য, তাতে বাক্যের গাঁথুনিটা কিছুটা অমসৃণ, এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো মনে হয়। তার থেকে অর্থবোধ জাগিয়ে ছবি ফোটাতে, কবি ভাবনার সাধর্ম্য পেতে পাঠককে কিছুটা আয়াস স্বীকার করতে হয়।

এই বুদ্ধদেবের কবিতারাজ্যে প্রথম পদচারণা কিন্তু অনেকটা সাবলীল অভ্যস্ত বাক্‌রীতির সরল পথ ধরেই হয়েছিল। সেখানে নতুনের সন্ধান করেছেন ভাবনাগত বিদ্রোহে, প্রকাশরীতির নূতনত্বের প্রয়াস অনেকটা পরবর্তী কালের। প্রথম দিকে বাক্-বিন্যাস ও শব্দ গ্রন্থনায় রবীন্দ্রনাথের মতোই, বা পূর্বতন বাংলা কবিদের মতোই কিছুটা অনুপ্রাসের মোহ লক্ষ করা যায়। দু একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক,—

পঙ্কের কলঙ্ক বারি, শেফালি সৌরভ আমি রাত্রির নিঃশ্বাস [শাপভ্রষ্ট]
রক্তের আরক্ত লাজে লক্ষবর্ষ উপবাসী শৃঙ্গার কামনা [বন্দীর বন্দনা]
রমণী-রমণ-রণে পরাজয় ভিক্ষা মাগে নিতি [বন্দীর বন্দনা]
নতুন ননীর মতো তনু তব [প্রেমিক]

তাঁর প্রথম দিককার কবিতা থেকে এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা যেতে পারে। এই অনুপ্রাস থেকেও সূক্ষ্মতর ধ্বনিবোধ, অনুরণনের আকর্ষণ সেযুগে কবিকে কেমন স্বপ্নাবিষ্ট রেখেছিল তারও চমৎকারী একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে,—

কিন্তু কারে? কারে ভালবাসি?
সেকি নারী? সে কি কোনো নারী? সে কি কোনো
চিরন্তনী বন্দিনী নারীর মুখশ্রীর অসীম অমিয়,
অনির্বচনীয়, অবিস্মরণীয়?
না কি সে কবিতা? কবিতার জলন্ত কল্পনা, ছন্দের দারুণ
উন্মাদনা? বাণীর আগুন
অঙ্গে অঙ্গে, রন্ধ্রে রন্ধ্রে, রক্তের অণুতে অণুতে?

[মৃত্যুর পরে : জন্মের আগে. প্রে. ক.]

পড়তে গেলেই পাঠক এ কবিভাষার ধ্বনিময়তা অনুভব করবেন।

বুদ্ধদেবের কবিভাষায় সংলাপী নৈকট্যসৃষ্টির প্রয়াসও লক্ষণীয়। কবিতার ক্ষেত্রে ভাষা ও ভাবগত একটা পোষাকী দূরত্বের মেজাজ রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বেশ স্পষ্ট অনুভব করা যায় (ঈশ্বরগুপ্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল, গোবিন্দদাস প্রভৃতির ব্যতিক্রম দৃষ্টান্ত মনে রেখেও এ মন্তব্য করা যেতে পারে)। সুধীন্দ্রনাথও ভাষাকে সুমিত করতে গিয়ে একটু বেশীমাত্রায় কৃত্রিম কাঠিন্য দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ থেকেও সে ভাষার দূরত্ব বেশী মনে হবে। এই পোষাকী কবি-ভাষাকে আটপৌরে জীবনের ক্ষেত্রে যারা নামিয়ে এনেছেন বুদ্ধদেব তাদেরই একজন পুরোধা বলা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে পাঠক তার কঙ্কাবতী, প্রেমিক, কোনো মেয়ের প্রতি, ম্যাল-এ প্রভৃতি কবিতা পড়ে দেখতে পারেন। একটি উদাহরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে।—

একটু সময় হবে? পাশে গিয়ে বসিবো তোমার।
(মোদের বাড়িতে বড় লোকজন, বিষম বিভ্রাট,
মায়ের মেজাজ চড়া, শিশুগুলি করিছে চীৎকার)।
টবেতে ফুলের চারা তোমাদের বাড়ির সিঁড়িতে,
নতুন সবুজ পাতা নড়িতেছে ঈষৎ হাওয়ায়;
সিড়ির সুমুখে ঘর, ছোটো ঘর, ঠাণ্ডা পরিষ্কার,
শেলাই কলের কাছে ছোটো টুলে রয়েছো বসিয়া।
সুতো বুঝি ফুরায়েছে? বই খোলা কোলের উপরে,
ভিজে কালো চুলগুলি এলায়ে পড়েছে সারাপিঠে,
শাদা সেমিজেরে ঘিরি' কালো পাড় উঠেছে জড়ায়ে,
শাড়ির চওড়া পাড়, শাদা শাড়ি, মিশকালো পাড়।

১ ঠিক তব পাশে নয়—তবু কাছে, বসিবো চৌকাঠে—

একটু সময় হবে ? [কোনো মেয়ের প্রতি, শ্রে. ক.]

সুধীন্দ্রনাথের আদর্শে বুদ্ধদেব এখানে 'বসিবো' ক্রিয়াপদের ব্যবহারে ভাষার বিশুদ্ধি ক্ষুণ্ণ করেছেন।—এটুকু কৃত্রিমতা হয়তো কবি রক্ষা করতেই চেয়েছিলেন। সংলাপ দলবৃত্তে বা মিশ্র কলাবৃত্তেই ফোটে ভাল। বুদ্ধদেব অবশ্য প্রেমেন্দ্রের মতো, সুভাষের মতো সরল কলাবৃত্তেও এর পরীক্ষা করেছেন। সে আলোচনা ছন্দ প্রসঙ্গে তোলা যাবে।

বুদ্ধদেবের ভাষায় ইংরেজি-আনার মেজাজ লক্ষ করা যায়। বলাই বাহুল্য, সেটা সুখদায়ক নয়। একটি দৃষ্টান্ত তোলা যাক,—

যে-তুমি বিশ্বের প্রথম শিহরণ, আলোর জাগরণ-মন্ত্র,

অন্ধকারে যার পরশে ম'রে গিয়ে পঞ্চভূতে দিলো জন্ম—

দেবাদিদেব কাম ! করুণা করো তুমি আমার গুরু বৈরাগ্যে।

[মোহমুদ্গর, শ্রে. ক.]

অনুরূপ সপ্তমাত্রিক মেঘদূত অনুবাদ করতে গিয়েও কবি বাংলা বাক্‌রীতিকে অনেকাংশে পীড়িত করেছেন। সম্ভবত সরলকলা সাতমাত্রার পর্বে বাক্‌-রীতির স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষা তাঁর পক্ষে একটু দুরূহ কাজ। তবে সাধারণভাবে বাক্‌রীতিতে বুদ্ধদেব সুবোধ্য কবি। পাঠক তাঁর ভাষায় ততটা বিব্রত নয়, যতটা বিব্রত তাঁর অতিসাহসিক কথনে, যৌনবোধের 'অলজ্জ' প্রকাশনায়।

চল্লিশ বছর আগে অমিয় চক্রবর্তী 'একমুঠো' কবিতা ছড়িয়ে পাঠকবোধে বিস্ময়ের সঞ্চার করেছিলেন। সে পাঠকগোষ্ঠী তখন নিশ্চয়ই খুবই ক্ষুদ্র ছিল; তবু তাদের মনের তারে অমিয় চক্রবর্তীর আবেদন পৌঁছেছিল। আমাদের সাবধানী পোষাকী যে মন অনেক কিছু রেখে ঢেকে, বেশ গুছিয়ে কথা বলে, তারও গভীরে, অবচেতনায় একটি মন আছে। তারও ভাষা আছে। অনেকটা আপাত অসংলগ্ন সে ভাষা, টুক্‌রো টুক্‌রো ছবির ভাষা। সব মিলিয়ে ছবিটা গড়ে ওঠে। সেই প্রকাশ ভঙ্গীময় গহন মনের ভাষাচিত্র এখনো তাঁর লেখায় সবিস্ময়ে অনুভব করেন পাঠক। দুই যুগের দুটি দৃষ্টান্ত তোলা যেতে পারে এখানে,—

(১) ড্রেন, ধুলো, মাছি, মশা, ঘেয়ো কুত্তোর

আড্ডং বেঁধে আছ, বাঁচো (কিমাশ্চর্য বাঁচা) এবং যমের কৃপায় মরা;

অমৃতস্য অধম পুত্র, বন্দী স্যাঁৎসেঁতে গলির ঘরে ইঁদুর-ভরা;

নেই রাগ।—অবশ্য। আছ আনন্দে। খাও ভেজাল ঘিয়ের জিলিপি,
শিশু কাঁদায়, ধোঁয়ার সংসার, খুনে ওষুধের ছিপি
মা-বোনকে খাওয়াও—দয়ায় ডাক্তার অন্তিম লাগলে,
তৎপূর্বাবধি রান্নার পাকে ক'ষে ঘোরাও ; নিজে ভাগলে,
শক্ত সিনেমার সীটে, ইতর প্রাণের গিল্‌টি
ভোলায় ধিক্কার, সন্ধেটা কাটে ; তবু রাত্রে জেগে ভাবো ভাবোই
কিছু একটা হয়তো হবে, বুঝিবা কোথাও যাবো, যাবোই—
কোথাও যাবেনা গলিতেই থাকবে।

[চেতন স্যাকরা, আ, বা. ক.]

এই কবিই এখন দীর্ঘকাল দূর বিদেশের বাসিন্দা। চেতন স্যাকরার গলির পরিবর্তে এখন সব থেকে ঐশ্বর্যময়ী দেশের মানুষকে দেখছেন। তারই ছবি আঁকছেন। ভাষায় কিন্তু আশ্চর্য মিল,—

পরে পরে নয়, একসঙ্গে। ঝিরিঝিরি
চুলে ছোঁয় বন্য হাওয়া, কানে ঝাউগাছ শিরিশিরি,
কফির সুরভি, টোষ্টে মাখনের স্বাদ মধু-মেশা,
ভোর সাড়ে-সাতটার গোলাপী আলোর ঠাণ্ডা নেশা—
মুহূর্তের এই মূর্তিবহ
শরীরী চৈতন্যে বাঁধা আমার সংগ্রহ
ওডি-কলোনের গন্ধমাখা,
বন্ধু, তোমায় আজ নীলাম্বে পাঠাই দূর পাখা।
ঝগ্‌ ঝগ্‌ ট্রেন শব্দ, ষ্টেশনের শুষ্ক রোদ,
কালরাতে স্বপ্নে দেখা ডোবা বোধ,
পৌছন তবুও ফিরে-চাওয়া ;
ক্লাসে পড়ানোর ঘণ্টা ওই বাজে, ব্যস্ত হাওয়া।
লরেন্সে আমার বাড়ি, সোনার গমের কিনারায়
বিদায়-সিঁড়িতে তার এ-লগ্ন দাঁড়ায়—
(ঠিকানা এখনো সেই : ষোলো শূন্য-চার)
কলোনের স্মৃতি গাঁথা নাও উপহার॥

[১৬০৪ য়ুনিভার্সিটি ড্রাইভ, আ. বা. ক.]

অমিয় চক্রবর্তীর এই ছোট যতিভঙ্গের, তির্যক অর্থবহতার ভাষারীতি পরবর্তী তরুণেরা অনুকরণের চেষ্টা করেছেন। সর্বত্র সফল হয়েছে মনে হয় না। তার কারণ, এতটা লঘু যতিভাগের বাক্‌বিন্যাস বাংলা বাক্‌রীতির পক্ষে স্বাভাবিক নয়। কবি সম্ভবত হাল আমলের ইংরেজ-আমেরিকান কবিদের কাছ থেকে স্প্রাং রিদ্‌ম্ জাতীয় ছন্দোভঙ্গির মতো এই বাক্‌রীতিও নিয়েছেন। কিন্তু এতটা অনভ্যস্ত বাক্‌রীতিতে তরুণতর কবিরা পদে পদে হোঁচট খেয়েছেন।

আলোচ্য যুগের কবিগোষ্ঠীর মধ্যে ভাষাভঙ্গিতে প্রেমেন্দ্র মিত্রই সম্ভবতঃ সবচেয়ে সুবোধ্য ; পুরোনোদের চিহ্নিত পথেই তার অভ্যস্ত পদচারণা। 'হে-ইডি, হাইডি, হা-ই' (নীলকণ্ঠ) জাতীয় দুএকটি বিজাতীয় বাক্য-বুলি তার কবিতার মেজাজে ধরতে চাইলেও, বা এ-যুগের অপর কবিদের মতো মাঝেসাঝে একই বাকপর্বিক পুনরাবৃত্তি, চলিত ক্রিয়াপদের প্রয়োগ ইত্যাদির পরীক্ষা করলেও তার আসল মেজাজ অভ্যস্ত তরুণ বাঙালী-আনার। সত্যেন্দ্র-নজরুল ধারার উত্তর সাধকরূপে কবিতারাজ্যে তাঁর আবির্ভাব, পরিচিত রোমান্টিকতায় তার পরিণতি। তবে অনুবাদ কবিতায় তার এই সাবলীল বাক্‌রীতি অনেক সময় ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সেখানে যেন ইংরেজি যৌগিক বাক্যের দূর-সংলগ্ন পর্ববিন্যাসের প্রভাবে পড়েছেন। যেমন,—

> ঐন্দ্রজালিক আঁখি দাও মোরে ; দেখি নয়ন,
> —উতরোল নদী জীবন্ত হ'ল মাঝারে মোর ,
> স্ফটিক দারুণ।
>   যাহা কিছু পরিদৃশ্যমান,
> তারো চেয়ে যাহা কল্পনাতীত ; অবাস্তব !
> আত্মা হইতে করো বিভক্ত . হেরিব মোর
> রুধিরস্রাবী ক্ষতমুখ-সম যত-না পাপ,
> দুঃসাহসিক জীবন-স্পন্দ !
> নিজেরে যাহে,
> উদ্ধার করি. পথের অচেনা পথিকে যথা।

[বিস্ময়, প্রে. ক.]

বুদ্ধদেবে এই বাক্‌রীতি অনেকটা মজ্জাগত। প্রেমেন্দ্রে এটা নিতান্তই ধারকরা বেমানান মনে হয়।

রবীন্দ্রোত্তর কবিতার নতুন জগত সৃষ্টিতে সচেতন প্রয়াসী কবিদের মধ্যে বিষ্ণু দে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে তার এই প্রয়াস যেন কিছুটা কৃত্রিম মনে হয়। শব্দ নির্বাচন প্রসঙ্গে তার এই অতিপ্রয়াসী মনোভাবের অনেকটা পরিচয় পেয়েছি। বাক্‌বিন্যাসের ক্ষেত্রেও একই মানসিকতা পরিস্ফুট হয়েছে। তার 'অম্বিষ্ট' ভাষারীতি বিষয়ে কবি নিজেই মন্তব্য করেছেন,

রেখোনা বিলাসী কোনো আশা,
নববাবু ভাষা ছাড়ো মন।
অথবা মিলাও সে কূজন
সাঁওতালী ধনুকের টানে টানে ঝনন্‌-রণনে
লাঙলের ফলায় ফলায় সুতীব্র স্বননে,
সাবেক নূতন ছন্দে মেলাও সে নাচ
গ্রামে ও শহরে পাবে কবিতার ভাষা॥

[ভাষা, স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ]

কথ্য সংলাপী এই গ্রাম ও শহরের ভাষার সন্ধানে কবি যেমন কিছু কিছু বাংলা ইডিয়মের প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছেন, তেমনি তথাকথিত শিক্ষিত সমাজে প্রচলিত সংস্কৃত, ইংরেজি বুক্‌নিকেও কাজে লাগিয়েছেন। যেমন—

কী উল্লাস! কোটালের বান! হই আগুয়ান।
এইবার দাদা ছাড়বো বোনাস্‌। [জন্মাষ্টমী, শ্রে. ক.]

ভাবো কি, কস্মৈ দেবায়
হবিষা বিধেম? [জন্মাষ্টমী, শ্রে. ক.]

লেনিনের চিঠি পড়েছো, রিমার্ক
এব্‌ল্‌ ইন্‌
টারেষ্টিং। [জন্মাষ্টমী, শ্রে. ক.]

সংলাপী আমেজ মেশানো দু একটি বিশুদ্ধ বাংলা নমুনা তোলা যাক,—

কোথায় তুমি? ট্রেন তো এল!...
তোমার কি অসুখ হল?
তোমার বাবার?
হঠাৎ দেখি লাব্‌সি,
বললে, এই যে, কি খবর,

আমার জন্যে এলেন নাকি ?
দিদি আসবে সাতুই। [টপ্পা ঠুংরি, চোরাবালি]
দারোগা সাহেব
একী সুখবর বদ্‌লি হলেন !
এক পয়সায়
তিনি কিনতেন মুরগি ও ডিম,
দারোগা সাহেব ছাড়া আর কেবা
এক পয়সায় বাজারে কিন্‌তো কাপড় [ছত্রিশগড়ী গান, শ্রে. ক]

বিষ্ণু দে'র প্রথম দিককার লেখায় একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি হল, পুরোনো কবিদের পরিচিত কবিতার ভাষা ভঙ্গিকে অনুসরণ—এবং তারই মধ্যে হালফ্যাসানের চিত্রাঙ্কন। একধরণের বিদ্রূপাত্মক মেজাজের প্রতিফলন বলা যেতে পারে। এই ভঙ্গি একটু পরের যুগে সমর সেনও বিশেষ কাজে লাগিয়েছেন। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক,

ভস্ম অপমানশয্যা ছেড়ে, পুষ্পধনু।
দিকে দিকে ঘুরে বেড়াও ডনজুয়ানের বেশে !
[শিখণ্ডীর গান, চোরাবালি]

পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছে এ কি সন্ন্যাসী
বিশ্বময় চলেছে তার ভোজ !
মরমিয়া সুগন্ধ তার বাতাসে উঠে প্রশ্বাসি
সুরেশ সুধু খায় দেখি গ্লুকোজ ! [শিখণ্ডীর গান, চোরাবালি]

নামল সন্ধ্যা,
সূর্যদেব, এখানে নামল সন্ধ্যা,
পিলু বারোঁয়ার সন্ধ্যা,
কবিতার সন্ধ্যা [টপ্পা ঠুংরি, চোরাবালি]

এদিকে আর পঁচিশ মিনিট
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর। [টপ্পা ঠুংরি, চোরাবালি]

তার 'কবিশেখর' (চোরাবালি), 'খোঁয়ারি' (চোরাবালি) প্রভৃতি কবিতাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। দেখা যাচ্ছে ব্যঙ্গ-অনুকৃতিতেও বিষ্ণুদের মূল লক্ষ রবীন্দ্রনাথ।
ছোট ছোট ভাব যদি, দিয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো বাক্য বা বাক্যাংশের গ্রন্থনা

এ-যুগের অপরাপর কবিদের মতো বিষ্ণু দে'ও করছেন। একটি দৃষ্টান্ত তোলা যেতে পারে।—

প্রকৃতিতে মুগ্ধ হও, কারণ প্রকৃতি মনোলোভা,
ভোগ্যা শুধু, উপভোগ্যা, পরকীয়া ; ভিন্ন, বাহির সুদূর ;
অসম্বদ্ধ ; মানবিক, সামাজিক নয়। তাই নিসর্গের শোভা
দেখ, শোনো, মুগ্ধ হও, যেমনটি হ'ত ডন জুয়ানেরা
নারীর বিচ্ছিন্ন সঙ্গে, যেহেতু সে সাময়িক বিস্মৃতি মধুর।

[ঝিভাগো, শ্রে. ক.]

বাক্‌বিন্যাসে, শব্দ গ্রন্থনায় তিনিও ইংরেজি পদবিন্যাস রীতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। তাতে মাঝে মাঝে ভাষা অহেতুক দুর্বোধ্য হয়েছে। যেমন,—

প্রকৃতিতে মিলে থাকে আলো অন্ধকার
চক্রে এক অনাদ্যন্ত, বোধ্য দুর্বোধ্যের অতীত
স্ত্রীপুরুষ থাকে যথা, উভয়ত সম্বন্ধে একক
জৈববিশ্বে অপঘাত ও স্বভাবে নিয়ত, আদি অন্তহীন,
সমষ্টি ব্যষ্টির শত শত আপতিক জৈব সমাধানে।

[বহুবড়বা, নাম রেখেছি কোমল গান্ধার]

একটি বিশেষ বোধ বা ছবিকে মনের গভীরে অঙ্কিত করবার উদ্দেশ্যে এ-যুগের অন্য কবিদের মতো বিষ্ণু দে'ও একটি ছোট বাক্য বা বাক্যাংশকে বারবার এক কবিতার মধ্যে ফিরিয়ে এনেছেন। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক,—

বৃষ্টি পড়ে
পাতায়-পাতায় দগ্ধ পথে গলা পিচে ইটে
বৃষ্টি পড়ে আকাশে মাটিতে
মনের মাটিতে বৃষ্টি পড়ে ছাতে ও ছাতায়
ভিতের মাথায় ভিতে বৃষ্টি পড়ে
বাংলায় ভারতেও বুঝি
দগ্ধ দিনে বৈশাখীর বৃষ্টি পড়ে
ঈশান হাওয়ায় পড়ে, ঝড়ের শান্তিতে পড়ে
বৃষ্টি পড়ে জলস্রোতে থানায় ডোবায়
বৃষ্টি পড়ে

বিষ্ণু দের ভাষাগত আর একটি বৈশিষ্ট্য হল, মাঝে মাঝে বাক্যের দাঁড়ি কমা ইত্যাদি ভাবসূচক চিহ্নের বিলুপ্তি। এতে বাক্যের অর্থবোধে অনেক সময় পাঠককে বিব্রত হতে হয়। অনেক সময়, স্তবক সীমা পেরিয়ে, হয়তো এক ভাববৃত্ত পেরিয়ে অপর ভাববৃত্তে পৌঁছেও (উভয় ভাববৃত্তের মাঝে × × চিহ্ন দিয়েছেন, দুই স্তবকের মাঝে পংক্তি ব্যবধান বেশী দিয়েছেন) বাক্যের যতিসূচক কোনো চিহ্ন দেননি। এ-প্রসঙ্গে প্রতীক্ষা (শ্রে. ক.) কবিতাটি দ্রষ্টব্য। প্রবন্ধের পরিসর বৃদ্ধির ভয়ে আর উদ্ধৃতি তোলা হল না।

তরুণতর কবিদের মধ্যে প্রথমেই সমর সেন এবং তারপরই সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে মনে পড়বে। ১৯৩৪—১৯৪৬, সমর সেন মাত্র এই একযুগের কবি। গত দীর্ঘ বাইশ / তেইশ বছর, অর্থাৎ ভারতের ইংরেজ অধিকার মুক্তির পর থেকে তিনি আর কবিতা লিখছেন না। যে কোনও প্রতিভাবান কবির পক্ষেই এটি আশ্চর্য সংযমের পরিচায়ক। সমর সেন সহজ স্পষ্ট ভাষায় কথা বলতে ভালবাসেন। তাঁর বাক্‌বিন্যাসে গঠনরীতির কোনও জটিলতা নেই। তাঁর বৈশিষ্ট্য হল, তির্যক ভঙ্গিম ব্যঙ্গে, সত্যের নগ্ন তীক্ষ্ণ উদ্‌ঘাটনায়। তিনি কলকাতার standard কথ্য ভাষায় লিখেছেন, মাঝে পূর্বসূরীদের সুপরিচিত কবিতা পংক্তি উদ্ধার করেছেন, বিষ্ণুদের মতো। তাতে পুরোনো রোমান্টিকতা বা বিশ্বাসবোধকে কিছুটা বিদ্রূপ করে তার যুগের উপলব্ধ সত্যকে বৈপরীত্যে ফুটিয়েছেন। যেমন,—

> কত দিন, কত মন্থর দীর্ঘ দিন,
> কত গোধূলি-মন্দির অন্ধকার,
> কত মধুরাতি রভসে গোঙায়নু
> আজ মৃত্যুলোকে দাও প্রাণ
> দূর সমুদ্র থেকে ভেসে আসে
> বিষণ্ণ নাবিকের গান।

এখানে বিদ্যাপতির ব্রজবুলি পংক্তিটি লক্ষণীয়। আর একটি কবিতায় লিখছেন,—

> যদি কোনোদিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে বসন্ত বাতাসে—
> স্কুল আর কলেজ হল শেষ, ক্লাইভ ষ্ট্রিট জনহীন,
> দশটা-পাঁচটার দীর্ঘশ্বাস গিয়েছে থেমে,
> সন্ধ্যা নামল :

মাঝে মাঝে সবুজ গাছের নরম অপরূপ শব্দ,
দিগন্তে জলন্ত চাঁদ, চিৎপুরে ভিড় ;
কাল সকালে কখন সূর্য উঠবে !
কলেরা আর কলের বাঁশি আর গনোরিয়া আর বসন্ত
বন্যা আর দুর্ভিক্ষ
শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ [নাগরিক, স. ক.]

এখানে রবীন্দ্রনাথের দুটি কবিতাকে এবং উপনিষদের একটি বিখ্যাত শ্লোককে (যেটি আবার রবীন্দ্রনাথই আমাদের কাছে সুপরিচিত করেছেন) স্মরণ করেছেন।

একটি বিশেষ অনুভূতি বা ছবিকে মনে গেঁথে দেবার জন্য বিশেষ বাক্যাংশের পুনরাবৃত্তি সমর সেনও করেছেন। যেমন, 'একটি রাতের সুর' কবিতায় 'বাতাসে ফুলের গন্ধ' বা 'তুমি যেখানেই যাও' কবিতার 'তুমি যেখানেই যাও' কথাটি। 'চার অধ্যায়' কবিতায় এমন দুটি বাক্যাংশ রয়েছে, 'দিন নেই, রাত নেই, বারে বারে চমকে উঠি', এবং 'এখানে শিগ্‌গিরই বসন্ত নামবে / সবুজ উদ্দাম বসন্ত।' এমন আরও কিছু কবিতার কিছু পংক্তির নাম করা যেতে পারে।

সমর সেন কিছুটা বিবৃতি ধরণে পরস্মৈপদী বা ভাববাচ্যে কথা বলতে ভালবাসেন। দু একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।—

কাঁচা ডিম খেয়ে প্রতিদিন দুপুরে ঘুম,
নারী ধর্ষণের ইতিহাস
পেস্তাচেরা চোখ মেলে প্রতিদিন পড়া
দৈনিক পত্রিকায়। [ঘরে বাইরে, স. ক.]

কলেজ ছুটি হল :
কিন্তু মন্থর ক্লান্ত বিকেলে বাড়ি ফিরে কি হবে ?
আকাশের সীমান্তে মেঘের নীল গাম্ভীর্য,
এখনি বৃষ্টি নামবে ;
ছেলে বেলায় জলে ভেজার অদ্ভুত আনন্দ
এখন আর নেই,
আর এখন বাড়ি ফিরে কি হবে ?

তার চেয়ে ভালো
কাছাকাছি কোনো বন্ধুর আড্ডা, কোনো হস্টেল,
সেখানে উত্তেজনাহীন অশ্লীলতায়
কাটুক একটি সন্ধ্যা। [ঝড়, স. ক.]

এ-যুগের অন্যান্য কবিদের মত সমর সেনও ছোট ছোট যতিভঙ্গে বাক্য গ্রন্থনা করেছেন। নানা চিত্রের সমাবেশ ঘটেছে।

পাণ্ডব বর্জিত দেশ।
সকালে বৃষ্টি, বিকেলে মন্ত্রী
হাট নষ্ট। [স্থানীয় : ফ্লাড রিলিফ, স. ক.]

নীলচে চোখ, তুঙ্গ বুক, উরুর নিরুদ্দেশ অন্ধকার,
দেহ স্বার্থের স্বর্গে আস্থা হারাই।
[নববর্ষের প্রস্তাব, স. ক.]

'খোলা চিঠি' কবিতাটিও এ-প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

যে কাজ করতে চেয়েও বিষ্ণু দে ঠিকমত সফল হননি, সুভাষ মুখোপাধ্যায় সে কাজে অনেক বেশী দক্ষতা দেখিয়েছেন মনে হয়। শহুরে মানুষের কল কারখানার কর্মীদের, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, দরিদ্র লোকজনের কথার আদলটি তিনি অনেকটা যেন ধরতে পেরেছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক,—

ঠিক সেই সময়
চোখের মাথা খেয়ে গায়ে উড়ে এসে বসল
আ মরণ! পোড়ার মুখো লক্ষ্মীছাড়া প্রজাপতি!
[ফুল ফুটুক না ফুটুক, সু. ক.]

হাতটা সরিয়ে নিননা, মশাই!
ও দাদা, একটু এগিয়ে যান—
দয়া করে,
স্যার, একটু পা রাখবার জায়গা॥
[পা রাখবার জায়গা, যত দূরেই যাই]

কে হে লোকটা? এক হাতে বোটা সুদ্ধ চুণ,
অন্য হাতে কোঁচা?
যেতে যেতে দিয়ে গেল খোঁচা?

'কী মশাই, লিখছেন না কেন ?

লিখুন ! লিখুন !' [কাল মধুমাস, কাল মধুমাস]

এ-প্রসঙ্গে তাঁর 'আশ্চর্য কলম' (কাল মধুমাস) কবিতাটিও পঠিতব্য। 'যাঁরাই কলকাতার লোকাল গাড়ীতে হকারদের 'আশ্চর্য মলমে'র প্রচার-বক্তৃতা শুনেছেন, কবিতাটির ভাষা-আঙ্গিকগত কাঠামো ধরতে পারবেন।

অমিয় চক্রবর্তীর মতো, এ-যুগের আরও অনেক কবির মতো সুভাষবাবুও টুকরো কথার ছবি সাজাতে ভালবাসেন। পারঘাটের লঞ্চফেরির যাত্রীদের একটি ছবি দিয়েছেন,—

ধানের কী দর ?
ভজ গোবিন্দ !
আসেন বাবু, ভাল হোটেল।
ভজ গোবিন্দ।
আসেন।
চা পান বিড়ি
সবেদা কলা
কাঁঠাল আম মুরগি মাছে,
জ'মে উঠেছে ফেরিঘাটের বাজার।
ঝোলানো ব্যাগ। পোট্‌লা পুট্‌লি। টিনের স্যুটকেসে
পড়ার বই,
সিঁদুর কৌটো,
মেলায় তোলা ফটো,
গলার কণ্ঠী, পুরনো তাস,
কাঁথা এবং আদালতের নথি।
নাচতে নাচতে আসছে লঞ্চ।
নাচতে নাচতে যাবে।
এপারে গিলে পুরো ছবিটা
ওপারে ওগ্‌রাবে। [পারঘাটের ছবি, কাল মধুমাস]

সুভাষবাবু ছত্রিশগড়ী-দের, বা সাঁওতাল-ওঁরাও-দের মুখের কথা তুলে ধরবার অসাধ্য পণ করেননি। গাঁয়ের লোক, ডেলি প্যাসেঞ্জার, হকার, কলতলার ঝি-বউ, শাশুড়ী-গিন্নিদের কথা তুলতে চেয়েছেন, অনেকাংশে সফল হয়েছেন।

প্রথম দিকে তার ভাষায় মার্জিত কৃত্রিম সৌন্দর্যের পালিশ ছিল, ভাবেও রোমান্টিক আদর্শবাদ ছিল। যত মানুষের মধ্যে নেমেছেন ততই সেই কৃত্রিম অলঙ্করণ ত্যাগ করেছেন, ভাষা সর্বস্তরের মানুষের কণ্ঠের সজীবতা লাভ করেছে।

আরও তরুণদের ভাষারীতি সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য মন্তব্য করবার সময় এখনো আসেনি। তারা কমবেশী পূর্বসূরীদেরই অনুসরণ করছেন। কদাচিত দুঃসাহসিক নূতনত্বের প্রয়াস করছেন। এখানে ইতস্তত: ভাবেই সংগৃহীত কয়েকটি বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক উদাহরণ তোলা যেতে পারে।—

সংলাপী ছোট যতিভাগ,—

ধড়ফড় উঠে বসি,
এক গা ঘেমেছি—
অবু ফেরে নি কি?
টর্চ খুঁজি—একি!
বালব-টা ফিউজ্ড্
দেশলাই?—সেও খালি?

[তারাচাযের স্বপ্ন, অশোকবিজয় রাহা।]

অনুপ্রাসবহুল ক্রিয়াপদের পৌনঃপুনিক ব্যবহার নমুনা,

উঠে বসলুম
সুখে হাসলুম
মনে ভাবলুম—এবার তুমি আসবে,
আবার ভালবাসবে। [মেঘবৃষ্টিঝড়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়]

বিশেষ্যের অনুপ্রাস:

হাঁটুজল বুকজল গলাজল
শান্তিজল হয়ে ওঠে নীলজল পীতজল গলাজল

[আরুণি উদ্দালক, শঙ্খ ঘোষ]

ছোট যতিভাগে প্রশ্নোত্তরের প্যাটাণ, বুহুনি,

প্যাচ কিছু জানা আছে কুস্তির?
ঝুলে কি থাকতে পারো সুস্থির?
নইলে
রইলে

ট্রামে না চড়ে—

ভ্যাবাচ্যাকা রাস্তায় পড়ে বেঘোরে। [নইলে, অজিত দত্ত]

এমন স্তবক-প্যাটার্নে কবি চারটি স্তবকে কবিতাটি শেষ করেছেন। "

একই বাক্যের আবর্তন দৃষ্টান্তও বহু কবিতায় পাওয়া যাবে। কামাক্ষী চট্টোপাধ্যায়ের 'একা' কবিতার 'তিন দিন তিন রাত্রির পর' বাক্যটি, বিরাম মুখোপাধ্যায়ের 'অন্তর্জলি' কবিতার 'রাম নাম সত্য' কথাটি এর নিদর্শন।

ধ্বন্যাত্মক বা চিত্রময় টুকরো কথার মালার দৃষ্টান্ত,—

ঝুর ঝুর ঝুর চল সমুদ্দুর। থরো থরো পাতা।
টুপ্ টুপ্ টুপ্। কাঁপা কাঁপা সুর।… …
ঝুপ ঝুপ ঝুপ। পাতা নাচা দিন। ইচ্ছার মতো
আঁকা বাঁকা জল।

[ভেজা হাতে, আসা'ফউদ্দৌলাহ্]

বলা বাহুল্য কবিতা-নিদর্শনগুলি অপেক্ষাকৃত হাল আমলের হলেও কবিরা সকলেই তরুণ নন। অজিত দত্ত বা অশোকবিজয় এখন প্রবীণের দলে পৌঁছেছেন। তরুণতর কবিরা, সাধারণভাবে বলতে গেলে, ভাষার দিক থেকে সহজবোধ্য কবি। ত্রিশের দশকে রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্তির জন্য যে আয়াসের দরকার হয়েছিল তার প্রয়োজন এখন অনেকটাই ফুরিয়েছে। বলা যেতে পারে, সুধীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব ও বিষ্ণু দে, সমর সেন এমনকি সুভাষকেও রবীন্দ্র চৈতন্যময় এক ভাষার ভূত যেন পিছনে তাড়া করে ফিরছিল। এড়াতে গিয়েও তাকে ওরা পরোক্ষে অনুকরণ না করে পারেন নি। এ-যুগের কবিরা সেখান থেকে অনেক দূরে সরে এসেছেন, অনেক স্বচ্ছন্দ হয়েছেন। মোটা-মুটিভাবে আধুনিক বাংলা কবিতার একটি কবিভাষাদর্শ এখন গড়ে উঠেছে। এবং সুখের বিষয় পাঠকদেরও সে ভাষার সঙ্গে কিছুটা পরিচয় ঘটেছে। এই কবিভাষার মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি এবারে সূত্রাকারে উল্লেখ করে বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করা যেতে পারে।

(ক) প্রথম দিকে কবিদের মুখ্য চেষ্টা ছিল, একদিকে রবীন্দ্র ভাষাভঙ্গির প্রভাবমুক্তি, অন্যদিকে ভাষার প্রকাশ শক্তি বৃদ্ধি। তার ফলে কবিরা বাহুল্য শব্দ কমিয়েছেন, সহায়ক ক্রিয়াপদ কমিয়েছেন, অর্থগর্ভ যুগ্মশব্দ, উপসর্গযুক্ত শব্দ, বিশেষণ পদ ব্যবহার বাড়িয়েছেন। সুধীন্দ্রনাথ ভাষা সংহতির পরীক্ষায় একটু আতিশয্য দেখিয়েছেন। অপর কবিরা অনেকটা মধ্যপন্থা নিয়েছেন।

(খ) পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যাবহুল দীর্ঘ বাক্যের পরিবর্তে টুক্‌রো টুক্‌রো চিত্রগর্ভ বাক্ বিন্যাস প্রবণতা বেড়েছে। এ-কাজে অগ্রণী অমিয় চক্রবর্তী। বিষ্ণু দে, সমর, সুভাষ সে পদে পদচারণা করেছেন। জীবনানন্দতেও এ রীতির নিদর্শন মিলছে।

(গ) আবার পাশাপাশি দেখা যাবে, ছোট বড়ো বাক্যাংশ (clause) সহযোগে দীর্ঘায়িত বাক্য ব্যবহার প্রবণতাও এ যুগেই বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ উভয় কোটিতেই ভাষার পরিধি কবিরা বাড়াতে চেয়েছেন।

(ঘ) কবিরা যথাসম্ভব সর্বস্বীকৃত চলিতভাষাস্তরে নেমে এসেছেন। সেখানেও আবার নানা সমাজস্তরের কথ্য ভঙ্গিটি তুলবার পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। অবশ্য অনেক কবি রবীন্দ্রনাথের মতোই কবিভাষায় চলিত সাধুর মিশ্রণ ঘটিয়েছেন, তবে প্রবণতা চলিত বিশুদ্ধির দিকে।

(ঙ) ভাষাতে সংলাপী মেজাজ বেশী এসেছে। মুখের কথার আদল ফোটানোর উদ্দেশ্যেই কবিরা এতটা আটপৌরে ভঙ্গি এনেছেন।

(চ) পাশ্চাত্ত্য কবিতা আঙ্গিকের সঙ্গে পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ হবার ফলে ভাষায় ইংরেজি বাক্ রীতি কিছুটা এসে পড়েছে। তাতে অনেক সময় বাংলা বাক্‌ভঙ্গির মেজাজ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। বুদ্ধদেব, বিষ্ণু দের লেখায় অনেক সময় সেটা ধরা পড়ে।

(ছ) গল্প-প্রবন্ধের ভাষা থেকে কবিতার (পদ্য ও গদ্য উভয় রীতিতেই) ভাষার পার্থক্য সম্পর্কে প্রায় সব কবিই সচেতন ছিলেন। ধ্বনি অনুপ্রাস, সূক্ষ্মতর অনুরণন, ক্রিয়াপদের স্থান পরিবর্তন ইত্যাদির সহায়তায় এই কবি-ভাষার বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়েছে।

(জ) প্রথম বিদ্রোহের ঝোঁকে বিশ-ত্রিশের দশকে কবিরা যতটা রবীন্দ্র বিরোধে মেতেছিলেন এবং পরোক্ষে রবীন্দ্র ভাষাভঙ্গির কক্ষপথে কিছুটা ঘুরপাক খাচ্ছিলেন, পরবর্তী যুগে, রবীন্দ্র তিরোধানের পর ধীরে ধীরে সেই ঝোঁক কমে গিয়েছে। নানা প্রচেষ্টার ভেতর দিয়ে প্রতিভাবান কবিদের হাতে এ-যুগের নব কবিভাষার মানও গড়ে উঠেছে। সে ভাষা এতদিনে মননশীল পাঠকদের স্বীকৃতিও লাভ করেছে। নেতিধর্মী মেজাজ কাটিয়ে বাংলা কবিতার ভাষা এখন স্পষ্ট অস্তিত্বের মাটি স্পর্শ করেছে।

বাক্‌রীতি বিষয়ক আমাদের আলোচনা এখানেই শেষ করা গেল। তৃতীয় ও চতুর্থ প্রবন্ধে যথাক্রমে চিত্রকল্প ও ছন্দশিল্প সম্পর্কে পরিচয় লাভের চেষ্টা করা যাবে।

সমাজ-বাস্তববাদী সাহিত্যের মূলসূত্র

নগেন দত্ত

॥ ৩ ॥

সাহিত্যের যে অংশে সমাজ পুরোপুরি বাস্তবানুগ প্রতিফলিত না হয়েও মানব কল্পনা সৃজনশীল হয়েছে, সমৃদ্ধশালী হয়েছে, সে অংশটি রূপকথার রঙীন রসে পরিপূর্ণ। প্রকৃত কল্পনা বিস্তার সেখানে ব্যাহত হয়নি, তার কারণ তখন সমাজের শ্রেণী শোষণের যাঁতাটা পুরোপুরি কাজ করতে পারেনি। তখনকারকালের সমাজ নেতৃত্বের শ্রেণী শোষণের যাঁতাটা পুরোদমে চালু না করতে পারার বোধ হয় একটি বিশেষ কারণ ছিল, তাকে যৌথ শ্রমের ব্যবস্থা বলা যেতে পারে। অর্থাৎ শ্রমটি ব্যক্তির বা কোন বিশেষ গোষ্ঠীর সুখ-সুবিধার জন্য ব্যবহারের তেমন সুযোগ ছিল না। ফলে এমন একটি সহজাত রসের আসর সৃষ্টি হয়েছিল যাতে সবাই আনন্দ পেত। এবং শ্রোতারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে একই বক্তার গল্প রস গ্রহণ করত। প্রকৃতির পরিবেশে গাছ-পাথর-পাখী সবই যেন বাঙ্ময় হয়ে উঠত। আইসল্যাণ্ডের লোকদের বিশ্বাস ছিল যে, পাখীর ভাষা বুঝতে হলে জিভের তলায় বাজপাখীর জিভ রেখে চলতে হয়। যতদিন রূপকথার মাঝে পশুপাখী, গাছ-পাথর, নদী, উপাদান হিসেবে রসের জোগান দিচ্ছিল তত দিন সমাজের শ্রেণী-বিন্যাস ধরা পড়েনি। এবং বোঝা যায় মানব মনে শোষণের তীব্রতাও তখন বৃদ্ধি পায় নি। কিন্তু যেদিন থেকে শ্রেণী এলো, সমাজে শ্রমবিন্যাস ব্যবস্থা এলো, সেদিন থেকেই উপকথায় রাজার পুত্তুর, মন্ত্রীর পুত্তুর এলো। এবং এই 'পুত্তুরেরা' এসেই রূপকথার চেহারা বদলে দিলো।· রূপকথা সাহিত্যের মধ্যে এক ওপর তলার ছায়া পড়ল। কিন্তু এর মধ্যেও প্রকৃত বাস্তবের কিছুটা আছে। Problems of Soviet Literature সম্বন্ধীয় বক্তৃতায় গর্কী

বলেছেন, ' In idealizing the abilities of men, and having as it were', a premonition of their mighty future development, mythology was, fundamentally speaking, realistic. Beneath each flight of ancient fancy it is easy to discover the hidden motive and this motive is always the labour. It is obvious that this striving originated among men who had to perform physical labour." আমাদের দেশের বহু রূপকথার গল্পে ষড়যন্ত্রের উল্লেখ আছে! এবং রাজ্য বিজয়েরকালে অস্বাভাবিক শক্তিধরেরও আবির্ভাব হয়েছে। যুগের যুগ দাসত্বের অঙ্গীকারে সম্মত হয়ে রাজ্য বিজয় মেনে নিয়েছে, রাজপুত্র শিল্পী অতি সত্বর সুরম্য প্রাসাদ গড়ে দিয়েছে; রাজ পরিবারের ষড়যন্ত্রের ফলে, বিমাতার চক্রান্তে আসল রাজকন্যা ঘুঁটে-কুড়ানীর বেশে দিনাতিপাত করেছে। এবং দেখা যায়, অসম্ভব দৈহিক শ্রমের গ্লানি থেকে মুক্তি পাবার জন্য মানুষের অসাধ্য বস্তু এক শক্তিশালী দেবীর আরাধনাও শেষ বিচারে সত্য প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ কুচক্রীর বিনাশ ও আসল সত্যের প্রকাশ। এই যে অসম্ভব শক্তির কল্পনা সবই সেই striving of men to lighten the labour" অর্থাৎ মানুষের শ্রম লাঘবের চেষ্টা।

"Social and cultural progress develops normally only when the hands teach the head, after which the head, more grown more wise, teaches the hands, the wise hands once again, this time even more effectually promote the growth of the mind." (Problems of Soviet Literature—Gorky.)

সমাজ জীবনে এই যুগে লিখিত ভাষার বা সাহিত্যের তেমন কোন প্রভাব ছিল না বলে মনে হয়। কিন্তু একটা ব্যাপক শ্রমবিন্যাসের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল এটা বেশ বোঝা যায়। ঠিক এই যুগেই রূপকথা তার আসন মেহানতী মানুষের মনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিল। কেননা রূপকথায় যেমন পরীর গল্প আছে তেমন আবার সাপের গল্প, বাঘের গল্প, পাখীর গল্প সবই স্থান পেয়েছে। শিকার সন্ধানের যুগে এই সব প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে মেহনতী মানুষকে চলতে হয়েছে। তাছাড়া ধর্ম সংস্কারও যখন এসেছে তখনও মেহনতী মানুষ তার মত করে দেবতাদের চরিত্র সৃষ্টি করেছে। আমাদের দেশের লোকগাথায় বুড়ো শিবকে চাষের

ক্ষেতে নিয়ে তাকে দিয়ে চাষ-বাসের ব্যবস্থা হয়েছে। এই সব ছড়া, গল্প, লেখাকথা—সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রেণীবিন্যস্ত নাগরিক সমাজ থেকে অনেক দূরে যারা বাস করত, তারাই শুধু এর রস উপভোগ করত। অতএব এর সঙ্গে আদিকালের সমাজ বাস্তবতার একটা নিকট সম্বন্ধ রয়েছে। শুধু মাত্র এদের মধ্যে শ্রেণী দ্বন্দ্বের মনোভাব সূত্রপাত হয়নি। সে অনেক পরের আন্দোলনের কথা, পরে আলোচিত হবে। কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে ধর্মবিশ্বাসে আপনজন জেনে কিভাবে শ্রেণী সহানুভূতি জাগে এবং তা সাধারণ পাঁচালীগাথায় কতটা স্থান পায় তারই একটি দৃষ্টান্ত এখানে রাখব। আমাদের দেশের সত্যনারায়ণের পাঁচালীতে এমন দৃষ্টান্ত মেলে। শোষণের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যই, প্রত্যক্ষ দুঃখ থেকে রেহাই পাবার জন্যই মানুষ আবিষ্কার করেছে। অর্থাৎ কোন একটি শোষিত মানুষের মনে হল যে তার দেবতার শক্তি নেই। সেই শক্তি অন্য কারুর মাঝে প্রবল পরাক্রমে আত্মপ্রকাশ করুক এবং সেই শক্তি দুঃখের কারণ শোষককে শায়েস্তা করুক অথবা আমার প্রত্যক্ষ দুঃখ হরণ করুক। এই দাবী ও মনোবেদনা প্রতিটি দুঃখভোগীর অবচেতন মনে থাকে। যে কালে ব্যক্তিকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ও নিরপেক্ষ বলে ভাবা হত, সেকালেই তথাকথিত ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন মানুষের আবির্ভাব হত, তিনি পরবর্ত্তী কালে হতেন অবতার!

তিনি অবতার হয়ে সমস্ত জাগতিক দুঃখের (অর্থাৎ খাওয়া-পরা ইত্যাদির) হাত থেকে রেহাই দেবেন, এই ছিল সমাজ-চেতনা-বিহীন মানুষের অবস্থা। মানুষ যখন অন্যকে শোষণের পাত্র হিসেবে ব্যবহার করত লাগল তখন থেকেই একটি শ্রেণীর বিরুদ্ধে, একটি পরাক্রমশালী শ্রেণীর বিরুদ্ধে অদৃশ্য ভগবানের কাছে অভিযোগ চলতে লাগল। এই অভিযোগ যুগে-যুগে বিভিন্ন রূপে এসেছে। এদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবে এই অভিযোগ কিরূপ নিয়েছিল দেখা যাত। লিখিত ভাষার যুগেই পাঁচালীর রূপ নিয়েছে বটে, তবুও এতে প্রকৃত সমাজ নৈরাশ্যের পরিষ্কার ছবিটি ফুটে উঠেছে। এবং সে নৈরাশ্য খাওয়া-পারার অভাবের জন্য। সত্যনারায়ণের পাঁচালীতে আছে

"মহা প্রভু গোবিন্দে মহিমা অপার
কাল পাইয়া সেই পূজা করিল প্রচার ॥
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রূপে ধরিয়া কপটে।
বসিলেন গিয়া প্রভু জাহ্নবীর তটে ॥"

এমন সময় সেখানে আর একটি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ এলেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কৃপায় গঙ্গা এবং ব্রাহ্মণ সমাজে যে শোষণের ভূমিকা নিয়েছিল তাতে ভিক্ষাবৃত্তি একটি মহৎ বৃত্তি বলে প্রচারিত হয়েছিল। বৈষ্ণব সমাজে যারা মাধুকরী বৃত্তি নেবে তাদের ভিক্ষা একমাত্র সম্বল। বৌদ্ধ যুগেও ভিক্ষা ধর্মীয় মহিমা লাভ করেছিল। আসলে এই ভিক্ষাবৃত্তি সমাজব্যবস্থা শোষণের একটা ফল মাত্র, তা অনেকেই স্বীকার করেননি। প্রথমে হয়ত ধর্মের নামে যৌথ চাঁদা আদায় হিসেবে এ বৃত্তি ব্যবহার হয়েছিল। পরবর্তীকালে অর্থ দীনতার দায় হয়ে দাঁড়াল সমাজের এক মহা ব্যাধি। সে যাই হোক। এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ গঙ্গা তীরে এলেন। আর একদিকে ব্রাহ্মণবেশী গোবিন্দের সঙ্গে সেই ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ হল।

> "হেথায় আসিল এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ।
> গোবিন্দ বলেন প্রভু কোথা আগমণ ॥
> ব্রাহ্মণ বলেন গোঁসাই কি জিজ্ঞাস মোরে।
> আমা হেন দু'খী নাই ভুবন সংসারে।"

কথা ঠিকই যদি ভিক্ষে করে সংসার চালাতে হয় দুঃখী হতে হবে বই কি। কিন্তু এর মধ্যে ধর্মের মহিমা ও অস্বাভাবিক শক্তিধরের কথা কোথা থেকে এলো? কিন্তু ভগবানের অথবা সেই অসীম শক্তিধরের করুণা নাহলে ত কিছু হবার উপায় নেই। সেই ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ নিজের দুঃখের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলছেন।

> "আপনি আর ব্রাহ্মণী পেরে আর কেহ নাই।
> দরিদ্র করিয়া মোরে স্থজিলা গোঁসাই ॥
> সর্ব্ব দিন ভিক্ষা করি না পোষে উদর।
> নিবারণ নহে ক্ষুধা পোড়ায় অন্তর ॥"

এবার বিশ্লেষণ করে দেখুন। ব্রাহ্মণ বেশে স্বয়ং গোবিন্দ আছেন। তারপর এলেন আর এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ। তার দুঃখ (মানে খাওয়া-পরার অভাব) লাঘবের জন্য গোবিন্দ নিজ মূর্তি ধরলেন। তার নাম হল সত্যনারায়ণ অবতার। সত্যনারায়ণের পুজাও প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তার (ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের) সব দুঃখ অপহৃত হল। একেবারে বৈদ্যুতিক বাতিতে টিপ আর আলোর ঝরণা—এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এই অস্বাভাবিক অচিন্ত্যনীয় ঘটনা সবই কিন্তু সেই শোষণের হাত থেকে রেহায় পাবার জন্য।

গর্কী বলেছেন, গল্পে পুরাণে দেখা যায় ভগবান সহধর্মী ও সহকর্মীরূপে দেখা দিয়েছেন মেহনতী মানুষের কাছে।

"God, in the conception of primitive man was not an abstract concept, a fantastic being, but a real personage, armed with some implements of labour, master of some trade, a teacher and fellow workmen."

যে দৈহিক শ্রমের কথা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, তা যেমন সমাজ-জীবনকে গঠন করেছে, তেমন আবার সাহিত্যের মধ্যে নিজস্ব স্থান করে নিয়েছে। মুখ্যত দুটি কারণে শ্রমশক্তি সমাজ বাস্তববাদী সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। একটি হল, সমাজ ব্যবস্থায় সবচেয়ে নিপীড়িত যারা-তারা জীবন-ধর্মের মাঝে শ্রমের এমন একটি উৎস খুঁজে পেয়েছে যা তাদের প্রেরণা দিয়েছে রস সৃষ্টিতে। আর একটি হল, নৈরাশ্যের কথা—শ্রমক্লান্ত জীবনে শুধুই বিফল আশার বুনুনি। সত্যনারায়ণ পাঁচালী থেকে উদ্ধৃত অংশকে অনেকটা সেই নৈরাশ্যের প্রতিফলন বলা যায়। কিন্তু নীচের উদ্ধৃত অংশকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এর মধ্যে রস সৃষ্টির প্রেরণাও আছে আবার শ্রমশক্তিকে ভিত্তি করে বিচিত্র রস বিলাসিতাও আছে। যেমন

"বৈশাখ মাসে কৃষাণ ভূমিতে দিলা চাষ।
আষাঢ় মাসে শিবঠাকুর বুনিল কার্পাস॥
কার্পাস বুনিয়া শিব গেল কুচনীপাড়া।
কুচনীপাড়া হইতে দিয়ে এলো সাড়া॥
কার্পাস তুলিয়া দিলে গঙ্গার ঠাঁই।

* * *

গঙ্গা কাটিল সুতা মহাদেব বুনিল তাত॥

মালদহে শিবের গাজন। ১৫৭ পৃঃ
বঙ্গসাহিত্য পরিচয়—দীনেশচন্দ্র সেন।

এই ছড়ার মাঝে সমাজ কর্মের যে সন্ধান মেলে তা মুখ্যত শ্রম বৈচিত্র্যের, এখন বিচার করে দেখতে হবে, এই যে, শ্রমবৈচিত্র্য তার মধ্যে কোন শ্রেণী মন আছে কিনা। সত্যনারায়ণের পাঁচালীর মধ্যে ছড়াকার যে চিত্র তুলে ধরছেন তা বিশেষ করে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিজয়ের পর লৌকিক দেবতাদের আবির্ভাবের কথা। এবং যে দারিদ্র্য ও দুঃখ মানুষ সমাজ-জীবনে ভোগ

—করছে অর্থাৎ শোষণের জন্য ভোগ করছে—তার একমাত্র প্রতিকার হল নোতুন একটি কাল্পনিক দেবতার আবিষ্কার করা এবং সেই আবিষ্কার সূত্রে ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত জীবনের বৈষয়িক সম্পদ ভোগ করা।

ঠাকুর দেবতার সমাজীকরণ (socialisation) পদ্ধতি শুরু হয়েছে দৈনন্দিন শ্রমের মধ্য দিয়ে। নিত্য দিনকার সমস্যার সঙ্গে যেমন মনের পর্দার উঁচুনীচু বিস্তারের যোগাযোগ আছে, তেমন আছে আর একটি স্পৃহা সে হল ধর্মীয় প্রভাবকে শ্রমের রসে ডুবিয়ে দেয়া। সমাজ-কর্মের সঙ্গে মানসিকতার এই যে সম্বন্ধ তা আমাদের অন্তরে অতি নিবিড় হয়ে রয়েছে। এ থেকে আমরা কতগুলো ভাষা সৃষ্টি করেছি। এবং সেই ভাষাগুলো বিশ্লেষণ করলে এর অন্তর্নিহিত ভাব সমষ্টি ধরা পড়বে। সমাজ বাস্তববাদী সাহিত্যে এই ভাষার একটি বিশেষ দান আছে এবং এরা ভাবের ক্ষেত্রেও অনেক বৈচিত্র্য এনেছে। বারান্তরে সমাজ-গঠনের সঙ্গে, সমাজ কর্মের সঙ্গে ভাষার সৃষ্টি ও সাহিত্যের বিকাশের আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

ধারাবাহিক
• উপন্যাস

স্বর্ণ-তিমির

চিত্ত ঘোষাল

॥ ৪ ॥

অলকেশ নাছোড়বান্দা। ওদের বাড়িতে একদিন না গেলে আর সে জয়ন্তদের বাড়িমুখো হবে না এমন ভয় দেখাল।

এ দাবি অলকেশ অবশ্যই করতে পারে। জয়ন্তদের বাড়িতে সে প্রায়ই আসে, গল্পগুজবে জয়ন্ত আর নন্দিনীকে মাতিয়ে রাখে, যদিও তার মতামত-গুলো অনেক সময় ওদের মনঃপুত হয় না। জয়ন্ত বা নন্দিনীরও যে অলকেশের বাড়িতে যেতে আপত্তি ছিল তা নয়। শুধু ভয় ছিল সেখানে গিয়ে তারা হয়তো ঠিক খাপ খাওয়াতে পারবে না। অলকেশ যে বাড়ির ছেলে সে বাড়িও নিশ্চয়ই তারই মত অত্যাধুনিক। আর অত্যাধুনিকতার পরিবেশে ওরা মোটেই স্বস্তি বোধ করতে পারে না। ওরা তাই নানা ছুতোয় অলকেশের নিমন্ত্রণ কেবলই পিছিয়ে দিচ্ছিল।

কিন্তু অলকেশের বাড়িতে গিয়ে অবাক হল ওরা। বনেদী মধ্য কলকাতার ছোট একখানা দোতলা বাড়ি। গলিটাও তেমন প্রশস্ত নয়। এ গলিতে সিত্রোঁ গাড়িখানাকে ঢুকিয়ে জয়ন্ত বড় লজ্জা পেল। এ যেন চোখে আঙুল দিয়ে বড়মানুষী দেখানো।

গাড়ি থেকে নেমে জয়ন্ত ড্রাইভারকে বলল—গাড়ি নিয়ে যাও।

—কখন আসব, স্যার?

—আসতে হবে না। আমরা ট্যাক্সি নিয়ে নেব।

অলকেশের মা নিরুপমা দেবী দরজা খুলে দিলেন, অলকেশ কিছু বলার আগেই বললেন—এসো জয়ন্ত, এসো মা নন্দিনী।

অলকেশের সঙ্গে তাঁর চেহারার যথেষ্ট মিল, কিন্তু সেই উগ্র উজ্জ্বল তীক্ষ্ণতা তাঁর মুখে অনুপস্থিত। শুভ্র থান পরনে, হাতে একগাছি করে সোনার চুড়ি, হাসিটি বড় সুন্দর।

জয়ন্ত আর নন্দিনী তাঁকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল, তিনি চিবুকে হাত দিয়ে ওদের আশীর্বাদ করলেন। নন্দিনীকে দেখে জয়ন্ত বুঝল সেও তার মতই আশ্বস্ত হয়েছে।

অলকেশ ইতিমধ্যে নমিতাকে ধরে নিয়ে এসেছে। নম্র, ভীরু, ছোটখাট মেয়েটি। অলকেশের বোন বলে মনেই হয় না।

নমিতা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে। পরিচয় করিয়ে দিল অলকেশ—নন্দিনী দেবী, নমিতা। দেখে যতটা নিরীহ মনে হচ্ছে আসলে ঠিক ততটাই দজ্জাল।

নন্দিনী আর জয়ন্তর মুখের পানে এক পলক তাকিয়েই মাথা নিচু করল নমিতা, তারপর নন্দিনীর হাত ধরে বলল—আপনি আসুন। বলে একরকম ছুটেই পালাল বাড়ির ভেতরে।

গলা ছেড়ে হেসে উঠল অলকেশ।

নিরুপমা বললেন—বড় লাজুক ও। জয়ন্ত, তোমরা বসে গল্প কর। আমি নন্দিনীকে নিয়ে যাচ্ছি।

অলকেশ ঠিক স্বাভাবিক হতে পারছে না। এই আটপৌরে মধ্যবিত্ত পরিবেশ কি ভালো লাগছে জয়ন্তর? নন্দিনীর? ওদের এ বাড়িতে না আনলেই ভালো হত। তাই বা হয় কি করে? দিনের পর দিন ওদের আতিথেয়তা পেয়ে আসছে। একদিন অন্তত নিজের বাড়িতে না নিয়ে এলে সেটা অসৌজন্যের চরম। তাছাড়া মা বড় পীড়াপীড়ি করছিলেন। কিন্তু মেডিওক্রিটি বরদাস্ত করতে পারে না অলকেশ। তাদের সব কিছুই মেডিও-কার। আর জয়ন্তরা মেডিওক্রিটির বহু উর্ধ্বে। পালটাতে হবে—এই বাড়ি, পুরনো ফার্নিচার, সেকেলে জীবনযাত্রা, সব আগাগোড়া পালটে ফেলতে হবে।

অলকেশের সঙ্গে তার বাড়ির পরিবেশ, মা আর বোনকে কিছুতেই মেলাতে পারছিল না জয়ন্ত। এ বাড়ির মানুষেরা, তাদের নম্রতা, পরিচ্ছন্ন শান্ত পরিবেশ তাকে কেমন উন্মনা করে দিয়েছে। এই একই পরিবেশ, শুধু খানিকটা সম্পদ যুক্ত হয়ে, একদিন জয়ন্ত আর নন্দিনীরও ছিল একান্ত আপন। মার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে সব হারিয়ে গেছে। ঠিক হারিয়ে যায় নি, বাইরের চেহারাটা একই আছে, প্রাণের স্পর্শটা খুঁজে পাওয়া যায় না শুধু। আশ্চর্য মানুষের মন। আশ্চর্য ছেলে অলকেশ। এমন ঐশ্বর্য হাতে পেয়েও মানসিকতায় সে এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

হঠাৎ খেয়াল হল অলকেশের সে বিশ্রীরকম চুপ করে আছে।

খাপছাড়া ভাবে বলে উঠল—আমরা কথা বলছি না কেন।

—আমিও তাই ভাবছি। হাসল জয়ন্ত।

অতএব কথা বলার প্রচেষ্টা চলতে থাকে। অলকেশের পক্ষে আলাপের সবচেয়ে সহজ বিষয় তার নিজের কাজ। কাজেই ফ্যাক্টরি প্রসঙ্গে তার ধ্যান ধারণা দিয়েই সে সুরু করল। তারপর শাখা প্রশাখার বিস্তারে এসে পৌছল ব্যক্তিগত অতীতে।

জয়ন্ত জানতে পারল অলকেশের ঠাকুর্দা ছিলেন বিশেষ অবস্থাপন্ন, শেয়ার মার্কেটে বিস্তর টাকা খাটত তাঁর। অলকেশের বাবাকে তিনি কনভেণ্টে রেখেছিলেন একেবারে ছেলেবেলা থেকে। যে বছর অলকেশের বাবা জুনিয়র কেম্ব্রিজ পাশ করলেন সেই বছরই ঠাকুর্দার অনিশ্চয়তার ব্যবসায় ভরাডুবি হল। রাতারাতি তিনি নিঃস্ব। কুড়িয়ে বাড়িয়ে যা পেলেন তাই দিয়ে কিনলেন এই বাড়ি। স্ত্রী আর একমাত্র সন্তানকে নিয়ে উঠে এলেন এখানে। তার দুবছর পরে মৃত্যু। কনভেণ্ট আগেই ছাড়ানো হয়েছিল, নতুন করে লেখাপড়া সুরু করার যেটুকু আশা ছিল অলকেশের বাবার তাও এখন নির্মূল। উচ্চাকাঙ্ক্ষার গোড়ায় ছাই চাপা দিয়ে চাকরি একটা জুটিয়ে নিলেন। তারপর যথারীতি মার অনুরোধে বিয়ে, ফলত এই সংসার। অলকেশের বাবা মারা গেছেন বছর আটেক। বাবার কথা বলতে বলতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল অলকেশ।

—জানেন, বাবা ওপরের দিকে তাকাতে জানতেন। অল্প মাইনের চাকরি করতেন বলে মনে দুঃখ নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু সে জন্য মনটাকেও ছোট করে ফেলেননি। ভালোভাবে থাকবার জন্য টাকা পয়সার মায়া করতেন না। ওঁর আয়ের কোনো লোক ছেলেকে স্মিথ্‌স্‌ ইংলিশ স্কুলে পড়বার কথা ভাবতেও পারে না। আমি ওখান থেকে সিনিয়র কেম্বিজ পাশ করেছি, সেণ্ট এণ্ড্রুজ থেকে বি.এ। বাবা আমাকে এ পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মিশতে দিতেন না। অন্য কোনো কারণে নয়, বলতেন, ওদের অ্যাম্বিশন বড় ছোট, কারো চাকরি, কারো একটা মনোহারী দোকান, ইউ ক্যান্‌ট্‌ বি ওয়ান অব্‌ দেম। মা বাবার একেবারে কনট্রাস্ট। মার একটা অদ্ভুত কণ্টেণ্টমেণ্ট আছে, সেটা আমার ঠিক সহ্য হয় না। বাবার উঁচু নজরকে মা ভয় পেতেন। আর বাবা বলতেন, তুমি কারো থেকে

ছোট নও, যদি চেষ্টা কর ইউ ক্যান গো রাইট আপ টু দ্য হায়েষ্ট রাং অব্ দি ল্যাডার। যদি পড়ে গিয়ে হাত পা ভাঙে, ভাঙুক। ভাত আর মুসুরীর, ডালকে জীবনের আদর্শ করার চাইতে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে থাকা কি এমন খারাপ। আশ্চর্য মানুষ ছিলেন তিনি। ছাইচাপা আগুনের মত ধিক ধিক করে জ্বলতেন। অল্প বয়েসে বিয়ে দিয়ে ঠাকুরমা বাবার সর্বনাশ করেছিলেন। স্ত্রী পুত্রের দায়িত্ব উনি উপেক্ষা করতে পারেননি। নইলে, আমার মনে হয়, হি ওয়াজ মেণ্ট ফর মাচ বিগার থিংস্।

বাবার অনুপ্রেরণায় অলকেশ দুঃসাহসী। স্বামীর মৃত্যুর পর অফিসের কয়েক হাজার টাকা নিরুপমার হাতে এল। অলকেশ বি. এ. পাশ করেছে। জমানো টাকায় বছর তিনেক চলতে পারে। নিরুপমা তাই অলকেশকে একটা চাকরি-বাকরি দেখে নিতে বললেন। এ প্রস্তাব যে আসবে অলকেশ জানত। মনে মনে সেও তৈরী হয়েই ছিল। চিঠিপত্র লিখে লণ্ডনে একটা ছোটখাট চাকরির ব্যবস্থা করে নিল, স্মিথ্স্ ইংলিশ স্কুল আর সেণ্ট এণ্ড্রুজ কলেজের রেফারেন্সে সেটা তেমন শক্ত হয় নি। পাশপোর্টের ব্যবস্থা করে মাকে জানিয়ে দিল সে বিলেত যাচ্ছে, নিচের দুখানা ঘর যেন ভাড়া দিয়ে দেওয়া হয়, বাবার অফিস থেকে পাওয়া টাকা আর বাড়িভাড়ার টাকায় দুজনের কোনো রকমে চলে যাবে যে কটা বছর অলকেশ বিলেতে থাকবে। সুরুতেই অলকেশ বলে রেখেছিল মা যেন আপত্তি না করেন, কারণ যেতে তাকে হবেই। অলকেশকে নিষ্ঠুর মনে হতে পারে, কিন্তু এই নিষ্ঠুরতা অনিবার্য ছিল। এইটুকু নিষ্ঠুর সে হতে পেরেছিল বলেই শুধু সে নিজেই নয়, নিরুপমাও ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে পারছেন।

নিরুপমা জলখাবার নিয়ে এলেন। লুচি, বেগুনভাজা, সন্দেশ, শ্বেতপাথরের বাটিতে পায়েস। নমিতার হাতে চায়ের ট্রে।

—আপত্তি করলে শুনবনা বাবা, এটুকু খেতেই হবে। নিরুপমা কুণ্ঠার সঙ্গে বললেন।

—আপত্তি করব ভাবছেন কেন, কই দিন। খাবারের প্লেটের জন্য হাত বাড়াল জয়ন্ত।

নিরুপমার খুব ভালো লাগল। অত বড় ঘরের ছেলে, ভেবেছিলেন আসছে হয়তো অনুগ্রহ করে, দুচার মিনিটে সৌজন্য সেরে বিদায়

নেবে। কিন্তু ভাইবোনের সরল আন্তরিকতায় তাঁর ধারণা পালটে গিয়েছে। নন্দিনী তাঁকে মুগ্ধ করেছে। সাজসজ্জায় ব্যবহারে কোথাও এতটুকু বড়মানুষী নেই। নমিতার মত লাজুক আর ভীরু মেয়েকেও সে আপন করে নিয়েছে এটুকু সময়ে। যে পরিবারের ছেলেমেয়ে এরা সেই পরিবারের ছায়ায় অলকেশ নিরাপদ। জয়ন্তইতো হবে ভবিষ্যতে ব্যবসার মালিক। একমাত্র ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে নিরুপমার আর দুশ্চিন্তা নেই। জয়ন্তর মত ছেলে কাউকে বঞ্চনা করতে পারে না। বিশেষ করে এ জন্যেই তিনি অলকেশকে বলেছিলেন ওদের একদিন নিয়ে আসতে। দেখতে চেয়েছিলেন তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছেলেটি ক্ষেত্র নির্বাচনে ভুল করেছে কিনা। দেশী প্রতিষ্ঠান, দেশী মালিক, তেমন আস্থা ছিল না নিরুপমার। কিন্তু এখন তিনি নিশ্চিন্ত হতে পেরেছেন।

চুপচাপ একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল নমিতা। কিছুটা সম্ভ্রম ও কিছুটা অস্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে।

খেতে খেতে জয়ন্ত বলল—ওকি, আপনি দাঁড়িয়ে কেন? বসুন।

—ওকে আবার আপনি কেন, জয়ন্ত, নিরুপমা বললেন, ও অলকেশের অনেক ছোট।

—কটা দিন সময় লাগবে, মাসিমা। জয়ন্ত হেসে বলল।

—আর দুখানা লুচি দিক?

—আজ আর পেরে উঠব না।

—তোমরা খাও জয়ন্ত, নিরুপমা বললেন, আয় নমি, নন্দিনী ও ঘরে একা রয়েছে।

চমৎকার ভদ্রমহিলা। ভারি মিষ্টি মেয়ে নমিতা। এমন পারিবারিক স্নেহের পরিবেশে আনন্দ করে খাওয়ার সুযোগ বহুদিন পায়নি জয়ন্ত। রাঙাদি আদরযত্নে ত্রুটি করেনা। কিন্তু দূরত্ব বজায় রেখে চলে, কি যেন একটা ব্যবধান সে ভুলতে পারে না। জয়ন্ত আর নন্দিনীর পছন্দ অপছন্দ প্রয়োজন অপ্রয়োজনের সব খবর রাঙাদির জানা। তাই মা বেঁচে থাকতে যে ভাবে চলত ওদের খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি, সব ঠিক একইভাবে চলেছে। শুধু অনুপস্থিত থাকে মায়ের নিবিড় আন্তরিকতা। মার এটুকুর অভাব যে কত বড় তা ওরা প্রতিদিন অনুভব করে। কিন্তু

নিরুপমা আজ জয়ন্তর মন ভরে দিয়েছেন। আজকের দিনটির জন্য মনে মনে অলকেশকে ধন্যবাদ দিল জয়ন্ত।

বিদায় নেবার সময় নন্দিনী বারবার নিরুপমাকে অনুরোধ করল ওদের বাড়িতে যাবার জন্য। নমিতা বলল—আবার আসবেন, নন্দিনীদি।

—তুমি না যেতে আর আসছি না।

—দাদাকে বলে যান। ও কোথাও নিয়ে যেতে চায় না।

—লোকের সঙ্গে গুছিয়ে দুটো কথা বলতে পারিস্ না, তোর মত বাঙালকে কোথায় নিয়ে যাব।

—দেখছেন নন্দিনীদি—

—এ আপনার অন্যায় অলকেশ বাবু, এ ভাবে আক্রমণ করলে উনি কথা বলেন কি করে। জয়ন্ত বলল।

—উনিও মাঝে মাঝে আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিয়ে থাকেন, তবে আক্রমণের পদ্ধতিটা একটু আলাদা—

—যথেষ্ট হয়েছে, নন্দিনী থামিয়ে দিল অলকেশকে, দায়িত্ব এড়ানোর জন্যে যত বাজে কথা। আমি এসে তোমাকে নিয়ে যাব, নমি।

—সে তো খুব ভালো কথা। অলকেশ প্রায় লাফিয়ে উঠল।

—কেন, কথাটা এমন কি ভালো হল? হেসে ভ্রূ বাঁকাল নন্দিনী।

—আপনাকে খুব শীগগির আরেক দিন আমাদের মধ্যে পাব—তাই।

নিরুপমা স্মিতমুখে দাঁড়িয়ে এদের কথা শুনছিলেন। জয়ন্ত আর নন্দিনী তাঁকে প্রণাম করল। ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ডে ওদের পৌঁছে দিতে এসে অলকেশ বলল—আপনাদের অনেক কষ্ট দিলাম, নন্দিনী দেবী।

কথাটা নিছক সৌজন্য নয়, যেন সত্যিই সংকোচের আভাস ছিল।

বিস্মিত হয়ে নন্দিনী শুধাল—কেন বলুন তো?

—এই পরিবেশে আপনারা অভ্যস্ত নন, তাই বলছিলাম।

জয়ন্ত কথাটা তুলে নিল—পরিবেশটা অন্যরকম হলেই বরং আমরা অসুবিধায় পড়তাম।

—আশ্বস্ত হলাম। গলায় নাটকীয়তার সুর লাগাল অলকেশ।

একটা আশ্চর্য প্রসন্নতা নিয়ে ওরা ট্যাক্সিতে উঠে বসল।

নন্দিনী জানালার ধারে বসে বাইরে তাকাল। সুন্দর প্রোফাইলে একটি মৃদু হাসির রেশ লেগে আছে। তৃপ্তির স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে পড়ল জয়ন্তর মনে।

॥ ৫ ॥

ফ্যাক্টরির দৈনন্দিন কাজকর্ম জয়ন্ত মোটামুটি বুঝে নিয়েছে। অবশ্য জটিল কোনো সমস্যার সমাধানে এখনো তার ডাক পড়েনি।

যে সুশৃঙ্খলার সঙ্গে এত বড় প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে সেই কর্মশৃঙ্খলে নিজেরও একটা ভূমিকা আছে ভাবতে ভালো লাগে। আরো বড় দায়িত্বের ভার যখন তার ওপর এসে পড়বে হয়তো তার কাজের মধ্যে সে তখন আরো তৃপ্তি আরো আনন্দের সন্ধান পাবে। যন্ত্র নিয়ে কাজ, তাই বলে সবটাই যন্ত্র নয়। সংগঠন ও পরিচালনার কাজে নিজের ব্যক্তিত্ব ও শক্তিকে অনুভব করার আনন্দ বড় কম নয়। দীপংকর ও অলকেশের উদ্দীপনার অর্থ আজ-কাল জয়ন্ত বুঝতে পারে। এটা জীবনে সব নয়, কিন্তু অনেকটা বৈকি।

আরো বেশি দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে চাইছিল জয়ন্ত। জটিল পরিস্থিতির মধ্যে নিজের যোগ্যতাকে প্রমাণ ও উপলব্ধি করার ইচ্ছাটা জোরালো হয়ে উঠছিল। সুযোগ একটা এসেও গেল। যদিও এ ধরণের সুযোগ জয়ন্তর বাঞ্ছিত ছিল না।

দীপংকর অলকেশকে নিয়ে জরুরী একটা লাইসেন্সের ব্যাপারে গিয়ে-ছিলেন ইমপোর্ট ট্রেড কণ্ট্রোলে। ফ্যাক্টরি-সুপার মিঃ লাহিড়ী অসুস্থ, অফিসে আসে নি।

জয়ন্ত নিজের ঘরে বসে কাজ করছিল।

হঠাৎ খবর এল কাস্টিং ডিপার্টমেণ্টে অ্যাকসিডেন্ট।

ছুটে গেল জয়ন্ত।

লোকটা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। মৃত ভাবা যেত, শুধু বুকের খাঁচাটা অল্প অল্প ওঠা নামা করছে। থই থই করছে রক্ত। ডান পাটা দুমড়ে থেঁৎলে একতাল বীভৎস মাংসের পিণ্ডের মত হয়ে গেছে। মেশিনের চাকার গায়ে চাপ চাপ রক্ত। চাকার ঠিক নিচেই পড়ে রয়েছে লোকটা। জয়ন্ত একবার চিড়িয়াখানায় একটা বাঘকে প্রকাণ্ড এক টুক্‌রো লাল মাংস সামনে নিয়ে বসে থাকতে দেখেছিল। দৃশ্যটার আরণ্যক চেহারা জয়ন্ত সহ্য করতে পারেনি। সরে গিয়েছিল। দৃশ্যটা আবার মনে পড়ল জয়ন্তর। গা ঘুলিয়ে উঠল। চার পাশটা ভীষণ রকম নিস্তব্ধ। নিজের হৃদপিণ্ডের দ্রুত শব্দ শুনল জয়ন্ত। লোকটার ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আশপাশের মানুষগুলের মুখের ওপর

রাখল। ঘর্মাক্ত কালো কালো মুখগুলিতে জয়ন্ত আতঙ্ক ও বেদনা দেখবে ভেবেছিল, কিন্তু দেখল পাথুরে রেখায় আঁকা ঘৃণা ও ক্রোধ।

বিশাল চেহারার একটা লোক এগিয়ে এল জয়ন্তর সামনে। রুক্ষ চুল, লাল চোখ, কর্কশ গলা, কালো পাত্‌লুন, তেল কালি মাখা খাকী সার্ট।

—দেখিয়ে সাব্, ইয়ে গলত্ ঈসাককা নহি। মশিন খরাপ থা। হাম খুদ সুপারিন সাব্‌কো বোলা কম্‌সে কম পন্‌দরো রোজ পহলে, লেকেন্ উননে কুছ্ নহি কিয়া। ঔর উস্‌কে গলত্‌কে লিয়ে ঈসাক্‌কা জান খতম হোনে চলা। ইয়ে বাত খেয়াল রাখিয়ে সাব।

—আমরা সমস্ত ব্যবস্থা করে দেব। ঈসাকের জন্য যা করা দরকার সবই করা হবে। আপনারা দয়া করে এখানে ভিড় করবেন না। জয়ন্ত বলল।

—ঈসাকের কি ব্যবস্থা হয় আমরা দেখে যেতে চাই।

—থানায় খবর দিতে লোক গেছে, পুলিশ আসুক তারপর আমরা যাব।

একটু ইতস্তত করে জয়ন্ত নিজের কামরায় ফিরে গেল। প্রথমে অ্যাম্বু-লেন্সের জন্য জরুরী ফোন করে, পরে ইমপোর্ট ট্রেড কণ্ট্রোলের অফিসে টেলিফোন করে দীপংকরকে খুঁজল। তিনি ওখান থেকে বেরিয়ে গেছেন। আপাতত অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। আগেই স্থানীয় কোনো ডাক্তারকে ডাকবার জন্য লোক পাঠিয়ে দিয়েছিল।

ফ্যাক্টরিতে একটা অশুভ স্তব্ধতা নেমে এসেছে। সাময়িকভাবে কাজ বন্ধ। এখানে সেখানে ছোট ছোট জটলা।

অ্যাম্বুলেন্স আসতে দেখে জয়ন্ত আবার গেল দুর্ঘটনার জায়গায়।

ঈসাকের অচেতন দেহটা অ্যাম্বুলেন্সে তুলে দেওয়া হল।

জয়ন্ত জায়গাটা পরিষ্কার করে ফেলার আদেশ দিল। সেই বিশাল চেহারার লোকটি জটলার মধ্য থেকে এগিয়ে এল—নহি, রহনে দিজিয়ে।

দীপংকর ও অলকেশ ফিরে আসার আগেই থানা থেকে একজন অফিসার দুজন কনস্টেবল নিয়ে এসে পড়ল।

শ্রমিকরা অফিসারকে সোজা নিয়ে এল কাস্টিং সেক্‌শনে। জয়ন্ত সেখানেই অপেক্ষা করছিল।

অফিসারটি এসে প্রথম প্রশ্ন করল জয়ন্তকে—মিস্টার বোস কোথায়?

—কাজে বেরিয়েছেন।

—মিস্টার লাহিড়ী?

—উনি অসুস্থ, ছুটিতে আছেন। যা বলবার আমাকে বলতে পারেন।

—আপনি ?

—আমি আপাতত এখানকার চার্জে আছি।

—আপনার নাম ?

—জয়ন্ত বোস।

—ও, আপনি জুনিয়র মিস্টার বোস। অফিসারের গোমড়া মুখে এবার হাসি ফুটল।

—আপনি আমাকে চেনেন ?

—বলেন কি মিস্টার বোস, আপনাদের খবর আমাদের রাখতে হয়। আপনাদের সব রকম প্রোটেক্শন দেওয়ার একটা নৈতিক দায়িত্ব আমাদের রয়েছে। যাক্, ব্যাপারটা কি হয়েছে বলুনতো। আচ্ছা, চলুন আপনার অফিসে, একটা স্টেটমেণ্ট দিয়ে দেবেন, তাহলেই—

—নহি সাব্, স্টেটমেণ্ট হিয়াই লিখাইয়ে। পাশ থেকে একজন বলে উঠল।

অফিসার লোকটার দিকে ঘুরল—কেন, তোমার হুকুম নাকি ?

জয়ন্ত বলল—বেশ তো, এখানেই লিখে নিন না। ওরা যখন চাইছে।

অফিসার এমনভাবে জয়ন্তর দিকে তাকাল যে সে রীতিমত বিব্রত বোধ করল, ভেবে পেল না ভদ্রলোক অত অবাক হচ্ছেন কেন।

শ্রমিকদের কিছু মামুলী জিজ্ঞাসাবাদ করে অফিসার জয়ন্তকে বলল—আচ্ছা, মিস্টার বোস, এবার আপনার স্টেটমেণ্টটা—

সেই হিন্দুস্থানী শ্রমিকটিকে ডাকল জয়ন্ত।

—তুমি এই মেশিনটা চালাতে পার ?

—জী হঁা। তিন সাল হাম ইস্‌কো চলায়া।

—ঠিক আছে। কি ডিফেক্ট আমাকে দেখাও।

—আচ্ছা, লোকটা খাকী সার্টের হাতা গুটিয়ে এগিয়ে গেল মেশিনের কাছে, এ সুশীল, সুইচ লগা দে।

মেশিন গর্জন করে উঠল। জয়ন্ত কান পেতে শুনল। যন্ত্রের গর্জনে যে ছন্দ থাকে সেই ছন্দটা যেন বারবার কেটে যাচ্ছে। ইঞ্জিনীয়ার প্রশান্ত রায়ও সেখানে ছিল। তার মুখ নির্বিকার। জয়ন্ত এঞ্জিনীয়ার না হয়েও মেশিনের বেঁতালা শব্দ ও প্রশান্ত রায়ের নির্লিপ্তির অর্থ বুঝল।

—কি বলতে চাও বল। জয়ন্ত শ্রমিকটিকে বলল।

—ইয়ে হুইলকা দো দাঁত টুট গয়া, ঔর ইয়ে যো সেফ্‌টি ক্যাচ হ্যায় বিলকুল খরাপ। কিসিকা হাঁথ ইয়া পায়ের পাকাড় লিয়া তো বাস্‌…ঈসাক্‌কা হাল হো যায়েগা উস্‌কা। কেয়া ইঞ্জিনবাবু, আপ্‌কা কেয়া কহনা হ্যায় কহিয়ে। লোকটা সোজা তাকাল প্রশান্ত রায়ের চোখের দিকে।

সে দৃষ্টি উপেক্ষা করল প্রশান্ত রায়।

—আপনি কি বলেন, মিস্টার রায়? জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করল।

—আমার কিছুই বলার নেই, কারণ আপনারা কেউই টেক্‌নিক্যাল এক্সপার্ট নন। বলে আর সেখানে দাঁড়াল না প্রশান্ত রায়।

জয়ন্তর মনে হল প্রশান্ত রায়ের প্রথমে নির্লিপ্তি ও পরে এই ঔদ্ধত্য তার ত্রুটিকেই স্পষ্ট করে তুলেছে। দায়িত্বজ্ঞানহীনতার শাস্তি তাকে পেতে হবে। যাই হোক একটা বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই—ঈসাক্ নির্দোষ। এ দুর্ঘটনা আজ না হয় কাল ঘটতই।

জয়ন্ত অফিসারকে বলল—লিখে নিন অফিসার, এ দুর্ঘটনার কারণ যান্ত্রিক গোলযোগ। ঈসাকের গাফিলতি বা অসতর্কতা অ্যাপারেণ্টলি এ দুর্ঘটনার কারণ নয়।

—প্র্যাকটিক্যালি আপনি এদের কথাই করোবরেট্ করছেন! অফিসার যা বলল যেন বোঝাতে চাইল তার বেশি।

—সেটাইতো ঘটনা। অবশ্য ইনকোয়্যারি হবে, সেখানে ফাইণ্ডিংস্ কি হবে জানি না।

—বাট, দিস ইজ অ্যান অ্যাডমিশন।

—আই ক্যান নট অল্টার দি ফ্যাকট্‌স্। তবে অ্যাপারেণ্টলি শব্দটা রাখবেন স্টেটমেণ্টে, জয়ন্তকে একটু অসহিষ্ণু শোনাল, কারণ আমি এক্সপার্ট নই।

—আই অ্যাম অ্যাফরেড দ্যাট ওন্‌ট হেল্‌প মাচ। যাই হোক, একটা সই করে দিন এখানে। অফিসার অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল। গলায় তার সহানুভূতির সুর।

স্টেটমেণ্টে সই দিয়ে জয়ন্ত শ্রমিকদের দিকে তাকাল। মানুষগুলি নিঃশব্দে তাকে দেখছে। অদ্ভুত সে দৃষ্টি। জয়ন্ত যেন মঙ্গলগ্রহের মানুষ, হঠাৎ মহাকাশযান থেকে নেমে তাদের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। কালো

কালো মুখগুলিতে অপরিসীম বিস্ময়। ভূত দেখার মত কি দেখছে ওরা ?

জয়ন্ত আস্তে আস্তে বলল—কাজে যান আপনারা। ঈসাকের জন্য যা করা দরকার সবই করা হবে কথা দিচ্ছি।

অফিসে ফিরে এসে জয়ন্ত জানলার কাছে গেল। পর্দা সরিয়ে ফ্যাকটরির দিকে দেখল। আবার ছন্দ ফিরে এসেছে—যন্ত্রের ঐকতান, কর্মব্যস্ত মানুষের আনাগোনা। মনেই হয় না যে এই সুশৃঙ্খলার সামান্য ছিদ্রপথেই একটা মানুষের জীবনে ঘটে গেছে চরম বিপর্যয়। ঈসাক কি বাঁচবে ? বাঁচলেও পাটা বাদ দিতেই হবে। কে কে আছে ওর সংসারে ? তারা কি সবাই ওরই উপার্জনের ওপর নির্ভরশীল ? ঈসাক যদি বেঁচে ফিরে আসে ওর উপযুক্ত কোনো কাজ কি এখানে নেই ? একটা পা না থাকলেও যে কাজ চালানো যায় ? কত টাকা কমপেনশেসন দেবে কোম্পানী ? ঈসাক যদি মরে যায় সে টাকায় কদিন চলবে ওর সংসার ?

চিন্তাগুলি ভিড় করে আসছিল জয়ন্তর মাথায়। দীপংকরের সঙ্গে পরামর্শ করে একটা ব্যবস্থা ঈসাকের জন্য করতেই হবে। এই প্রতিষ্ঠানের জন্য যে লোকটা আজ প্রাণ দিতে চলেছে তার ভালো মন্দের দায়িত্বও এই প্রতিষ্ঠানেরই। দুশ্চিন্তা সত্ত্বেও জয়ন্ত একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করল। একেবারে নিঃশব্দে আজকের গুরুতর ব্যাপারটা সে মিটিয়ে দিয়েছে, কোনো গোলমাল বা বিক্ষোভ হতে দেয় নি, সম্পূর্ণ একা সে ব্যাপারটার মোকাবিলা করেছে। দীপংকর নিশ্চয়ই খুশী হবেন।

দীপংকর অফিসে আসতেই জয়ন্ত গিয়ে তাকে সব জানাল। সব শুনে দীপংকর অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেলেন, বললেন—অফিসে থেকো। পরে তোমাকে ডাকব।

—জয়ন্ত নিজের কামরায় ফিরে যেতেই অলকেশ বলল—কি মশাই, ঝামেলা বাঁধিয়েছেন তো?

ক্ষুব্ধ হল জয়ন্ত। কিন্তু অলকেশের সঙ্গে সম্পর্কটা তার এখন অনেকটা বন্ধুত্বের, তাই বলল—কি ব্যাপার বলুন তো। বাবা সব শুনে মুখ ভার করলেন। আপনি বলছেন ঝামেলা বাঁধিয়েছি। আমি তো ঝামেলা যাতে না-বাঁধে তারই ব্যবস্থা করেছি।

—দোষ আপনার নয়। ট্রুথ জিনিসটা রিলেটিভ, এ জগতের সত্য আপনার জানা নেই।

একটু তপ্ত হয়ে জয়ন্ত বলল— না,ট্রুথ ইজ অ্যাবসলিউট। ট্রুথ কখনো কণ্ডিশনাল হতে পারে না। যাক, সত্যাসত্যের তর্কে আপাতত আমাদের দরকার নেই। একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে গেছে। লোকটার ট্রিটমেণ্টের জন্য যা করা দরকার করেছি। কে দোষী তাও বোঝবার চেষ্টা করেছি। ঈসাকের কোনো দোষ নেই। প্রশান্তবাবু ইজ অ্যাবসলিউটলি রেসপন্সিবল। বাবা বা আপনি কি এর থেকে অন্য রকম কিছু করতেন?

প্রসঙ্গটা এবার এড়িয়ে গেল অলকেশ।

—যেতে দিন মশাই, তুচ্ছ ব্যাপার, যা দরকার মিস্টার বোসই করবেন।

ডাক পড়েছে জয়ন্ত আর অলকেশ দুজনেরই।

দীপংকরের সামনে একটা খোলা ফাইল। টেবিলের অন্য দিকে প্রশান্ত রায় দাঁড়িয়ে।

ওরা ঘরে ঢুকতে দীপংকর বললেন—আপনি যেতে পারেন, মিস্টার রায়। তোমরা বসো।

কয়েক মিনিট নিঃশব্দে ফাইল পড়লেন দীপংকর। সামান্য পুরু ঠোঁটের ফাঁকে গোঁজা হাভানা চুরুট থেকে ফিকে নীল ধোঁয়া কেঁপে কেঁপে উঠে আসছে। দুই ভ্রূর মাঝখানে কয়েকটা কুঞ্চন রেখা কাঠিন্যে স্থির। চওড়া মণিবন্ধে ক্রোনোমিটারের লাল রঙের কাঁটাটা সেকেণ্ড গুণে চলেছে।

ফাইল বন্ধ করে অ্যাশট্রেতে চুরুট নামিয়ে রাখলেন দীপংকর। মুখ তুললেন জয়ন্তর দিকে।

ইউ হ্যাভ মাডল্ড্ দি হোল থিং, জয়।

এটা প্রশ্ন নয়, তিরস্কার। কি উত্তর দেবে জয়ন্ত?

—সে, হোয়াই ডিড ইউ ডু ইট? উঠে পায়চারি করতে করতে বললেন দীপংকর। উত্তেজনায় তাঁর কণ্ঠস্বর ফেটে পড়তে চাইছে।

—আমি কি ভুল করেছি জানি না। জয়ন্ত আস্তে আস্তে বলল।

—কি ভুল করেছ! সব ভুল, আগাগোড়া ভুল। অল রাঙার।

জয়ন্ত কোনোদিন দীপংকরের কাছে তিরস্কৃত হয় নি। তাছাড়া

অলকেশের উপস্থিতিতে এ ধরণের কথায় সে বিব্রত হচ্ছিল, বলল—আমি যা করেছি তা ছাড়া আর কি করা যেত আমি জানি না।

—আঃ জয়, ডোন্ট্ আরগু, দীপংকরের অধৈর্য প্রকাশ পেল, তোমার প্রথম কর্তব্য ছিল ওখান থেকে সব লোকগুলোকে সরিয়ে দিয়ে জায়গাটাকে আউট অব্ বাউণ্ডস্ করে দেওয়া। লোকটাকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা ঠিকই করেছ। কিন্তু পুলিশকে খবর দেবার আগে রায়কে ডেকে মেশিনের ঐ মাইনর ডিফেক্টটা কভার আপ করে ফেলনি কেন?

—পুলিশকে খবর আমি দেইনি, ওয়ার্কাররা দিয়েছে। আপনি দুর্ঘটনার দায়িত্ব চাপাতে চাইছেন ঈসাকের ওপর। কিন্তু লোকটার কোনো দোষ নেই, মেশিনের সেফটি-ক্যাচ খারাপ ছিল। যখন মেশিনটা চালিয়ে দেখা হল পুলিশ অফিসারের সামনে তখনতো মিস্টার রায় কোনো প্রতিবাদ করেন নি। মেশিনে কোনো দোষ না থাকলে তিনি তা বলতে পারতেন। মিস্টার রায়ের ইরেসপন্সিবিলিটির জন্যে এটা ঘটেছে। ওর শাস্তি হওয়া উচিত।

—ত্যাট্স্এ ডিফারেণ্ট ইস্যু, দীপংকর কথাটাকে কোনো গুরুত্বই দিলেন না, কিন্তু রায়ের ইঙ্গিতটা তোমার বুঝতে পারা উচিত ছিল। মেশিনে ডিফেক্ট আছে তা আমিও জানি, রায়ও জানে, তুমিও জান। রিপ্লেসমেণ্টের চেষ্টাও হচ্ছে। যতদিন রিপ্লেসমেণ্ট না হচ্ছে প্রোডাকশন বন্ধ রাখা যায় না। কিন্তু এসব খবর ঢাক পিটিয়ে লোককে জানানোর মত নয়।

—আমি কিছুই বলিনি। ওয়ার্কাররাই বলাবলি করছিল।

—হুঁ। তুমি ওদের বলার পথটা আরো প্রশস্ত করে দিয়েছ। মেশিনের ডেমনস্ট্রেশন নেবার অদ্ভুত আইডিয়া কে তোমাকে দিয়েছিল। ইউ কুড সিমপ্লি অ্যাভয়েড ইট।

একটু চুপ করে থেকে দীপংকর আবার বললেন—বাই দি বাই, পুলিশ অফিসারের নামটা কি?

—আমি জিজ্ঞাসা করিনি।

—করা উচিত ছিল। শুনলাম তুমি তাকে এনটারটেন করনি, ওখানেই রিপোর্ট লিখিয়ে সই করে দিয়েছ। কাজটা ভালো করনি। তাকে অফিসে নিয়ে এনে ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে যেত। একটা ফেবারেব্ল্ রিপোর্ট লেখানো এমন কিছু এক্সপেনসিভ নয়।

সময় নিয়ে জয়ন্ত বলল—সামান্য কয়েক হাজার টাকার জন্য এরকম একটা ফ্রেম-আপ।

—ডোণ্ট বি সিলি, জয়, দীপংকর তাকে থামিয়ে দিলেন, ইট্‌স্ এ কোয়েস্‌চন্ অব্ প্রিন্সিপ্‌ল্—নীতির প্রশ্ন। আই ফিল ফর দ্যাট আনফরচুনেট ফেলো। টাকা আমি তাকে দেব,কিন্তু সেটা হবে এক্স-গ্রাসিয়া পেমেণ্ট—দয়ার দান। আমাদের দোষ দেখিয়ে ওরা দাবি আদায় করতে এলে সেটা কোম্পানীর পক্ষে মোটেই সম্মানজনক হবে না। ওদের হাত শক্ত হতে দেওয়া আমাদের পক্ষে ট্যাক্টিক্যাল ব্লাণ্ডার। তাছাড়া এ ধরণের অ্যাক্সিডেণ্টের দায়িত্ব স্বীকার করে নিলে কোম্পানীর দুর্নাম রটে যাবে। না, না, জয়, ইট ওয়াজ এ কস্টলি মিসটেক। ইউ মাস্ট বি কেয়ারফুল ইন ফিউচার।

দীপংকরের আশ্চর্য 'কোয়েসচন্ অব্ প্রিন্সিপ্‌ল্' জয়ন্তর বোধগম্য হল না। কিন্তু পুলিশ অফিসার ও শ্রমিকদের সেই বিস্মিত দৃষ্টির মর্ম যেন সে খানিকটা বুঝতে পারল। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার আচরণ না মেলাতে পারার জন্যই সেই বিস্ময়। ঈসাক সম্পর্কে তার সহকর্মীদের কাছে দেওয়া তার প্রতিশ্রুতির মর্যাদা কি ভাবে রক্ষিত হবে জয়ন্ত তা ভেবে পেল না। জয়ন্তর মনে হল সে বড় একা। এতদিন মনে মনে সে নিজেকে এই প্রতিষ্ঠানের একজন ভেবেছে। আজ যেন দীপংকর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন এখানে তিনিই সর্বময়, তাঁর ইচ্ছাই নিয়ম, তাঁর ইচ্ছাকে অনুসরণ করা ছাড়া এখানে আর কারো কোনো সত্তা নেই।

ক্লান্ত জয়ন্ত চেয়ার ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। অলকেশের দিকে তাকাল। অলকেশের চোখে কি প্রচ্ছন্ন একটু পরিহাস? দরজার দিকে এগোতে এগোতে জয়ন্ত শুনল দীপংকর থানায় টেলিফোন করছেন—হ্যালো পুট মি টু পুলীস স্টেশন প্লীজ—

ক্রমশ:

ধারাবাহিক
উপন্যাস

অগ্নিদগ্ধ

সাধন চট্টোপাধ্যায়

॥ ৫ ॥

নাইট ডিউটি এবং ওভারটাইম সেরে বাবাকে রাস্তা দিয়ে আসতে দেখেই বিধান একটু দাঁড়িয়ে পড়ে। ক্লান্ত, অবসন্ন অবস্থায় মনোরঞ্জন কাছে এগিয়ে এলে পকেট থেকে ঘরের চাবিটা হাতে তুলে দিয়ে বল্ল, "চাবিটা রাখ···মা সিনেমায় গেছে।"

মুহূর্তের জন্য মনোরঞ্জনের মেজাজটা বিগড়ে যায়। কানের পাশের রগটা এঁকেবেঁকে ফুলে ওঠে. ঠোঁট দুটো কি যেন বলবার জন্য কেঁপে উঠল। চাবিটা আস্তে পকেটে ফেলে চলতে চলতে বলে, "যাক যে যমের বাড়ি খুশী।" বিধান একবার বাবার দিকে, ফের পরশুর দিকে তাকিয়ে বলে, "আচ্ছা যা তবে। আমি যাই। দেখি লাইনের অবস্থা কি।" পরশু বাড়ির দিকে পা বাড়ায়।

বিমলা তখন বাড়ি ছিল না, রেশনের ব্যাগ হাতে সেও লাইন লাগিয়েছিল। এ এক নতুন চাকরি হয়েছে যেন। ঘরবাড়ি ফেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হা পিত্যেশ করে না দাঁড়িয়ে থাকলে চাল গম পাবার কোন উপায় নেই। কাঠ ফাটা রোদ, সজল বর্ষণ, হাড় কাঁপান শীত—রেশনের লাইনে মানুষের গুঁতোগুঁতি, হুড়োহুড়ির এতটুকু বিরাম মেই। এই চরম সংকটের দিনে এক কণা চালের জন্য মাথা ফাটাফাটি পর্য্যন্ত হয়ে যেতে দেখেছে বিমলা। কিন্তু তা বলে বাড়িতে চুপ করে বসে থাকবারও কোনো উপায় নেই। খোলা বাজারে এককণা চাল মেলে না, তাও যদি জোগাড় করা যায়, দুগুণ, তিনগুণ দাম। মানুষ ভাত খাওয়া ভুলতে শিখেছে।

তাই বিমলাকেই এ ঝড়, ঝাপটা পোয়াতে হয়। পারতপক্ষেও সে পরশুকে এ সবের জন্য পাঠায় না। একেত পরশু একটু হাবা, ঠিকমত পয়সা গুণে আনতে দশবার ভুল করে, তারপর এ ক্লেদাক্ত আবহাওয়া দেখে দেখে বিমলার মাথা ঘুরে গেছে। চিনি চালের ব্ল্যাকমার্কেটিং থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে ছেলেমেয়েদের অসভ্য আচরণে তার সমস্ত শরীর রি-রি করে জ্বলে ওঠে। মনে তার গুড়্ গুড়্ করে ভয় ডেকে ওঠে, যদি পরশুও একদিন এ লাইনে

মিশে যায়? সব আশা ধূলিসাৎ হয়ে যায় যদি তার? অসম্ভব। তার আগেই মৃত্যু শ্রেয়। তাই পরশুকে স্কুলে পাঠিয়ে, থলি নিয়ে রোদমাথায় ছুটেছে রেশনের দোকানে।

খালি ঘরে পরশু খানিক চিৎপাৎ হয়ে শুয়ে রইল। এরকম প্রায়ই আজকাল সে শুয়ে থাকে। আকাশ-পাতাল চিন্তা করে সব। তবে আগে পরশুর কল্পনা জগতের যেমন সীমারেখা ছিল না, অর্থহীন বিক্ষিপ্ত ভাবে যখন যা খুশী ভাবতে পারত, আজকাল সেটা আর পারে না। স্মৃতি যেন মনের স্তর হতে মুছে গেছে, বর্তমান হৃদয়কে তোলপাড় করে দেয়। আজ কণককে নিয়ে একটা কৌতূহল জাগল তার। কেমন যেন রহস্যময় লেগেছিল ভদ্রমহিলাকে। নিজের মায়ের সাথে মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করে পরশু।

বিমলা এ সময়টা ঘরে ঢোকে। অনেকক্ষণ রোদে দাঁড়ানর ফলস্বরূপ সমস্ত মুখটায় শ্রান্তির চিহ্ন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘরে ঢুকে বল্ল "কিরে এখনি চলে এলি যে?...ক্লাশ হয়নি।"

"ষ্ট্রাইক।" তারপর পরশু অবাক হয়ে বলে, "পাওনি র‍্যাশন?"

"পাব না কেন? লাইন রেখে ফাঁকে নাইতে এলাম।...যা ভীড়!"

পরশু কি যেন বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ রাস্তার কলগোড়ায় ঝগড়ার আভাস পেয়েই বাইরে তাকিয়ে বল্ল, "ব্যাপার কি? আবার কার সাথে লাগল?"

"থাক, তোমার বেরোতে হবেনা"—বলেই বিমলা বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। ঝগড়া রীতিমত লেগে গেছে তখন। অনেকগুলো মেয়েছেলে আর কিছু বেটাছেলের মেশানো আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল।

"একটু আসি মা"—বলেই পরশু আকুল আগ্রহে এগিয়ে যেতেই মা বল্ল, "খবর্দার, ঝগড়ার ওখানে নয়, আমাদের জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখ।

ঝগড়াটা প্রথম শুরু হয়েছিল যতীন ভট্টাচার্যের মেয়ে বুলির সাথে রসিক পালের আশি বছরের বুড়ো বাপ সুদামের। বুলি কলে জল ভরছিল, পাশে পাড়ার সব বউঝিরা দাঁড়িয়ে, হঠাৎ বুড়ো সুদাম নোংরা কাপড়ে কলটা ছুঁয়ে দিয়েছে। প্রথমটায় বুলি বিশেষ কিছুই বলেনি শুধু আধাভর্তি জলটা পাশের নর্দমায় ফেলে দিয়ে বল্ল,"দিলেন'ত ছুঁয়ে—একটু তর সইল না?...খাওয়া থেকে হাগা-মুতোও কলগোড়ায়?" সুদাম লোকটা একটু বেয়াড়া মেজাজের। চোখে কম দেখে কিন্তু কান প্রখর। "কি বল্লা?...কে তুই? যতীন ঠাকুরের মেয়ে?...বাড়িতে কল পুঁততে বলিস বাপেরে।" এমনিভাবেই সুদাম

ঠাসঠাস কথা বলে। শুনলেই হাড়পিত্তি জ্বলে উঠবে সবার। বুলিকে আচমকা বাপ তোলায় ক্ষেপে গেল সে। এমনিতেই মুখরা হিসেবে তার সুনাম আছে তায় বাপ তোলায় সে একটু গলা চড়িয়ে বল্ল, "আপনার বাপ হাজারটা কল পুঁতেছে বাড়িতে, আমার বাবার আর দরকার কি?" আর যাবে কোথায়! হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে সে শাপান্ত করতে শুরু করল চৌদ্দ গুষ্টিকে। দেখতে দেখতে ছেলে কাঁখে ছুটে এল রসিকের বউ কালিদাসী আর রসিকের ভাইয়ের দশ বছরের মেয়ে টুনি। "আলো, যত বড় মুখ না তত বড় কথা! পুতছেই' ত হাজার কল, একশ বার পুতছে। আরও পুতব···তোর মুখের মধ্যে পুতব"।

"শোন্ শোন্, খুনস্থটী মাগীর কথা শোন—"

টুনি গলার শির ফুলিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "তুই 'মাগী', 'পিছাখাকী'·· সাতভাতারী'। কালিদাসী টুনিকে ধমক দিয়ে বলে "তুই থাম" অর্থাৎ সম্মুখ সমরে ও নামবে, ছোট দশবছরের মেয়েটার নামার দরকার নেই। বুলি কিন্তু ছেড়ে কথা কইল না। সাতগুণ স্বরে চেঁচিয়ে বল্ল, "তোর মা সাতভাতারী—রাত্তিরে আহে সাত দরজা দিয়া, জানস না?"

কালিদাসী তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে, হাতটা নাচাতে নাচাতে বল্ল "আহা-হা, সতী বেউলা আমার! জানিনা, বিয়া না হতেই কয় ভাতারের ঘর করছস? কোন বাগান দিয়া আহে তারা জানি না?"

এমনিভাবে ঝগড়াটা আরও কুৎসিৎ ব্যক্তিগত পর্যায়ে নেমে এল। মজাটা হল এই, প্রথম যার সাথে ঝগড়া লেগেছিল সেই সুদাম অনেকক্ষণ বাড়ি ঢুকে গেছে। অন্যান্য, মেয়ে বউ যারা জলের জন্য দাঁড়িয়ে ছিল দু চারটে মন্তব্যের মধ্য দিয়ে পরিষ্কার দুটোদলে ভাগ হয়ে গেছে। যেন এক ঝাঁক শালিকের চেঁচামেচি!

পারুলও দাঁড়িয়েছিল উঠোনে, পরন্তু সেটা লক্ষ্য করেছে। সাধারণ দিনে দুপুর বেলার ঝগড়া সুতরাং বেটাছেলের সংখ্যা কম। কেবল বেকার যুবক দুচারজন মাঝে মাঝে থামিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ আরও এক জনের নজর পড়ল পারুলের দিকে। সে শশাঙ্ক ভট্টাচার্যের ছেলে গণপতি।

আড়চোখে মুখটিপে হেসে একটু একটু করে পারুলদের বেড়ার কাছে এসে দাঁড়াল। ঝগড়া শুনতে শুনতে এককালে বল্ল, "তুই ও আয় পারু···

লেগে যা, ওখানে ভালমানসের মত দাঁড়িয়ে কেন ?" পারুল একটা ঝুকন্ত বাঁশের ডগা ধরে শিথিল অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল। একটু মজা পেল সে গণপতির কথাটা শুনে। কৃত্রিম ক্রোধে বল্ল "আহাহা···আমি ক্যান ?···আপনি ত আছেন।" গণপতি শুধু হাসে, জবাব দেয়না। পারুলের এই হাল্কা চপল জবাবটুকুর মধ্যে একটা গভীর সুখ অনুভব করে সে। বার কয়েক ওর সমস্ত শরীরটার প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টি বোলাতেই আবার চোখাচুখি হল দু'জনের। ওরা হেসে ফেলে।

সূর্যও কলগোড়ায় চানের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল। তেলো মাথা রোদে চিড়বিড়্ করে উঠতেই বালতিটা তুলে নিয়ে হাঁটতে শুরু করে। "নাঃ, তিনকড়ির পুকুরেই যাই···পাকিস্তানে সব ফেলে এসেও শিক্ষা হয় না।·· জলনিয়ে মারামারি, যত্তসব !" বুলির মুখ তখনও থামেনি। চলকে পড়া জলের বালতিটা নিয়ে একটু দম নেয়। মুখটা শাড়ির আঁচলে পুঁছে চীৎকার দিয়ে উঠল, "মা কালী তোদের নেবে, আমাদের না···কলেরা বসন্ত তোর ঘর ভইলা নেবে।" বিমলা এবার পরশুকে ধমক দিতেই, আস্তে উঠোন পেরিয়ে ঘরে ঢোকে সে।

॥ ৬ ॥

নতুন স্কুলে ভর্তি হবার পর পরশু বাবার কাছে যে চিঠি দিয়েছিল তার উত্তর ছাড়া এ দীর্ঘদিন গোপাল কোন চিঠিপত্র লেখেনি। এমনকি টাকাও পাঠাচ্ছে না অনেক দিন ধরে। বিমলা রোজই দুপুরে পিওনের আশায় ছটফট করে বিকেলের দিকে নিরাশ হয়। এ এক জ্বালা হয়েছে যেন। একা সে মেয়েমানুষ—কি করে এ সংসার চালাবে ? হলই বা না মাত্র দুটো পেট ? দুখানা চিঠি পাঠিয়েও কোন জবাব পায়নি বিমলা। কি অদ্ভুত খেয়াল খুশীর মানুষ ! কর্তব্যের প্রতি কি ভয়ানক উদাসীনতা ! বিমলা মাঝে মাঝে হতাশায় ভেঙে পড়ে, ধিক্কার আসে তার নিজের জীবনটার পর।

প্রথম প্রথম বিমলার রাগ হত, জলত মনে মনে। তারপর দেখেছে এ রাগ বৃথা, জ্বলে ওঠা নিস্ফল। গোপালকে তা একটুও স্পর্শ করতে পারে না। এই অবসরে গোপালের জীবন-ইতিহাসটা একটু বলে রাখা দরকার।

গোপালের বয়স তখন বছর বার-চোদ্দ। গোঁফের রেখা ওঠেনি ভাল করে, সমস্ত চোখে মুখে শৈশবের ছাপ। গলাটা ছিল ভয়ানক মিষ্টি,

পথেঘাটে গান গেয়ে বেড়াত। বাড়িতে গাইবার জো ছিল না, তাঁর বাবা ক্ষীরোদ রায়ের বারণ। ও সব তিনি বরদাস্ত করতেন না। ভয়ানক রাসভারী লোক, ঘরের সবাই তাকে ভয় করত ঠিক যমের মত।

একদিন ক্ষীরোদের একখানা শখের ছুরি হারিয়ে, সারাদিন গোপাল এধার ওধার কাটিয়ে দিল। শেষে সন্ধ্যার পর ফিরে আসতেই শুরু হোল মার। একটা ছপটি আছে তার—কখনও কাউকে শাসন করবার দরকার পড়লে, এটা ব্যবহার করেন তিনি।

কিন্তু আজ যেন গোপালের মাথাটা কেমন হয়ে গেল। মার খেতে খেতে হঠাৎ গোঁয়ার অবস্থায় রুখে দাঁড়িয়েই বাবার চোখে অন্ধের মতো দুটো ঘুষি চালিয়ে দিল। তারপর একেবারে খালের ধারে ছুট। একখানা মহাজনী নৌকো করে ষ্টীমারঘাটা, তারপর বহুকষ্টে না খেয়ে না ঘুমিয়ে নামল এসে সটান কলকাতায়।

গাঁয়ের ছেলে একেবারে শহরে এসে উঠল। পিসীর বাড়ি থাকে, খায়-দায় ঘুরে বেড়ায়। কয়েকটা দিন কাটবার পর বাড়ি থেকে চিঠির পর চিঠি, লোকের পর লোক আসতে লাগল। গোপালকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। পিসী হাত পা ধরল, গ্রাম থেকে যারা এসেছিল তারা, এমনকি মাও এল একবার। গোপালের সেই এক কথা। বাবাকে এসে বলতে হবে। সুতরাং, দেশে আর যাওয়া হলনা। কারণ ক্ষীরোদ যে মেজাজের লোক, দুঃখে বুক ফেটে গেলেও নিজে এসে অনুরোধ করবেনা গোপালকে।

তাই শহরে থেকে গোপাল গান গেয়ে বেড়াত। মনের বড় সাধ তার গায়ক হওয়া। ইতিমধ্যে বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে, গানের ওস্তাদের কাছে যাতায়াত করে দিন কেটে যাচ্ছিল।

হঠাৎ এক সুন্দর সকালে পিসী মারা গেল, গোপালের দাঁড়াবার পথ রইলনা। টাকা রোজগারের আশায় ধর্ণা দিল এখানে সেখানে। গলা তার অনেক মোলায়েম হয়েছে কিন্তু কে তার মূল্য দেয়? রুটির দোকানে, জোলর কারখানায় ছ মাস চার মাসের জন্য কাজ করতে লাগল। অভাবে, অনটনে গোপাল তখন বিপর্যস্ত। সঙ্গীতকে কিছুতেই মরতে দেবেনা সে। মাঝে মাঝে সময়ের ফাঁকে ওস্তাদের কাছে আনাগোনাটা বন্ধ রাখেনি তখনও।

তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। টাকা উড়তে লাগল রাস্তায় রাস্তায়। এক

কনট্রাক্টরের ঠিকেদার হয়ে সে বিহার এবং বাংলার রাঢ ভূমি চষে বেড়াল। পয়সা পেল প্রচুর কিন্তু বাড়িমুখো আর হলনা।

এ দিকে বাবা-মা গত হয়েছে, ছোট ভাই কমল কি একটা পাশ করে কলকাতায় চাকরির জন্য ঘুরছে এখানে সেখানে।

গোপালের আশা তখন মরতে শুরু করেছে। সঙ্গীতজ্ঞ আর কোনদিন সে হতে পারবেনা। যেন কাদার ফাঁদে একটা মানুষ আস্তে আস্তে ডুবে যাচ্ছে। বেপরোয়া জীবন যাপন আর কাঁচা পয়সার কারবারী হয়ে পড়ে রইল সে সুদূর অখ্যাত এক অঞ্চলে।

একটু আশার ঝলকানি দেখা গেছল কমলের একটা ভাল চাকরি হবার পর। কি করে যে সে দাদার খোঁজ পেয়েছিল, বলা মুসকিল। দেখা করে বল্ল "রাখ তোমার চাকরি, আমি আছি। তুমি গান বাজনা নিয়ে থাক।"

"তোর অসুবিধে হবেনা?"

কমল দৃঢ় প্রতিবাদ করে বলেছিল "না, তার কোন অসুবিধে হবেনা।"

আবার সেতার বেজে উঠল, রেওয়াজ শুরু হল গোপালের কণ্ঠে। বিমলার বিয়ে হয় তখন। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ সাময়িক বন্ধ হয়েছে, দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মহড়া, দেশ বিভাগের কথা চলেছে—এমন সময় গোপালের বিয়ে। একটু বেশী বয়সে বিয়ে করেছিল সে।

তারপর হঠাৎ একদিন কমল মারা গেল, পরশু তখন দু বছরের শিশু। নতুন করে জীবন নিয়ে সংগ্রাম গোপালের তখন থেকেই। ভুলে গেল গানের কথা, সেতার, রেওয়াজ। বিধ্বস্ত একটা মানুষ তখন থেকে এ পর্যন্ত একটা চেতনা বিহীন উদাসীন, জড় পদার্থের মত পৃথিবীতে বেঁচে আছে।

বিমলা কিন্তু আর একটা জিনিষ বুঝতে পারে। গোপালের এ উদাসীনতা একটা কঠিন আবরণমাত্র; এর ভিতরই তার সমস্ত জীবনে হতাশা কুটিল, হিংস্ররূপে বসবাস করছে। মানুষকে কষ্টে ভেঙে পড়তে দেখে গোপালের গোপন হিংস্ররূপে যেন বিকৃত তৃপ্তি পায়। সূক্ষ্ম আনন্দ বোধ করে মানুষের আশাআকাঙ্ক্ষাগুলোকে তুষের আগুনে ধিক্ ধিক্ করে পুড়িয়ে মারতে। গোপালের চরিত্রের এ জটিল দিকটা বিমলা যে দিন বুঝতে পেরেছে, স্বামীর প্রতি সমস্ত ক্রোধ, জ্বালা তার নিভে গেছে। হতাশা এসে বাসা বেঁধেছে তার মনেও।

বলতে গেলে সমস্ত জীবনটাই বিমলা হয়েছে গোপালের শিকার। সেই

বিয়ের পর থেকে আজ পর্যন্ত। পল্লবিত আশা আকাঙ্ক্ষাগুলোকে এমন নিষ্ঠুর ভাবে একের পর একে ছেঁটে ফেলে দেয়ায় সে এখন এক উর্দ্ধমুখী গাছের কঙ্কাল। তবুও মৃত নয় বিমলা, মনে সে যে সম্পূর্ণ মরে যায় নি'। এই উপলব্ধিটুকুও তাকে ভবিষ্যতের আশা জোগায়।

মাঝে মাঝে অলস বিকেলে এ সব চিন্তাগুলো তার মনে ভীড় করে আসে। ছেলেকে স্কুল পাঠিয়ে, ঘরের এটা ওটা সেরে খেতে খেতে দুপুর হয়। তারপর একটু ঘুমিয়ে উঠে দাওয়ায় বসতেই মনটা ফাঁকা ফাঁকা লাগে। কোন দিন ভাল লাগলে যায় আশপাশের কোন বাড়িতে, নয়ত এ সব হাজার চিন্তা তাকে ভারাক্রান্ত করে তোলে।

একটু একটু হাওয়ায় দূরের নারকোলর গাছের মাথাগুলো নড়ে, পরশুর টিয়েটা থেকে থেকে উদাসভাবে ট্যাঁ ট্যাঁ করে। সূর্যটা পশ্চিমে অনেকটা নেমে গেলেই পারুলদের বাঁশের ছায়া গলা বাড়ায় এ বাড়ির উঠোনে। রাস্তার কিছু অংশে, কলতলায়, যতীনের টালির চালে, রসিকের দালানের গায়ে ছায়া—রোদ্দুরের খেলা বিমলার মনটাকে ডুবিয়ে দেয় বিষণ্ণতায়, হাই তুলতে তুলতে চোখে তার জল এসে যায়। এক সময় সত্যিই নিজের জীবনটার কথা ভেবে ভীষণ অবাক লাগে। কোন আশার ফল্গু এখনও সংসারের আবর্তে বেঁধে রেখেছে? সত্যিই, বিমলা অন্য সাধারণ দশজনের মত হলে কবে মান-সম্মানের প্রতি আগুন লাগিয়ে কি যে করে বসত কে জানে? পরশুর মুখ চেয়ে সব তার সয়ে গেছে, গোপালকেও সে করেছে ক্ষমা। তাই এর পড়াশুনোর ব্যাঘাতের শংকা দেখলেই, সে বিচলিত হয়। রোদে পুড়ে, জলে ভিজে ঐ হাজার ব্যাটাছেলেদের মাঝে লাইন দিয়ে, বাজার-হাট করে পাখনা দিয়ে যেন আড়াল করে রেখেছে পরশুকে। মাঝে মাঝে তাই ভয়। সমস্ত আশপাশটাই যে ফাঁদের মত হাঁ করে আছে। শত শত ছেলেমেয়ের মত, পরশুও বোধ হয় সেখানে ধরা পড়ে যাবে। এ সমাজ জন্মদাতা নয়,—ঘাতক।

পরশু স্কুল থেকে ফিরে আসতেই সব চিন্তা মিলিয়ে যায় বিমলার। দ্রুত সে চুলগোছাকে খোঁপা বেঁধে, মাদুরটা পাকাতে পাকাতে বল্ল "কালি লাগল কি করে জামাটায়?

"পড়ে গেছে······খেতে দাও তুমি"—

"এই সেদিন কাঁচলাম।"

খানিকটা সময় টিয়াটাকে ঘুরে ফিরে দেখে, আসন পেতে খেতে বসে পরশু। "বারান্দায় বসে কি করছিলে?" থালাটা এগিয়ে দিয়ে বিমলা বলে, "কি আর করছিলাম, এমনি।"

"চিঠি এসেছে বাবার?"

একটু ঢোক গিলে নেয় বিমলা। "না……কেন?" পরশু এই 'কেন' শুনে একটু বিরক্ত হয়। অনুযোগের স্বরে বলে, "একখানা বই নেই…… তোমায় কবে থেকে বলছি পড়া অনেক দূর এগিয়ে গেছে……বলছ আবার কেন?" কি জবাব দেবে বিমলা? এগুলো কি সে ভাবেনি? পরশুকে স্কুলে ভর্তি করার পর থেকেই এ চিন্তা তার মনে তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ মনটা নৈর্ব্যক্তিক ক্রোধে জ্বলে ওঠে। সেটা সামলে নিয়ে শক্ত স্বরে জবাব দেয়, "না, আসে নি।" পরশু মুখটা গুমরে থাকে।

হঠাৎ বাড়ির পিছন দিক দিয়ে সরলা ঝি এসে দাঁড়াল। এক পা দাওয়ায় ঠেকিয়ে হেসে বলে, "কি কচ্ছ মা?" বিমলা জবাব দেয়, "কি আর করব বল, ঐ এক কম্ম ছাড়া?……রান্না আর খাওয়া, এইত কাজ?" মাথা চুলকে একটু উদাস গলায় সরলা বলে, "আর বল কেন, এ পোড়া পেটটা না থাকলে আর কিসের ভাবনা।…কাউকে কি আর তোয়াক্কা কত্তুম।" তার হৃদয় মুচড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠল। "জগৎ সম্সারে এজন্যই সব। ইজ্জত বল, মান সম্মান, হাঙ্গামা—সব এ পেটটার জন্য।"

সরলা এ বাড়ির ঝি নয়। বিমলার সে ক্ষমতা নেই। তবুও যে সব বাড়িতে সরলা তোলা ঝিয়ের কাজ করে করে, তাদের চাইতে ভাবটা বেশী বিমলার সাথে। গুমোট ঘরের একফালি ফাঁকের মত, সমস্ত দিনের এঁটো কাছানি এবং গোমড়া মুখ শুনতে শুনতে, এ বাড়ির মহিলার সাথে প্রাণের কথা বলে সে যে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। সরলা যুগনী পাড়ার বউ, কাজ করতে আসে এ সব পাড়ায়। খানিকটা দীর্ঘ পথ, এ বাড়ির উঠোন দিয়ে গেলে তাড়াতাড়ি হয়ে যায় বলে, সরলা এ ভাবে সময়টুকু বাঁচায়। আলাপটাও সেই সূত্রে।

"একটা কথা ছিল, মা"—কি যেন বলতে চায় সরলা। বিমলা কান দেয়ার আগে পরশুকে গেট পেরিয়ে যেতে দেখেই ডাক দেয়, "কোথায় বেরোচ্ছিস?"

"বিধানের কাছে।" বিমলা সামান্য বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকায়। কে এই বিধান? প্রায়ই ছেলের মুখে শোনে?

সরলা হাত মেলে চোখের দৃষ্টিটা নির্দিষ্ট একটা আঙুলের ডগায় আটকে রেখে বল্ল, "কয়েক দিন ধরেই ভাবছি, তোমায় বলব, সাহস পাচ্ছিনি।"

"কি?"

"দুটো ছেলেমেয়েকে পড়াবার জন্যি। ...মোদের পাড়াতেই থাকে... আমিত এ সব পাড়াতে আসি, আমায় বলেছিল খোঁজ দিতে...বাপ মিলে কাজ করে, পয়সা দিতে পারবেনি বেশী।...ত ভাবলাম তোমার কথা, পাড়ার আর কাউকে মোর পছন্দ হয় না।"

বিমলা খানিক অবাক হয়ে যায়। সে পড়াবে? কি পড়াবে সে? পরশুকে পড়ানোর জন্য দিন রাত তাড়া দেয় বলে সরলা তাকে কি বিদুষী ভেবে বসল? সে মৃদু হেসে ফেলে। এই মুহূর্তে সে সরলাকে কি জবাব দেবে? নিজের সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণার উচ্চাসন বানিয়েছে এই অশিক্ষিত, গরীব বউটি—পরের বাড়ি বাড়ি ঝিয়ের কাজ করে বেড়ায় যে, 'না' বলে সেই বিশ্বাসকে কি এক মুহূর্তে ভেঙে দেবে? জানিয়ে দেবে কি বিয়ের আগে ক্লাস নাইন থেকে টেনে উঠতে ফেল করায় বাবা স্কুল ছাড়িয়ে দিয়েছিল? সেই তার বিদ্যার দৌড়? বিমলা চুপ করে রইল।

"তোমায় যেতে হবেনি...ওরা সাঁঝের বেলা আসবে।"

তবুও বিমলা জবাব দেয় না। তবে কি বিমলার সাংসারিক অস্বচ্ছলতার দিকটা টের পেয়ে সরলা অনুগ্রহ করছে? একটু অপমানিত বোধ করে মুহূর্তের জন্য কিন্তু সরলার মুখের দিকে তাকিয়ে এ যুক্তিটা টিঁকতে পারেনা। সরলা নিজেই যেন কৃতার্থ হয়ে যাবে বিমলা হ্যাঁ বললে। পাড়ায় গিয়ে সে এর ওর কাছে গিয়ে এ ক্ষমতাটুকুর কথা জাহির করে বেড়াবে।

আবার মুখের হাসিটা টেনে এনে বল্ল, "কোন ক্লাশ?" "ছোটটা এক ক্লাস, বড়টা দুই ক্লাশে পড়ে।"

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। জবাবে বিমলার মনটা হাল্কা হয়ে যায়। সে উঁচু ক্লাশ ভেবে নিজের বিদ্যার দৌড়টা নিয়ে আকাশ-পাতাল ভেবেছে।

"আচ্ছা পাঠিয়ে দিও।" পরে, সরলা চলে গেলে, ব্যাপারটা নিয়ে সে গম্ভীর ভাবে ভাবল। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছল, তাড়াতাড়ি উঠেই প্রদীপ জ্বালাতে জ্বালাতে হঠাৎ মনে পড়ল পরশু সেই কখন বেরিয়েছে, এখনও ফেরার নাম করছেনা। পই পই করে সে বলে দিয়েছে রাস্তার আলো জ্বললেই বাড়ি ফিরতে। কোথায় গেছে সে?

পরশু গিয়েছিল বিধানের বাড়ী। কয়েক দিন আগের ঘটনার পর ওর ইচ্ছে ছিলনা সেখানে যাওয়ার। খুব খারাপ লেগেছিল কনককে। তবুও বিধান নিজ হাতে একটা হেডফোন তৈরী করেছে বলে যেতে বলেছিল। পরশুর এ সব ব্যাপারে খুব উৎসাহ। তার চরিত্রের এই একটা দিক। বড়ই সে কৌতূহলী।

ওদের বাড়ি পৌঁছে দেখে কণক বারান্দায় সেই চৌকিটার পর বসে। সেজেগুজে, একখানা পরিষ্কার শাড়ি পরে চুপচাপ বসেছিল। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া প্রতিটি মানুষের প্রতি তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। দরকার পড়লে দু চারটে রসিকতাও ছুঁড়ে মারছিল পরিচিত কেউ গেলে।

মনোরঞ্জন বসেছিল সিঁড়িটার মধ্যম ধাপে। একখানা ময়লা লুঙ্গি আর খালি গায়ে গামছা কাঁধে ফেলা। অলস ভাবে বিড়ি ফুঁকছিল সে। সবে ঘুম থেকে উঠেছে। বিড়িটা খেয়ে হাত মুখ ধোবে, জামাকাপড় পরে একটু খাওয়াদাওয়া করেই নাইট ডিউটির জন্য তৈরী হতে হবে। ও কাজ করে বেলেঘাটায় এক রবার ফ্যাক্টরিতে। নিত্য বারমাস নাইট ডিউটি আর ওভার টাইম করে মনোরঞ্জন বুড়িয়ে গেছে। কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে, সমস্ত জগতের প্রতি যেন বিতৃষ্ণা।

বিধানকে ডাক দিতেই কনক চোখটা ঘুরিয়ে আস্তে জবাব দিল, "বাড়ি নেই।"

পরশু ক্ষুন্ন হয়। এমন কথা ত ছিলনা বিধানের সঙ্গে। বার বার করে ও থাকতে বলে দিয়েছিল এবং রাজিও হয়েছিল বিধান। আবার এখুনি বাড়ি না ফিরে সে ভাবল পাকা রাস্তাটা দিয়ে একটু বেড়িয়ে ফিরবে। বিকেলে এ সময়টা অনেকে অলস ভাবে এ রাস্তাটায় ভ্রমণ করে। গাড়ি ঘোড়ার উৎপাত কম, তাই চলাফেরার স্বাধীনতা একটু বেশী।

পাকা রাস্তাটার পরে, একটু এগিয়ে যেতেই চায়ের দোকানটার সামনে

বিধানের সাথে দেখা হয়ে গেল। এই দোকানটা থেকে বেরিয়েই প্রথম দিন পরশুকে ডাক দিয়েছিল বিধান।

আরও দু চারজন ছেলে ছোকরার জটলা চলছিল এখানে। সব সময়তেই দোকনটা জমজমাট থাকে, বিশেষ করে বিকেলের দিকে।

বিধানের সাথে তীব্র কথা কাটাকাটি চলছিল তখন। খুব ক্ষেপে গেছে বিধান, কার নাম করে যেন শাসাচ্ছে। পরশুকে দেখেও সে ডেকে কিছু জিজ্ঞেস করেনা। সেই ছেলেটিকেই শুধু আঙুল নাড়িয়ে নাড়িয়ে কি যেন বলছিল। পরশু একটু কাছে এগিয়ে আসে। প্রথমটায়, আসার খুব ইচ্ছে ছিলনা ওর, ভেবেছিল পাশ কাটিয়ে চলে যাবে। কিন্তু বিধানকে এ রকম উত্তেজিত অবস্থায় দেখে তার কৌতূহল জন্মেছে মনে।

কথা বলতে বলতে বিধান ফস্ করে পকেট থেকে ছোট্ট একটা চাবুক বার করে পুরোপুরি মেলে ধরল। শপাং করে বাতাস কেটে বলে, "জগদীশকে বলিস্, ওকে মারতে দল লাগেনা···এইটাতেই চলবে।"

সে কি? চাবুক? এখানেই মারামারি হবে? পরশু একটু ঘাবড়ে যায়। একটু ভয় লাগে মনে। উসখুশ করতে থাকে সে।

ছেলেটি বল্ল, "খুব তড়পাস না বিধান, দল ওরও আছে।"

"রাখ"—বিধান ধমকে ওঠে, "মস্তানি ছুটিয়ে দেব ওর। ঢুকুক পাড়ায়··· মেয়েদের টিট্‌কিরি দেয়া বার করে দিচ্ছি।"

"ও কথা বলিসনা তুই। ব্যাপারটা বোঝ। ···তিতুর সম্বন্ধে তুইও কি পুরোপুরি সার্টিফাই করতে পারিস?"

"আলবৎ"—নিজের বুকেই নিজে একটা থাপ্পড় কষায়। অর্থাৎ তার প্রেমিকা সম্পর্কে সে নিঃসন্দেহ, সুতরাং টিটকারি বেপাড়ার ছেলে জগদীশই মেরেছে। হঠাৎ দূর থেকে পুলিশ ভ্যান আসতে দেখেই যে যার দোকানটা ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। বিধান চাবুকটা তাড়াতাড়ি পকেটে ঢুকিয়ে পরশুকে নিয়ে উল্টো পথে হাঁটা লাগাল।

ফিরতে তাই সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। রাস্তাঘাটে আলো জ্বলে গেছল এবং পারুলদের বাঁশঝাড়ের কাছে এসে পরশু বুঝতে পেরেছে সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে উতরে যাবার জোগাড়। মনে মনে মায়ের বকুনি সম্বন্ধে ভয় ধরে গেছে তার। তাই ভাবল রাস্তা দিয়ে না গিয়ে পারুলদের ঘরের পিছনে ছাইয়ের গাদায় মানকচুর ঝোপটা দিয়ে সোজা পথে কাড়ি

যাবে। এখন যতটুকু সময় বাঁচান যায়, সেটুকুই পরশুর লাভ। নইলে বাড়িতে এ দেরির কোন কৈফিয়ৎ দেয়া যাবে না।

যতীনের মাধবীকুঞ্জের নীচে বাঁশের মাচাটার পর ওর ছেলের বউ সনকা বাচ্চা কোলে বসেছিল। দুচারটে কোথায় ফুল ধরেছে,—চারদিকে গন্ধ। পরশু একটু আড়চোখে তাকিয়ে হাঁটতে থাকে। তিনকড়ি অন্ধকারে বারান্দায় বসে। কি যেন খাচ্ছিল। ছোট্ট একটি ছেলে পাশে ঘ্যানর ঘ্যানর করছে। পরশু সেদিকেও একটু তাকিয়ে রাস্তা ছেড়ে পাশের জমিটায় ওঠে। দু চারটে কাঁটাগাছ পেরিয়ে পারুলদের চালার পিছন দিয়ে হাঁটতে থাকে। সুখের ঘরখানা অন্ধকার, বোধ হয় কেউ বাড়িতে নেই। আচমকা হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় পরশু। সমস্ত শরীরের রক্ত মুহূর্তের জন্য ধক্ করে ওঠে। একটা ছায়া পারুলদের ঘর থেকে বেরিয়ে দ্রুত অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। মনে হল বাঁশঝাড়ের তলা দিয়ে ক্লাব ঘরের দিকে সরে গেছে।

চিন্তার কতকগুলো নতুন দরজা একে একে খুলে গেল তার। সমস্ত শরীরটা একটা অজানা অনুভূতিতে কেঁপে কেঁপে উঠল। সে খানিকটা ঢোক গিলে নেয়।

ইতিমধ্যে সুখের ঘরে খুট করে আলো জ্বলে উঠল। হয়ত বাড়ির কেউ ফিরে এসেছে, পরশু ভাবল পারুলকে ব্যাপারটা বলে। মনে করতে করতে একটা লম্প হাতে কে যেন পিছনটায় আসতেই, মুখটা দেখার চেষ্টা করে।

"কে ওখানে ?···

"আমি"—পরশু পারুলের কথার জবাব দেয়। "কি করছিস ওখানে... এঁ্যা ? রীতিমত ধমক দিয়ে ওঠে পারুল। "না কিছুনা ···বাড়ি যাব।"

"বাড়ি যাবাত ওখানে কেন···রাস্তা নাই ?" তারপর আরও কি সব গজ গজ করে আলোটা নিয়ে ঘরে চলে গেল। পরশু যেন আকাশ থেকে পড়ে। এমন যে হবে কল্পনাও করতে পারেনি সে। এই কি সেই পারুল যে হাসতে হাসতে রাস্তা ডেকে এনে চিঠি লিখিয়েছিল ? এমন ভাবে রাগ করার কোন কারণও খুঁজে পেলনা এই মুহূর্তে। কিন্তু অন্য এক চিন্তা এল মাথায়। বিমলাকে যদি ঘটনাটা বলে দেয় পারুল ? ভয়ানক ভয় লাগল তার মনে। ধীরে ধীরে চোরের মত একটা মস্ত অপরাধী মন নিয়ে সে বাড়ি ফিরল। ক্রমশ

শেখ আবদুল জব্বার

শ্যামসুন্দর দে

স্বাধীনতা পত্রিকায় কিশোর পাতায় আবদুল জব্বার ছড়া লিখত। ছড়াগুলো পড়ে ভাল লাগত। লক্ষ্য করেছিলুম ছড়াগুলো রচনায় মুন্‌শীয়ানা। তাই আগ্রহ হয়েছিল তার লেখকের সম্বন্ধে। আমার আগ্রহের কথা জানিয়েছিলুম তখনকার দৈনিক স্বাধীনতার রবিবারের পাতার কর্মাধ্যক্ষ শ্রীঅরুণ রায়কে। তিনি বলেছিলেন—তোমার কাছে একদিন পাঠিয়ে দেব।

আমি তখন একটা বাংলা মাসিক সাহিত্য পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। একদিন পত্রিকার অফিসে আছি আমায় একজন খবর দিল যে আবদুল জব্বার নামে একজন দেখা করতে এসেছেন। আমার সঙ্গে সেদিনই জব্বারের পরিচয় হল। মসৃণ কালো চেহারায় কৈশোর অতিক্রান্তির চিহ্ন তখনো। জানলুম, সে গ্রামের ছেলে, দারিদ্র্যের জন্যে পড়াশোনার বিশেষ সুযোগ পান নি। কলকাতায় চাঁদনিচকে একটা লোহার দোকানে খাতা লেখার কাজ করেন। সেদিন তিনি কয়েকটি কবিতা এনেছিলেন। সেগুলি তিনি পড়লেন। এই কবিতাগুলো কিন্তু ছোটদের জন্যে ছড়া জাতীয় নয়, ছিল বড়োদের উপযোগী। তাঁর সঙ্গে সেদিন আমার কবিতা নিয়ে আলোচনা হল ; বললুম যে তাঁর কিশোর পাতায় প্রকাশিত ছড়াগুলো আমার আগেই ভাল লেগেছে।

তারপর থেকে জব্বারের মৃত্যুর কয়েক মাস আগে পর্যন্ত যোগাযোগ ছিল। লোহার দোকানে রাত আটটা-নটা পর্যন্ত কাজ করেও সাহিত্যচর্চা করেছেন, প্রাইভেট পড়ে পরীক্ষায় পাশ করেছেন, আবার রাজনৈতিক আন্দোলনে কখনো কখনো সামিলও হয়েছেন। এরই মধ্যে জব্বারের লেখা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু একটা জিনিস দেখেছি যে লেখা প্রকাশিত করার জন্যে তিনি কোন প্রতিক্রিয়াশীল পত্রিকায় ধর্ণা দেননি।

জব্বার কোন প্রত্যক্ষ রাজনীতি না করলেও ১৯৬২ সালে যখন আমাদের দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনে একটা ওলোট-পালোট হল, যখন অনেকেই জাতীয়তাবাদের স্রোতে ভেসে গেলেন, তখন তিনি সেই জাতীয়তাবাদের

স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেন নি। বরং ওর বিরুদ্ধে যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন যাঁরা কলম ধরেছিলেন, জব্বার ছিলেন সেই শিবিরের সহযোগী।

আমার বেশী করে মনে পড়েছে ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাসের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা। কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা ও অধিকাংশ কর্মী তখন জেলে। প্রতিক্রিয়াশীল চক্র কলকাতায় দাঙ্গা সুরু করল। জব্বার তখন তালতলার কোন একটা মেসে থাকতেন। আমি জব্বারের খোঁজ করি কিন্তু পাইনি। ক'দিন পরে আমার এক সাংবাদিক বন্ধু বলেন যে "জব্বারের খবর জান?" আমি বলি "জানি না।" সে বলল যে দাঙ্গার সময় জব্বারের মেস আক্রমণ হয়। জব্বার তখন দোতলার জানলা দিয়ে লাফ দিয়ে পড়ে পেছনের গলি দিয়ে পালিয়ে কোন রকমে প্রাণে বেঁচেছে।

জব্বারের সঙ্গে আমার কয়েকদিন পরে দেখা হয়। লাফিয়ে পড়ার সময়ে তাঁর পায়ে যে চোট লাগে সেটা তখনো সারে নি। সেদিন বলেছিলেন, "জানেন মার্কসবাদ আমি কিছু কিছু পড়েছি, কোনদিন ধর্মের কথা ভাবিনি, কিন্তু আমাকে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে এমন জায়গায় আশ্রয় নিতে হল যেখানে ধর্মীয় পরিচয়টা প্রধান।" সেদিন আরো জানান যে অনেক কষ্টে কেনা বইগুলো লুঠ হয়েছে আর নষ্ট হয়েছে তাঁর উপন্যাসের খসড়া। জব্বারের কাছে আমি একটা লেখা চেয়েছিলুম। মাসিক পত্রিকাটির দাঙ্গা বিরোধী সংখ্যার জন্যে। সেদিন তাঁর সেই "অবিস্মরণীয় দানবীয় দিনগুলি" কবিতাটি থেকে তাঁর মনোভাব ফুটে উঠে।

"আমরা চেয়েছিলাম শান্তি আর স্বাধীনতা
আর বন্ধুত্বের নির্ভরতা
সেই মানবিক কণ্ঠে বর্বর লোমশ থাবা!

হায়! এই দানবীয় মুহূর্তগুলো তার সব
মূল্যকে টুকরো টুকরো করে
ছিঁড়ে ফেলল!
মিলিত শ্রম আর বুকের রক্তে যে দেশ, যে ভারতবর্ষ
যে স্বাধীনতা গড়ে উঠত
নিজের; একান্ত করে

সেই প্রাণের, সেই ভালবাসার মর্মমূলে
আজ বিশ্বাসঘাতকতার ছবি।
এসো বন্ধু, সহযোগী
একবার এই পশুত্বের জগতে,
আমাদের সম্মিলিত হাত আজকেই রুদ্ধ করুক
বর্বরতার কণ্ঠ;
ভালবাসা, শান্তি আর স্বাধীনতার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে।

এর কয়েক বছর পরে জব্বার যে দোকানে কাজ করেন সেখানে তাঁর কাজ থাকে না। তারপর নানা জায়গায় চেষ্টা করেন। জব্বারের শুধু নিজের খরচ নয় তাঁর সাংসারিক দায়দায়িত্বও ছিল। এই সময় কখনো প্রুফ দেখে কখনো বা কোন কাগজে কিছু লিখে নিজেকে চালাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর কাজের অনেক চেষ্টা হয়েছে কিন্তু আমাদের এমনই সমাজব্যবস্থা যে তাঁর কাজ পাবার প্রধান অন্তরায় ছিল তাঁর নামটা। ইতিমধ্যে তাঁর শরীর নানা রোগে আক্রান্ত হলে সরকারী সাহায্যের প্রচেষ্টা হয় কিন্তু সেখানেও ব্যর্থ হয়।

আগেই বলেছি জব্বারের কোন প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগ ছিল না। ১৯৬৭-৬৮ সালে বাংলা দেশের কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতিতে আর একটা মোড় ঘোরে। হয়ত জব্বারের মনে কিছু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। আমার সঙ্গে যোগাযোগও থাকে না। তাঁর অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে যেদিন মেডিকাল কলেজ হাসপাতালে যাই সেদিনই তাঁকে বাড়িতে পাঠানো হয়। আমার সঙ্গে তাঁর আর দেখা হল না। মৃত্যুর সংবাদ পেলুম খবরের কাগজে।

জব্বারের খুব ইচ্ছে ছিল তাঁর কবিতার একটি সংকলন প্রকাশ করতে। কিন্তু আর্থিক অনটনে সম্ভব হয় নি। অনেকবার আমার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে, কিন্তু সব কিছুর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল—টাকা। আজকে ভেবে দেখা দরকার সেটা সম্ভব কিনা।

আমার সব থেকে বেদনা যে আমরা কিছুই করতে পারলুম না। হুগলীর এক অখ্যাত গ্রামে অখ্যাত কৃষকের ঘরে একটি কুসুম জন্মেছিল, পরিপূর্ণ বিকাশের বাসনা ছিল তার মনে, কিন্তু কৃপণ মাটি তাকে দিল না রস, তাই অকালে শুকিয়ে গেল।

ইকারাস

মিনার চূড়ায় অবস্থিতি
তথাপি উচ্চাশা কী যে অন্তহীন,

ঝাঁপ দিয়ে মহাশূন্যে, শূন্যের ভিতর
ইকারাসের পাখা তুচ্ছ গলে যায় রোদে
পাতাল প্রকৃতি কি অন্ধ ও ভীষণ বাস্তবিক !
ক্ষতছিন্ন হস্তপদ
জানি নাক' কোন তমসায় প্রাণ শিলীভূত
অন্তর্বাস খুলে কার কণ্ঠ, কে কথা কয় কে···
দুরাশা দুরন্ত বড় গতিশীল—

আমি হাঁটি তবু নক্ষত্রের ছায়াপথ-পথে
অপার আলোয় খ্যাত
কোথা তুমি শুভ্র মহাদেশ, মহানীল শূন্যতায়
অতলান্ত
পথ ও দেয়ালে ছায়া আমারই তো ছায়া পড়ে,
আমি কি মাটির টান ছিঁড়ে যেতে মাটিতেই রাখিনা দুই পা।

রক্তে রক্ত, অগ্নি হৃদয়ে আমার, বিক্ষত শরীর সারা দেহ
বাতাস সমুদ্রগর্ভে হে সখা প্রবাল,
হে উজ্জ্বল ধরিত্রী ধরণী
নমস্কার, শত নমস্কার !

(৫. ১. ৬২)

তোমাকেও যেতে হবে

তোমাকেও যেতে হবে আমাদের সহযাত্রী তুমি
একই পরিবহনের কাঠ খড় মাল মশলা পিঠে
গ্রহান্তরে
পায়ে মেখে ধুলোয় ধুলোর শূন্য কোটি ক্রোশ পথ
আলো-অন্ধকার-ভাঙা ভঙ্গুর বুদ্‌বুদের মত
ভেসে ভেসে
আদিগন্ত সমুদ্রে অপার।

দুপাশে ক্লান্তির বেড়া ঘন চোরা-বালি
হিম করকার বনে তুঙ্গ শৈলচূড়,
টিলায় টিলায় তাই গলে যাওয়া তুষারের স্রোতে
নির্ঝর তোমায় ডাকে
অনেক অনেক দূরে, আরো দূর প্রান্তরে ছড়ানো
তৃষ্ণা পিপাসার দূর ধূসর প্রদেশে।
সঙ্কুল গমনে চলো যাই চলো উত্তরাভিযানে
উত্তরণ ডাকে ঐ নক্ষত্রের আকাশসীমায়।
নীল অভ্রে জ্বালুক জ্বালুক বিভা মেঘমায়া
কটাক্ষের, মধুর কজ্জলে—
তুমি প্রসারিত হও
প্রধাবিত চিহ্নহীন যোজন ছাড়িয়ে,
জীর্ণ পড়ে থাক গুঁড়ো কালের কংকালে নষ্ট বিবসনা।
প্রাত্যহিক নিখিল সংসার।

তুমি শুধু বয়ে যাবে অন্তঃশীলা, নির্বাধ, প্রভাবী,
ইছামতী পাখা মেলে সময়ের গূঢ়স্ফীত নাভির ভিতর
থেকে আরো দিগন্তে নবীন—
রক্তের মতন মিশে, ঘন হয়ে ব্যাপ্ত হয়ে
প্রদোষেই আসন্ন সম্ভবা।

(৭. ১. ৫৯)

গল্প

দূরাপ

শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়

চারতলার ওপর একটা ঘর নিয়েছে অলোক। পাহাড়ী ছোট শহর। উঁচু নীচু রাস্তা। অলোকের বাসাটা উঁচুর উপর। ঘরটার উত্তর দক্ষিণে দুটো বড় বড় জানলা। উত্তরের জানলায় দাঁড়ালে দক্ষিণে বাতাস পিঠে সুড়সুড়ি দেয়। আরাম লাগে। অলোক এইজন্যেই উত্তরের জানালায় প্রায়ই দাঁড়িয়ে থাকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একাই দাঁড়িয়ে থাকে, দেখে অনেককে।

জানলাটার নিচেই, এ শহরের উত্তরমুখী দেহটাকে উলঙ্গভাবে দেখায়। বাড়িটা বেশ উঁচু সেইজন্য সে দেখে, তাকে কেউ দেখার চেষ্টা করে না। অতদূরে কেউ নজর দেয় না, বাড়ীটা তাই অলোকের পছন্দ। খানিকটা ওর স্বভাবের সঙ্গে মেলে। স্মৃতিকে যতবারই চিঠি লেখে বাড়ীটার আকর্ষণীয় দিকটা বাদ দিয়ে লিখতে পারে না।—টাকা থাকলে বাড়ীটা সে কিনে ফেলতো·········তবু চেষ্টায় আছি।

মন দিয়ে একটু কাজ করে পয়সা কড়ি একসঙ্গে কিছু জমলে, কয়েকটা বোনাসের টাকা বা একটা কে. সি. চ্যারিটি যদি লাগে·· ······ বাড়িওয়ালাকে এ ব্যাপারে দু একবার হিণ্ট দিতেও ভুলিনি। বিক্রি করার আগে যেন আমাকে একবার জিজ্ঞেস করে·· ···তাই বোধ হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা একাএকা রাস্তার দিকে চেয়ে থাকতে ক্লান্ত হয় না অলোক। ষ্টেশন থেকে নেমেই বড় রাস্তা ধরে দৈনিককার যাত্রীদের মিছিল। ওরা কত কথা কয়, সব কথা বোঝা যায় না, অফিস, কারখানার নানান সমস্যার কথা। ষ্টেশন থেকে বেরিয়েই পুবদিককার ফুটপাথে ভিখারীদের উপবেশন। কুষ্ঠরোগী, অন্ধ ও পঙ্গুদের পাশে ঐ মহিলা, যে ছেলে কোলে বসে আছে। তার ছেলের মাথায় সব সময় জলের পট্টি। সত্যি কি ছেলেটার অসুখ? অলোকের মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়। কিংবা ছেলেটাকে অসুস্থ করেই তার মা বেঁচে আছে। এটাও একটা জীবিকা। লোহার গরাদের পাশে দাঁড়িয়ে অলোকের মনে এরকম একটা প্রশ্ন মাঝে মাঝে নাড়া দেয়।

পশ্চিমের ফুটপাতে মোটা কাঁচের চশমা পরা হস্তরেখাবিদ নানা রঙের হাত দেখে সারাদিন। মানুষের ভাগ্য গণনা করে। কিন্তু জীবনের মধ্য বয়সেই এই গণৎকার পথে বসে। অলোক মনে মনে হাসে, যারা হাত দেখায় তারা বোধ হয় ওর হাতখানা দেখে না। যেমন অলোককে কেউ দেখতে পায় না·· ···ও দেখে।

রবিবার ভোরের চাটা শেষ করেই অতি ব্যস্ত হয়ে জানালায় দাঁড়ায় ও, প্রথমেই নজর পড়ে বাবু কলোনীর সেই মহিলার ওপর, আর তার ছোট দামাল ছেলেটা। বাজারের ব্যাগ হাতে সেই ভদ্রলোক ওদের সঙ্গে। অলোকের মনটা খুশীতে নেচে ওঠে ওদের দেখে। মহিলা দেখতে খানিকটা ওর স্মৃতির মত। ছেলেটা যেন বেটু।

একদিন এই পথ দিয়েই ওরা এসেছিল। ওর বদলী হয়ে আসার মাস দুই পর। তিলক আসতে চায়নি। একে কারখানার ইউনিয়নের সম্পাদক, তার উপর মাস দুই পরে নির্বাচন, অলোক যদিও ঐ কারখানার কোন বড়-দরের কারিগর, ইউনিয়নের সহসভাপতি। কোম্পানি ওকে এখানে বদলী করেছে সম্প্রতি। এই বদলীটাকে পছন্দ করে নেওয়ার ব্যাপারেও অলোকের সঙ্গে তিলকের বিরোধ!

এ সময়ে বাঙলাদেশ ছেড়ে আসা তিলকের পক্ষে অসম্ভব। নানা অজুহাত সৃষ্টি করে মাস পাঁচেক চিঠি লিখতে হয়েছে অলোককে। শেষ পর্যন্ত বেটুর অজুহাতটা কাজে লেগে গেল। "······খুব দামাল হয়েছে। স্মৃতি হাজার হলেও মেয়ে, প্রায় এক রাত্রি ট্রেন যাত্রা······ঐ দামাল ছেলে নিয়ে একলা··· ইত্যাদি ইত্যাদি।"

পাশের ফ্ল্যাটের মনোহর বাবুকে অনেকটা নিশ্চিন্ত করতে পেরেছিল ও।

তিলক আসছে। প্রায় গরজটা অলোকেরই দাঁড়িয়েছিল। মনোহর বাবুর বড় মেয়েকে ওর ভাল লেগেছিল, দেখতেও ভাল; পড়াশুনা করে। কলেজ-ইউনিয়নের একজন নেত্রী ও বহু সভা মিছিলের আগে আগে থাকে। বলতে কইতে পারে। তিলকের রাজনীতির সঙ্গে মিলও আছে। অবশ্য অলকের সঙ্গে তর্ক করে মেয়েটা······। এসব কথা ও স্মৃতিকেও জানিয়েছে। তাই আজ রাত ভোর থেকে জানালায়।······ওরা আসবে।

শীতের সকালের প্রথম সূর্য ষ্টেশন পাড়ার পুব উঠানে পড়তেই মিনিয়েল কোয়ার্টারে বাচ্চা ছেলেগুলো যেমন ধেই ধেই করে নাচতে আরম্ভ করে,

মাথায় ঢাকা চাদরগুলো ছুঁড়ে ফেলে দেয় তেমনি অলকেরও ইচ্ছে করে ছুটে নেবে যায় ওদের ওখানে। আজ তার জীবনে একটা স্মরণীয় দিন। তার পরিকল্পিত সংসার যাত্রার আজ নতুন এক দ্বার উদ্ঘাটন হবে। পৃথিবীতে মানুষের চাহিদা সব না মিটলেও মনের মত একটু হলেও অলোকের কাছে তা অনেক।—যেমন পাকিস্তান থেকে এসেই প্রথম দফায় দমদম অঞ্চলে খানিকটা জমি দখল করে নিল। তখন চাকরীটাও ছিল রেলের। লোন্ পেতেও বিশেষ কষ্ট হয়নি। মা বেঁচে থাকতে থাকতে বাড়িটায় হাত দিল। অবশ্য পুরোপুরি কাজ শেষ হবার আগেই—৪৯ সালের পুলিস রিপোর্টে চাকরীটাও গেল। তারপর কিছুদিন এক কাগজের সম্পাদনা। পড়তি আয়ে বেশ কিছুদিন ঢিমেতালে চলে। তিলক তখন পড়া ছাড়েনি পলিটেকনিকে সবে ঢুকেছে···। স্মৃতি মাষ্টারী করে একটা প্রাইমারী স্কুলে। বর্ষাকালে কষ্টের শেষ থাকেনা। প্রায়ই টালির ফাঁক দিয়ে জল পড়ে বিছানায়। হঠাৎ এক প্রোডিউসারের সঙ্গে পরিচিত হয়ে অলোকের জীবনে কিছুটা মোর ঘোড়ে। একটা কাহিনী বিক্রি করে হাজার পাঁচেক টাকা পেল। সেই সূত্রে বর্তমান চাকরীর উমেদারিটাও করে দেন ভদ্রলোক এই কম্পানির কর্তৃপক্ষের কাছে। তাই বলে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের পাস থেকে সরে দাঁড়ায়নি অলোক কোন দিনও। প্রতিটি জনসভায় শেষ বক্তা হিসাবে তার নাম শেষে থাকলেও শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের লক্ষ্যের পথ এমন সুন্দর ভাবে দেখাতে বোধ হয় অনেক নেতাই অক্ষম।

"মেয়েটা তর্ক করলেও অলোকের ভাল লাগে। এরকম একটা মেয়েকে আত্মীয় করে নিতে পারলে সংসারটা ভাল হবে। স্মৃতিও ওকে মানিয়ে নিতে পারবে। তিলকের সঙ্গে ওর বনবেনা কোন দিনও। তবু বিয়ে করলে ওর বাস্তব বোধ বাড়বে। আর তারপর ওরা ওর সঙ্গে বিরোধ করেই এগুক না, অলকের তাতে কোন দুঃখ নেই। ও দূর থেকে ওদের দেখবে।

এই ব্যাপারে তিলকের সঙ্গে ঝগড়া। তিলক বলে······সুবিধাবাদি। এক শ্রেণীর ভীরু জীব। এ ধরণের কথপোকথনে স্মৃতি বিরক্ত হয়। বলে শালীনতার বাইরে চলে যাচ্ছে······তিলক বুঝতে পেরে ঢোঁক গেলে। বৌদি দাদাকে কিছু বলো না। মানে রাজনীতিটা বড় ক্ষমাহীন। এখানে তোমার, আমার মা বাবা, স্বামী, স্ত্রী ভাই বোন ছেলে মেয়ের, কারুর ওপর

মায়া মমতার স্থান নেই। আর এর থেকে কেটে পড়বো বলেই দূরে যাওয়া যায়না।

আজ ওদের আসার কথা।

তিলক আসছে কি না আসছে স্পষ্ট করে না লিখলেও স্মৃতি আসছে। এসে অনেক কথাই শোনাবে তিলক—দেখলেতো দুনিয়ায় কারোর জন্যই কিছু আটকে থাকে না। ইতিহাসের একটা নিজস্ব গতি আছে।

তুমি পালিয়ে এসেছো বলে ইউনিয়নটা উঠে যায়নি। শ্রমিক শ্রেণী আরও এক ধাপ এগিয়ে গেছে। কংগ্রেসীরা অনেক ষড়যন্ত্র করেও যুক্তফ্রন্ট ভাঙতে পারেনি।

আর তুমি এই চারতলার লুকিয়ে থেকে কি পেলে, বুঝবে মজা। আখের ছিবড়ের মত সমস্ত রস নিঙড়ে নিয়ে ফেলে দেবে সমাজের আঁস্তাকুড়ে। অলক গোবেচারার মত জবাব দেয়; আমি ওখান থেকেই তোদের দেখবো। তোদেরই জয় হোক, না হয় আমি মিছিলের আগে ভাগে কোনদিন দাঁড়াতে পারলাম না তা বলে তোদের আঠাশ দফা দাবীতে স্বাক্ষর দিতে কোনদিন কার্পণ্য করিনি। তোদের ভালবাসি, সংসারকে ভালবাসি। একটা সুখী পরিবারের স্বপ্ন যদি ত্যাগ না করে থাকতে পারি……।

"তা ছাড়া এরকম তো অনেকই আছে, যারা বাড়িঘর ছেলেমেয়ে নিয়ে ওয়েল অফ। ইংলিস মিডিয়ামে ছেলেমেয়েদের এডুকেশন দেয়। ভাল ফ্ল্যাটে থাকে আর তোমার আমার মত ফেকলু মজুরদের জনসভায় সমাজ তান্ত্রিক বিপ্লবের মহান বাণী শুনিয়ে যায়। তাদেরও আমি দোষ দিনা। মোহ বড় জিনিস বুঝলে ভায়া, জীবন শুরু কর তারপর বুঝবে……।

অলক সেন অনুভব করে তিলকের কান দুটো এবার লাল টক্‌টকে হয়ে উঠবে। যেমন ছেলেবেলায় বাবা যখন ওর সন্দেশের ভাগ থেকে অন্য কাউকে দিত তখন যেমন রেগে লাল হয়ে যেত। বলতো, এর পর দেখব, যদি সমান সমান ভাগ না কর।

তিলক নিশ্চয় দাঁত খিচিয়ে কান লাল করে বলবে, জ্ঞান পাপীর মত কথা বলে লাভ নেই। সেদিন খুব দূরে নয় এই সব পেটিবুর্জোয়াদের আর সহ্য করবে না বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি।

হঠাৎ চমকে ওঠে অলক। ট্রেনটা এলো। চলেও গেল। সব যাত্রীরাই এদিক ওদিক চলে যায়। তিলক তো আসে না। সবার পিছনেও ও নেই।

স্মৃতি আর বেটু। কাঁধে একটা ব্যাগ নিয়ে আসছে স্মৃতি। ও ব্যাগটা তিলকের কাঁধেই গতবার ছিল। স্মৃতি একা কেন? উল্কার গতিতে নেমে আসে অলক। সঙ্গে মনোহরবাবু আর তাঁর মেয়ে।—কি হ'ল স্মৃতির? তিলক! নাঃ, ও আসবে না, আর কোনদিনই আসবে না। পায়ের তলার মাটি দুলতে থাকে অলকের। কেন কি হলো?—ওকে খুন করেছে কারা নির্বাচনের দিন। আমি ইচ্ছে করেই কাগজে ওর নামটা দিই নি।

তুমি দূরে থাক বলে। কাছে থাকলে বোধ হয়……।

বিকট চিৎকার করে ওঠে অলক। চোখ দুটোয় জল বাধা মানে না। বলে "থাক স্মৃতি, আর বলো না, জানি আজ তোমরা আমায় কি বলবে"
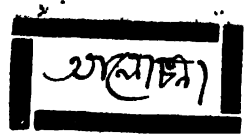
বিষহরির লাভান্

দুলাল চৌধুরী

মালদহের মনসাপূজার একটি অনুষ্ঠান

মনসার অন্যনাম বিষহরি। বিষ যিনি হরণ করেন তিনিই বিষহরি। লাভান* অর্থ ভর করা। এটি বরেন্দ্রী ভাষার একটি বিশেষ আঞ্চলিক শব্দ। এই স্ত্রী দেবতা মূলত প্রাক্-আর্যসভ্যতার অবদান। আর্যেতর সমাজের মাতৃমূর্তির বা শক্তির ভয়াল রূপই হল মনসা। দক্ষিণ ভারতেও অনুরূপভাবে মনসা, মঞ্চাম্ম, মুদামা প্রভৃতি মূর্তির সৃষ্টি হয়। মনসা একটি বৃক্ষনাম বটে, যাকে বলা হয় স্নুহীবৃক্ষ (Cactus Indianis)। মনসা পূজা বাংলা দেশে অত্যন্ত প্রাচীন।

উত্তরবঙ্গের মালদহ জেলার মনসার ভাসান উপলক্ষে এক তাৎপর্যপূর্ণ অনুষ্ঠান আষাঢ় মাসের শেষ সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত হয়। বিগত আষাঢ় মাসে আমি সরেজমিনে অনুসন্ধান করে নিম্নলিখিত অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে বিবরণ সংগ্রহ করেছি।

উত্তর মালদহ জেলার রতুয়া ও খরবা থানার অনেক গ্রামেই 'বিষহরির পালা' অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের আঞ্চলিক নাম: 'বিষহরির লাভান্'। এই 'বিষহরির লাভান্' অনুষ্ঠান দ্বিবিধ পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্যায়ের নাম: গেঁজা বাড়ী। দ্বিতীয় পর্যায়ের নাম: আলক্ বাড়ী।

॥ এক ॥ গেঁজা বাড়ী: আষাঢ়ের প্রথম দিন থেকে আষাঢ় সংক্রান্তি পর্যন্ত ছোট একটি মাটির বেদীতে সিজ্ মনসা পল্লব দেওয়া হয়। বেদীর চারপাশে ধান ছড়িয়ে দেওয়া হয়। সমস্ত আষাঢ় মাস ধরে পূজা চলে, এবং ধানে জল দেওয়া হয় প্রতিদিন। ফলে ধানগুলি গেঁজে ওঠে এবং শিস্ বের

*সম্ভবতঃ 'লাফান্' শব্দ থেকে 'লাভান্' এসেছে। লাফ্ < লাফান্ < লাভান্।

হয়। শুক্লপক্ষের পঞ্চমীতে সাদা কচুপাতা দিয়ে পুজা করা হয়। এই পুজাকে বলা হয়ঃ পুরোই পঞ্চমী। কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমীতে কালো কচু পাতা দিয়ে পুজা করা হয়। এই পুজাকে বলেঃ কালী পঞ্চমী। শ্রাবণ মাসের শেষ সংক্রান্তিতে হয় মজুস পুজা। শোলা, কাগজ দিয়ে কলার ভেলা সাজানো হয়। শ্বেত হংসবাহন মনসা, তাঁর পাশে জেলে। জেলের হাতে, গদা। আর পাশে থাকে বেহুলা-লখিন্দর। মনসার মাথার ওপর শোলার সাপ থাকে। ভাদ্র মাসের পয়লা তারিখে 'ভাসান' হয়। ভাসানের দিন সকালে মুক্তোপাতা, পঞ্চশস্য, আদা, হলুদ খৈ, দৈ দিয়ে পুজো হয়। ভক্তরা ফুল, পাতা নিয়ে পুকুরের ধারে মনসার পাঁচালী শুনতে যায়। ভাসানান্তে বাড়ী ফিরে পাটের শাক, অম্বল, গেঁজানো গোটা মুগের ডাল বেটে বড়া করে দৈ দিয়ে খায়। সমগ্র আষাঢ় মাস মনসার পালা গান হয়। পদ্মাপুরাণও পাঠ করা হয়।

। দুই। আলক্ বাড়ী :—এই অনুষ্ঠানে ঘট, ধান কিছুই বসানো হয় না। আষাঢ় শ্রাবণ সংক্রান্তিতে, শুক্ল ও কৃষ্ণ পঞ্চমীতে এবং ভাসানের দিন পুজোকে বলে আলক্ বাড়ী। শুধু আলাম দেওয়ার রীতি ছাড়া বাকী সব আচারই গেঁজা বাড়ীর মতন। আষাঢ়ের সাড়ে সাতদিন অন্তে মূর্তি গড়ে পুজো হয়। বিশেষ করে জেলে, কৈবর্ত, হাড়ি, কুড়োল শ্রেণীর লোকেরা এই অনুষ্ঠান পালন করে। আল্‌কবাড়ীর অনুষ্ঠানেই 'লাভান্' হয়। লাভানে ভক্ত ঢাকের বাজনার তাল তালে কাদার উপর গড়াগড়ি দেয়। ডিম, ছাগল, পায়রা ইত্যাদি মানত দেওয়া হয়। ভক্তা নাচের তালে তালে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। অকস্মাৎ চেঁচিয়ে ওঠে এই বলে : 'বাচ্ছা খাম্, বাচ্ছা খাম্'। তখন ভক্তদের মধ্য থেকে পায়রার বাচ্ছা ছুঁড়ে দেয় সেই নৃত্যশীল উন্মত্ত ভক্তাকে। সে পায়রার মুণ্ডচ্ছেদ করে তৎক্ষণাৎ এবং পায়রার মুণ্ড নির্গত রক্ত পান করতে থাকে। রক্ত পানান্তে সে শান্ত হয়। পরদিন মনসার মূর্তি জলে বিসর্জন দেওয়া হয়। এই পুজোর পুরোহিত নিম্নবর্ণের লোক। মন্ত্র তাদের নিজস্ব। শাস্ত্রীয় কোন আচার এতে নেই।

মন্তব্য : গেঁজা বাড়ী ও আলক্ বাড়ী অনুষ্ঠানদ্বয়ের আচার বিশ্লেষণ করলে একথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে উত্তরবঙ্গের এই অঞ্চলের মনসার ভাসানের সঙ্গে নিষাদাচার সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। 'লাভান্' বাংলার সর্বত্র সুলভ নয়।

পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রামে অনুরূপ কর্দম নৃত্য দেখেছি। তবে রক্তপানের নেশা সেখানে দুর্লভ। মনে হয়, মালদহের অনুষ্ঠানই আদিম। এবং এতে আদিম নিজস্বতা অটুট রয়েছে। প্রজনন বা উর্বরতাবাদের সঙ্গে ইন্দ্রজাল যুক্ত হয়ে এই অনুষ্ঠান এই অঞ্চলে অনন্যতা লাভ করেছে। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আরও কত বৈচিত্র্যময় আচার-অনুষ্ঠান রয়েছে তার অন্ত নেই। এগুলিই বাঙালীর লোকসংস্কৃতির মৌলিক উপকরণ। বঙ্গ-সংস্কৃতির সংস্কৃত করণের পূর্বযুগের স্মৃতিবহ বিষহরির এই অনুষ্ঠান বিশস্ত-ভাবেই লোকায়ত।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র

হারাণচন্দ্র নিয়োগী

রাজা রামমোহন রায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে যে সব বুদ্ধিজীবী উনবিংশ শতাব্দীতে সারা বাংলায় নবচেতনা ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁদের অন্যতম।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও কিছু হৃদয়বান ইংরেজের প্রচেষ্টায় বাংলা দেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন হয়। শাসকশ্রেণীর অবশ্য লক্ষ্য ছিল কিছু ভারতীয়কে ইংরেজী শিক্ষা দিয়ে শাসনবিভাগের কার্যোপযোগী করে তোলা—কিন্তু এরই ফলে পাশ্চাত্ত্য ব্যক্তিস্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও পাশ্চাত্ত্য বস্তুনিষ্ঠ ধ্যানধারনার প্রসার হতে লাগলো। শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা অনুভব করলেন যে ইংরেজ জাতির সমকক্ষ হতে গেলে এ দেশে পাশ্চাত্ত্য যুক্তিবাদী জ্ঞানের বহুল প্রচলন প্রয়োজন এবং তা ইংরেজ শাসনের সাথে সহযোগীতার মধ্য দিয়েই মাত্র সম্ভব।

ভারতের অগ্রগতির পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা ছিল তার যুগসঞ্চিত ধর্মীয় গোঁড়ামী, কুসংস্কার ও জাতিভেদ। রামমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হিন্দু সমাজের নানা কুপ্রথা—বিশেষ করে সতীদাহ, বিধবা বিবাহ ও জাতিভেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু করেন। রামমোহনই প্রথম শাসন সংস্কারের জন্য রাজনৈতিক আন্দোলনেরও গোড়াপত্তন করেন। নবজাগরণের যুগের এই সব ছোট বড় নানা রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন বালক রাজেন্দ্রলালের জীবনকে প্রভাবিত করতে থাকে।

১৮২৩ সালে রামমোহনের নেতৃত্বে দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি ব্যক্তি-

---

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র—ডঃ শিশিরকুমার মিত্র। সারস্বত লাইব্রেরী, ২০৩ বিধান সরণী কলিকাতা-৬। দাম তিন টাকা।

স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতীয় প্রেস এ্যাক্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন করেন। তরুণ ছাত্র সমাজের মনে হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ডিরোজিও যুক্তিবাদী চিন্তাধারা প্রোথিত করার সাথে সাথে ফরাসী বিপ্লবের দর্শন ও আদর্শও তাদের কাছে তুলে ধরছিলেন। ১৮৩০এর ফরাসী বিপ্লব ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে উদ্দীপনার বান এনে দিলো। কলকাতা টাউন হলে বিপ্লবের সমর্থনে সভা হলো এবং অত্যুৎসাহী কে বা কারা গোপনে অক্টোরলনী মনুমেণ্টের শীর্ষে ফরাসী বিপ্লবের ত্রিরঙা পতাকা উড়িয়ে দিলো। এর পরই রামমোহনের নেতৃত্বে ১৮৩৩এ Charter Actএর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সুরু হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর Landholders Socity নামে এক সংগঠন গড়ে তুললেন, যাকে রাজেন্দ্রলাল ভারতের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলনের সংস্থা বলে উল্লেখ করেছেন।

এই রাজনৈতিক পরিবেশে রাজেন্দ্রলালের শিক্ষাজীবন সুরু হয় এবং তিনি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। তৎকালীন রাজনৈতিক নেতা দ্বারকানাথের স্নেহভাজন রাজেন্দ্রলাল দ্বারকানাথের আনুকূল্যে বিলাত যাওয়ার সুযোগ পেলেন, কিন্তু মেডিক্যাল কলেজের ঘটনায় তাঁর লেখাপড়াই ব্যাহত হলো। ডঃ মিত্র তাঁর 'রাজেন্দ্রলাল মিত্র' শীর্ষক পুস্তকে বলেছেন যে, "১৮৪১ খৃষ্টাব্দের মে মাসে মেডিক্যাল কলেজে এক অপ্রীতিকর ঘটনার উদ্ভব হয়। এই ঘটনায় জড়িত বন্ধুদের পরিচয় প্রকাশ করতে রাজেন্দ্রলাল অসম্মত হলে তাঁকে কলেজ থেকে বিদায় নিতে হয়।" আমাদের অনুমান ঘটনাটি রাজনৈতিক এবং খুবই গুরুতর। এই অনুমানের সমর্থন পাওয়া যায় 'Ries and Rayyat' পত্রিকার তদানীন্তন সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখার্জির বিবৃতি থেকে। তিনি লিখেছেন—"কলেজে একটা হাঙ্গামা হয় এবং ছাত্রদের বিরুদ্ধে গুরুতর দুর্ব্যবহারের অভিযোগ আসে। যদিও রাজেন্দ্রলালের বিরুদ্ধে কোন নির্দিষ্ট অভিযোগ ছিল না, কিন্তু তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি যা জানেন তা প্রকাশ করবেন না। ঘটনা সম্পর্কে অনুসন্ধান কালে তিনি সহপাঠীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে অস্বীকার করলেন। ফলে কলেজের অধ্যক্ষের সহানুভূতি সত্ত্বেও অপরাপর ছাত্রের সাথে রাজেন্দ্রলালকেও বহিষ্কার করা হল।"

এই ঘটনার ২ বছর পর হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা টাউন হলে এক সভার আয়োজন করে Indian Civil Service-কে একচেটিয়া করে

রাখার বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ করেন। ঐ সভায় তারাচাঁদ চক্রবর্তী জ্বালাময়ী ভাষায় অভিযোগ করেন যে এই সব বাধা নিষেধের ফলে ভারতীয় প্রতিভা বিকাশ লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

শেষোক্ত ঘটনা থেকে অনুমান করা যায় যে বাংলা দেশের ছাত্র-সমাজ তৎকালে কি গভীর ভাবে রাজনৈতিক চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই সঙ্গে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সাথে ঘনিষ্ঠতা ও মেডিক্যাল কলেজের ঘটনা মিলিয়ে দেখলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে রাজেন্দ্রলাল ছাত্রজীবনেই রাজনীতির সাথে পরিচিত হয়েছিলেন এবং তা তাঁর সমগ্র উত্তরজীবনকে প্রভাবিত করেছিল।

এর পরের রাজনৈতিক ঘটনা সিপাহী বিদ্রোহ। বাংলার খুব কম বুদ্ধিজীবীই বিদ্রোহীদের সমর্থন করতে পেরেছিলেন। বোধহয় তাঁরা বৃটিশ শাসনের মধ্য থেকে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও গণতান্ত্রিক ভাবধারায় ভারতবাসীকে মণ্ডিত করতে চেয়েছিলেন এবং ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। সেইজন্য দেখতে পাই যে Hindoo Patriot পত্রিকা একদিকে সিপাহীদের বাড়াবাড়ির নিন্দা করছেন, অন্যদিকে ইংরেজদের প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিকে নিরস্ত করার চেষ্টা করছেন শুভবুদ্ধির কাছে আবেদন করে।

প্রায় সমসাময়িক কালের আর একটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনা হল নীল বিদ্রোহ। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী ও পাবনার নীল চাষীরা দাদনের টাকা নিতে ও নীল চাষ করতে অস্বীকার করলো। নীল-কুঠিয়াল সাহেবদের পৈশাচিক নির্যাতন শুরু হলো চাষীদের ওপর। Hindoo Patriot-এর তদানীন্তন সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র মুখার্জি তীব্র ভাষায় নীলকর সাহেবদের অমানুষিকতার বিরুদ্ধে লিখতে লাগলেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রও এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলেন। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের প্রতিবাদে আয়োজিত সভায় রাজেন্দ্রলাল বললেন—

"অনধিকার হস্তক্ষেপকারীদের মুখে কি এরূপ অভিযোগ করা সাজে? যে সব গুণ ইংরেজ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, তার লেশমাত্র বর্জিত এবং ইংরেজ চরিত্রের সকল দোষে ভূষিত এই সব দুঃসংহাসী নীলকর ইংরেজগণ যেখানেই গেছে সেখানেই ধ্বংস ও সর্বনাশ ডেকে এনেছে। দক্ষিণ আমেরিকার প্রেইরী অঞ্চলের রেড ইণ্ডিয়ানদের জিজ্ঞাসা করুন, তারা বলবে যে শত বৎসরে ওদের

সাথে বিরোধের ফলে তাদের জনসংখ্যা পাঁচ লক্ষ থেকে চল্লিশ হাজারে এসে দাঁড়িয়েছে। কিসের লোভে ইংল্যাণ্ড ও হল্যাণ্ডের এই সব আবর্জনা আতিথেয়তাশূন্য মধ্য আফ্রিকার জনবিরল অঞ্চলে এসে হাজির হয়েছিল? অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডে আজও ওদের সাথে স্থানীয় অধিবাসীদের সংগ্রাম চলছে এবং অল্পকালের মধ্যেই স্থানীয় অধিবাসীরা অতীতের বস্তু হিসাবে পরিগণিত হবে। তবু এই ডানপিটের দল ভারতীয় হিন্দুদের সাথে বিরোধের ভয়ে ভীত বলে ভাণ করে। ইংল্যাণ্ডে বসবাস করা অসম্ভব হয়ে পড়ায় এরা এখানে এসেছে, এসেছে আমাদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভিযোগ করতে। এরাই আবার ওদের শক্তি, শিক্ষা, উন্নত সভ্যতার বড়াই করে, তারা ভারতে যে মূলধন এনেছে তাতে বহুলোকের কর্মসংস্থান হয়েছে বলে গর্ব করে। অথচ তিল থেকে তাল তৈরীর এমন ভাল নজির বোধ হয় আর নেই। এদেশে মোট যে নীল উৎপাদিত হয় তার দাম ১৫ লক্ষ টাকা ধরলে, ভারতের কৃষিতে বৃটিশ মূলধনের পরিমাণ হবে এক কোটি টাকার মত—এবং এরই জন্য আমাদের নীলকরদের অভিশাপ বহন করতে হচ্ছে, যে নীলকরেরা তাদেরই স্বদেশবাসী মিশনারীদের দ্বারা জঘন্য পরপীড়ক বলে নিন্দিত হয়েছে, এবং যারা নির্বিচারে শান্ত চাষীদের সর্বনাশ করে চলেছে। ভার্জিনিয়ার মালিকদের ছাড়া অপর কারো সাথে এদের তুলনা চলে না।"

কলকাতা টাউন হলে রাজেন্দ্রলাল এই বক্তৃতা দেওয়ার পর ইংরেজ মহলে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয় এবং তাঁকে ইংরেজ প্রাধান্যপূর্ণ Photographic Socity থেকে বহিষ্কার করার জন্য এক সভা ডাকা হয়। সেই সভায় একমাত্র মেজর Thullier নামে সহৃদয় ইংরেজ রাজেন্দ্রলালের পক্ষ সমর্থন করে বলেন যে তাঁর বক্তৃতা নীলকরদের বিরুদ্ধে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে নয়। যাই হোক রাজেন্দ্রলালকে বহিষ্কার করার প্রস্তাব পাশ হয়ে যায়।

* "স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম যুগে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবীরা যে কি বিপুল ভাবে বিদেশী বিপ্লবী ভাবধারায় প্রভাবিত হয়েছিলেন তার একটি উদাহরণ আগেই দিয়েছি। Home Rule-এর দাবী দ্বিতীয় উদাহরণ। ১৮৭০ সালে Butt Isaac নামে জনৈক আইরিশ জননেতা 'The Home Rule Association' নামে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। উদ্দেশ্য ছিল ইংল্যাণ্ডের অধীনতা পাশ থেকে মুক্ত করে আয়ারল্যাণ্ডকে স্বাধীন করা। এই সংগঠনের নেতৃত্বে আয়ারল্যাণ্ডে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়। ঠিক একই যুগে কৃষ্ণদাস পালের Home Rule-এর দাবী আইরিশ রাজনীতির প্রভাব বলেই অনুমান হয়।"

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের রাজনৈতিক জীবনের এখানেই শেষ নয়। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 'বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসানের' সক্রিয় সভ্য। পরে এই সংগঠনই 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসান' নাম গ্রহণ করে এবং পরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাথে মিলিত হয়। জাতীয় কংগ্রেসেও রাজেন্দ্রলাল সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। যে Hindoo Patriot নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করেন, যে পত্রিকায় কৃষ্ণদাস পালের লেখনীতে সর্বপ্রথম Home Rule-এর দাবী ওঠে, সেই Hindoo Patriot-এর তিনি কিছুকাল সম্পাদক ছিলেন। ডঃ মিত্র তাঁর গ্রন্থে রাজেন্দ্রলালের জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটি সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছেন। তার কারণ অবশ্য এই যে তিনি ঐতিহাসিক হিসাবে রাজেন্দ্র-চরিত্রের মূল্যায়ন করতে চেয়েছেন।

রাজেন্দ্রলাল চিকিৎসা বিদ্যা ও আইন অধ্যয়ন করেও যে সংস্কৃত ও প্রাচীন ইতিহাস চর্চা সুরু করেছিলেন তারও মূলে ছিল স্বদেশ প্রেমের প্রেরণা। তৎকালে ইংরেজদের দ্বারা লিখিত ইতিহাস পুস্তকগুলি ভারতীয়দের প্রতি কটূক্তি ও কুৎসাপূর্ণ। কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ Sir Roper Lethbridge প্রণীত 'The History of India'-তে বলা হয়েছে যে মুসলমান আক্রমণের পূর্বে ভারতের কোন ইতিহাস নেই। নবাব সিরাজদ্দৌলাকে 'নিষ্ঠুরতা ও লালসার দানবীয় মূর্তি' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। James Mill প্রণীত 'The History of British India'-তেও ভারতবাসী সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য লেখা হয়। এতে বুদ্ধিজীবী শ্রেণী স্বভাবতই ক্ষুব্ধ হন। অনেককাল পরে হলেও রবীন্দ্রনাথ সেই ক্ষোভকে যথাযথ প্রকাশ করেছিলেন—"যে সকল দেশ ভাগ্যবান তাহারা চিরন্তন স্বদেশকে দেশের ইতিহাসের মধ্যেই খুঁজিয়া পায়। বালক কালে ইতিহাসই দেশের সহিত তাহাদের পরিচয় সাধন করাইয়া দেয়। আমাদের ঠিক উল্টা। দেশের ইতিহাস আমাদের স্বদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মামুদের আক্রমণ হইতে লর্ড কার্জনের সাম্রাজ্য-গর্বোদ্গার কাল পর্যন্ত যে কিছু ইতিহাস কথা তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে বিচিত্র কুহেলিকা, তাহা স্বদেশ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টির সহায়তা করে না, দৃষ্টি আবৃত করে মাত্র।" তাই "আমাদের ইতিহাসকে আমরা পরের হাত হইতে উদ্ধার করিব...আমাদের পাঠকবর্গকে লেথব্রীজ সাহেবের চটির মধ্যে হইতে বাহির করিয়া ইতিহাসের উন্মুক্ত ক্ষেত্রের মধ্যে আনিয়া উপস্থিত করিব।" নিঃসঙ্কোচে

বলা যায় যে রাজেন্দ্রলালের ইতিহাস ও সংস্কৃত চর্চার মূলে ছিল অনুরূপ জাতীয়তার প্রেরণা। তাছাড়া প্রাচীন ভারতের গৌরব প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ভারতের জাতীয় ঐক্য লাভ ঘটবে। হিন্দু ধর্মের কুসংস্কার ও জাতিভেদ যা জাতীয় ঐক্যের পথে বাধা এবং যার বিরুদ্ধে রামমোহন ও বিদ্যাসাগর আন্দোলন করেছেন, তার মুলেও আঘাত দেওয়া হবে।

উনবিংশ শতাব্দীতে কিছু ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী ভারতীয় আচার ব্যবহার ও রীতিনীতিকে ঘৃণার চোখে দেখতে সুরু করেন, তাঁরা ইংরেজীতে কথা বলতেন, ইংরেজীতে ভাবতেন, ইংরেজীতে স্বপ্ন দেখতেন। এই শ্রেণীর উন্মার্গগামীদের কাছে প্রাচীন ভারতের ঐশ্বর্য তুলে ধরাও রাজেন্দ্রলালের উদ্দেশ্য ছিল।

এই সময় কিছু কিছু পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা সুরু করেন। তাদের মধ্যে Maxmuller, Wilson, Fergusson ও Alexander Cunninghum বিশেষ উল্লেখযোগ্য। Cunninghum ১৮৬১ সাল থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও খননকার্য সুরু করেন। এই সব পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতের কার্যাবলী ও এসিয়াটিক সোসাইটির সাথে সম্পর্ক রাজেন্দ্রলালকে পুরাতত্ত্ব সাধনায় অনুপ্রাণিত করে।

ডঃ মিত্র সঠিকভাবেই মন্তব্য করেছেন—"প্রকৃত ইতিহাস রচনায় ঐতিহাসিকের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন—ভাবাবেগের প্রবণতা ও পক্ষপাত দুষ্টতা থেকে যথাসম্ভব মুক্ত করে প্রাপ্ত তথ্যাদির একটি যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণের ওপর বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করা, সেই সঙ্গে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে যেন সেই যুগচিত্রের আলোচনায় মানবিকতার আবেদন প্রতিফলিত হয়···তিনি এই মতবাদ সতর্কতার সাথে অনুসরণ করেছিলেন।" আমরা সত্যই দেখতে পাই স্বদেশপ্রেমের ভাবাবেগ কোথাও রাজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক যুক্তিকে আচ্ছন্ন করতে পারে নাই—তা লিপি পাঠোদ্ধারের ব্যাপারেই হোক, আর জটিল মুদ্রাতত্ত্ব বা স্থাপত্য-শিল্প আলোচনার ক্ষেত্রেই হোক। তিনিই পুরাতত্ত্ব-বিদ্যায় প্রথম ভারতীয় পথিকৃৎ—তাঁরই প্রদর্শিত পথে একই অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে প্রাচীন ভারতের রত্ন অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছিলেন—রমেশচন্দ্র দত্ত, তিলক, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ননীগোপাল মজুমদার, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল, ভাণ্ডারকর, এ. সি. দাস, অক্ষয়কুমার মৈত্র ও হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রভৃতি পণ্ডিতগণ।

প্রত্নতত্ত্বের গবেষণায় রাজেন্দ্রলাল যেমন স্বদেশপ্রীতিকে অহেতুক প্রশ্রয় দেন নাই, তেমনি বিদেশী পণ্ডিতগণের ভারতবর্ষকে হীন করার চেষ্টা তার তীব্র সমালোচনায় চূর্ণ হয়েছিল। রাজেন্দ্রলালের ভাষায়—"স্বদেশপ্রীতি বলতে যদি বোঝায় ভালমন্দ নির্বিশেষে আমাদের যা কিছু, তার প্রতি সুতীব্র অনুরাগ তবে সে স্বদেশ প্রীতি আমার জন্য নয়।"

Fergusson, Wheeler প্রভৃতি পণ্ডিতগণ দাবী করেন যে ভারতীয়েরা স্থাপত্যবিদ্যা গ্রীকদের কাছ থেকে শিখেছিল। রাজেন্দ্রলাল তারই প্রতিবাদে Origin of Indian architecture লেখেন এবং দেখান যে ভারতীয় স্থাপত্যধারা সম্পূর্ণভাবে তারই নিজস্ব—কারো কাছ থেকে ধার করা নয়। এই লেখার ওপর আপত্তি জানিয়ে Fergusson আবারও একই দাবী তোলেন। রাজেন্দ্রলাল Buddha Gaya প্রবন্ধে তা পুনরায় খণ্ডন করেন।

Buchanan Hamilton মত প্রকাশ করেন যে প্রাচীন হিন্দুরা সূঁচের দ্বারা সেলাই করা পোষাক তৈরী করতে জানতেন না। রাজেন্দ্রলাল Style of dress in ancient India প্রবন্ধে প্রাচীন শিল্পনিদর্শনগুলি ও প্রাচীন সাহিত্য থেকে ভূরি ভূরি প্রমাণ সহযোগে ঐ মত খণ্ডন করে দেখালেন যে হিন্দুরা বহু প্রাচীন কাল থেকেই সূঁচে তৈরী পোষাক ব্যবহার করতেন।

হিন্দু সমাজ ছিল অহেতুক গোঁড়ামী ও কুসংস্কারে ভরা। ত্যাগ ও সংযমকে ভারতীয় আদর্শ বলে প্রচার করা হতো। সমাজে মদ্যপান ছিল অত্যন্ত নিন্দনীয়। সংস্কারমুক্ত রাজেন্দ্রলাল প্রাচীন সাহিত্য থেকে উদাহরণ সহযোগে লিখলেন—"কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদের সম্পর্কেই বেদে নানা বিধিনিষেধ, ক্রিয়াকাণ্ড, উৎসব, আচারনিয়ম, উপবাস ও কৃচ্ছ্রতার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল"। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা ছিল সমাজের এক সামান্য অংশ। উদ্দেশ্য ছিল তাদের উদাহরণ সমাজে ব্যভিচার রোধ করবে—এসব কিন্তু বৃহত্তর জনসাধারণকে দীর্ঘকাল ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ডে ব্যপৃত রাখতে পারে নাই। জনসাধারণ যথেচ্ছ আহারবিহার, মদ্যপান ও বিনা বাধায় জীবনকে উপভোগ করতেন। এমন কি ব্রাহ্মণদেরও যজ্ঞীয় ক্রিয়াটুকু বাদ দিয়ে জীবনে মধু ও আনন্দ উপভোগের পথে কোন বিধিনিষেধ ছিল না। 'সাংখ্যায়ণ কামসূত্রের' লেখক সাংখ্যায়ন ঋষি নানা পদ্ধতিতে নারীর সঙ্গসুখ ভোগের বিবরণ দিয়েছেন দেখতে পাই।" এই প্রসঙ্গে রাজেন্দ্রলাল হরিবংশ থেকে বলদেব

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের বনভোজনের বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে বলেছেন, "সর্ব দেশে সর্বকালে নীতিবাগীশেরা মদ্যজাতীয় পানীয় গ্রহণ অযৌক্তিক বলে নিন্দা করেছেন। কিন্তু ঋষিগণের ও নীতিবাগীশদের সদুপদেশ, বৈজ্ঞানিকদের পরামর্শ, কোথাও মদ্যের ব্যবহার বন্ধ করতে পারে নাই।"

দেশাচারের ফলে হিন্দুদের গোমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই বিষয়কে কেন্দ্র করে ভারতের দুটি বৃহৎ ধর্মগোষ্ঠী, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিরোধ সেদিনও ছিল, আজও আছে। রাজেন্দ্রলাল বৈদিক সাহিত্য উদ্ধৃত করে দেখালেন যে গোমাংস ভক্ষণ হিন্দু সমাজে নিষিদ্ধ তো ছিলই না, বরং যজ্ঞকার্যেও অতিথি আপ্যায়নে গোমাংস বিশেষ আদৃত ছিল। রাজেন্দ্রলাল লিখলেন, "এদেশে গোহত্যাকে কেন্দ্র করে অনেক রক্তাক্ত বিরোধ ঘটে গেছে। কিন্তু আমাদের দেশে এমন এক সময় ছিল যখন গবাদিপশু হত্যা সম্পর্কে মানুষের মনে কোন বিবেক যন্ত্রণা ছিল না।... পুণ্যাত্মা হিন্দুদের পক্ষে গোমাংস ব্যবহার পরলোক যাত্রা কালে অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল এবং একটি গোহত্যা করে মৃতের সাথে দাহ করা আবশ্যিক ছিল।"

রামমোহন ও বিদ্যাসাগর সমাজ সংস্কারের জন্য যে আন্দোলন পরিচালনা করছিলেন তাতে সমর্থন যোগাবার জন্য রাজেন্দ্রলাল তাঁর পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাসের বিদ্যা ব্যবহার করেন। মৃতদেহ সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে রাজেন্দ্রলাল শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে, "প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা ব্রাহ্মণের মৃতদেহ স্থানান্তরিত করার কাজে শূদ্র জাতির লোক নিয়োগ দোষাবহ মনে করেন নাই, অথচ বর্তমান যুগের স্মৃতিকারেরা এটা দোষাবহ বিবেচনা করেন।"

সতীদাহ সম্পর্কে রাজেন্দ্রলাল লেখেন—"যখন 'আরণ্যক'গুলি লেখা হয়েছিল তখন পর্যন্ত মৃতস্বামীর চিতায় বিধবাকে পুড়িয়ে মারার অমানুষিক প্রথা ভারতে প্রচলিত হয় নাই। গ্রীকদের লেখা থেকে দেখতে পাই যে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে এই প্রথা মৃতদেহ সৎকারের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। আনুমানিক ৪র্থ শতকে রামায়ণ ও মহাভারতে সতীদাহের উল্লেখ নাই। উল্লেখ করা যেতে পারে যে 'আরণ্যক'গুলি খৃঃ পূঃ ৮ম শতাব্দীতে রচিত এবং রামায়ণ মহাভারতে সতীদাহের কথা প্রক্ষিপ্ত

হওয়াই সম্ভব।" ঐতিহাসিক বিচার ও সিদ্ধান্ত যে যুগ-নিরপেক্ষ হতে পারে না, হওয়া উচিত নয়—রাজেন্দ্রলালের এই সিদ্ধান্ত তার উদাহরণ।

"বৈদিক যুগে বিধবা বিবাহ যে জাতীয় রীতি হিসাবে গণ্য হতো তা খুব সহজেই যুক্তি প্রমাণ সহ প্রতিষ্ঠিত করতে পারা যায়। প্রাচীনকাল থেকেই কতগুলি শব্দ প্রচলিত ছিল,—যেমন 'দিধিশু' অর্থাৎ যে পুরুষ বিধবা বিবাহ করেছেন; 'পরপূর্বা,' অর্থাৎ যে নারীর দ্বিতীয় বিবাহ হয়েছে; 'পৌনর্ভব' অর্থাৎ দ্বিতীয় স্বামীর ঔরসজাত সন্তান। এই শব্দগুলি প্রমাণ করে যে বিধবা বিবাহ প্রাচীন ভারতে রীতি ছিল।"

প্রগতিবাদী রাজেন্দ্রলাল কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু সমাজে রামমোহন বিদ্যাসাগরের মতই এক বিস্ময়, বিরাট তাঁর কর্মকাণ্ড, বহুমুখী প্রতিভা,—যা সক্রিয় রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে শুরু করে, শিক্ষা বিস্তার, সমাজ সংস্কার ও পুরাতত্ত্বের বিভিন্ন শাখা পর্যন্ত বিস্তৃত। আমরা আশা করবো ভবিষ্যতের কোন গবেষক ডঃ শিশির কুমার মিত্রের প্রদর্শিত পথে রাজেন্দ্রলালের একখানি পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা করবেন। ডঃ মিত্র তাঁর পুস্তকে রাজেন্দ্রলালের প্রবন্ধাদির যে তালিকা দিয়েছেন তা ভবিষ্যতে গবেষকদের সহায়তা করবে।

ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে ডঃ মিত্র যেভাবে ঐতিহাসিক রাজেন্দ্রলালের সুষ্ঠু মূল্যায়ন করেছেন, আমরা আশা করবো তেমনি ভাবে তাঁর শক্তিশালী লেখনী পুরাতত্ত্বের পথিকৃৎদের জীবনী একের পর এক আমাদের পরিবেশন করবে।

একালের কবিতা

মণীন্দ্র রায়

পুরনো একটা বিতর্ককে যদি আমি নতুন করে তুলি—সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক কী?—অনেকেই হয়তো তাহলে মৃদু হাস্যে উদ্ভাসিত হবেন। বিশেষ করে যাঁরা প্রগতিশীল বলে খ্যাত তাঁদের নিশ্চয়তাবোধ তো এ ব্যাপারে হিমালয়তুল্য। অর্থাৎ তাঁদের মুখচ্ছবি দেখে একথা স্পষ্ট মালুম হবে যে, এ প্রশ্নের জবাব তাঁরা জানেন, এবং তা তাঁরা মানেন। সাহিত্যের

অন্তরীণ: অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়। সুরভি প্রকাশনী, কলকাতা-৯। দাম তিন টাকা।

সঙ্গে জীবনের যোগ যে ঘনিষ্ঠ এবং জীবনের জন্যেই সাহিত্য এ বিষয়ে একছিটেও সংশয় নেই। অতএব প্রশ্নটাই অযথা।

খুবই আনন্দের বিষয়। কিন্তু পুজোর সময় এঁদের বাড়িতে গেলে দেখবেন কেনা হয়েছে সেই সব ঢাউস পত্রিকা, যা প্রগতিশীল বলে খ্যাত নয়। এবং তার কারণ কী জানতে চাইলে শুনবেন, বাড়ির মেয়েদের জন্য কেনা হয়েছে। এ অজুহাত, বলাই বাহুল্য, খুব করুণ একটি অর্ধসত্য ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা, তা যদি হত, যদি প্রগতিশীল কর্মীরা এইসব গ্যাকা, ন্যাকা বস্তাপচা প্রেমের গল্প আর যৌন কেচ্ছামূলক উপন্যাস ইত্যাদির বিষয়ে সতর্ক থাকতেন, তাহলে—আজ যখন দেখা যাচ্ছে বাংলা দেশের জনসাধারণ বলতে যা বোঝায় তাঁদের বেশির ভাগই প্রগতিশীলদের পক্ষে, তখন—এই ধরণের পত্রপত্রিকা, গল্প উপন্যাস এবং কাব্যকবিতার বাজার এবং দাপট অনেক সংকুচিত হত। আর, তার সঙ্গেই অনিবার্য ভাবে যা ঘটত, প্রগতিশীল বলে খ্যাত সাহিত্যপত্রিকাগুলির প্রচার হু হু করে বেড়ে যেত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ দুটি সম্ভাবনার একটিও বাস্তবে সফল হয় নি। হয়নি তার কারণ, যাঁরা রাজনীতির দিক দিয়ে প্রগতিশীলতার পক্ষে জনমত সংগঠন করেছেন তাঁরা শিল্পসাহিত্যের দিক দিয়ে জনমতকে প্রগতিশীলতার দলে সামিল করতে পারেন নি। এবং সেটা না পারার একটা প্রধান কারণ হল নিজেরাই তাঁরা শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রগতিশীলতার ভূমিকার বিষয়ে সচেতন নন। যদিও, আগেই বলেছি, মুখে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা সবকিছুই জানেন এমন ভাবই দেখাবেন।

আসলে মুশকিল হ'য়েছে এই যে, প্রত্যক্ষ রাজনীতির চাপে আমরা বেশির ভাগই রাজনীতিক কাজকর্মকেই অগ্রাধিকার দিয়েছি। এটা অনেকটাই অনিবার্য তা অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে আমরা হয়তো একটা পর্যায়ে জয়ীই না হয় হলাম, কিন্তু সেই জয়কে মজবুত করবে কে ?—জনসাধারণই তো ? আর তার নেতৃত্ব দেবেন নিশ্চয়ই রাজনৈতিক কর্মীরা। কিন্তু, একথা তো আমরা সকলেই জানি যে, মানুষ নামক একটি জটিল প্রাণীর সমস্ত রকম কর্মোদ্যোগের মূলকেন্দ্র হল মস্তিষ্ক এবং মন। কাজেই মাথার মধ্যে যাঁদের এখনো অন্ধকারের রেশ কাটেনি বাস্তবে তাঁরা আলো

জ্বালাবেন কী করে? এ প্রশ্ন আজ জরুরি হয়ে উঠেছে বাংলা দেশে, বিশেষ করে নোংরা সাহিত্য আর বিকৃত সংস্কৃতির যে জোয়ার বওয়ানোর [illegible] হচ্ছে এখানে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এ জিজ্ঞাসার সদুত্তর এখন [illegible]রিহার্য। কেননা, একথা তো আমরা সকলেই জানি, কাউকে যদি কৌশলে খতম করতে হয় তো সবার আগে দরকার তার মতিভ্রম ঘটানো। অপসংস্কৃতির প্রচারবাহিনী যে নানারকম মোহিনীমায়ার ফাঁদে ফেলে আমাদের সেই দিকেই টেনে নিতে চাইছে এ এখন দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট। কাজেই রাজনীতির মতোই সাহিত্যকর্ম ইত্যাদির বিষয়ে এখন আমাদের সজাগ থাকা দরকার।

শ্রী অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের নতুন কবিতার বই 'অন্তরীণ' হাতে নিয়ে এই কথাগুলিই বিশেষ করে মনে পড়ল। অমিতাভের কবিজীবন শুরু হয় পঞ্চাশের দশকে শেষের দিকে। আর বাংলা কবিতার হালচাল যাঁরা জানেন, তাঁরা ওয়াকিবহাল আছেন যে কবিতার রাজত্বে যৌবরাজ্য দখল করেছিলেন তখন সেইসব কবি যাঁরা সমাজপ্রগতির বিষয়ে উদাসীন, এমন কি তার বিপক্ষে। এক ধরণের চটুল স্মার্টনেস এবং বেপরোয়া ফুর্তির ভাবটাই তখন বাজারদখল করেছিল। আর বিষাদ, যন্ত্রণা ইত্যাদি যদিওবা মাঝে মধ্যে তাঁদের মুখে শোনা যেত তা প্রায়শই মনের মতো একটি স্ত্রীলোক (প্রেমিকা নয় কিন্তু!) না জোটাতে পারার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত।

ইত্যাকার পরিস্থিতিতে যে কয়জন তরুণ কবি শিল্পীসাহিত্যিকের সামাজিক দায়িত্বের বিষয়ে অবহিত ছিলেন এবং সেই প্রেরণায় উদ্দীপিত হয়ে কবিতারচনায় সার্থক হয়েছিলেন, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় তাঁদেরই অগ্রবর্তীদের একজন। সেদিন প্রায় সপ্তরথী-বেষ্টিত অভিমন্যুর মতো যে বীরত্ব এরাঁ দেখিয়েছিলেন সেজন্যে এঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই।

অমিতাভের কবিতায় সব থেকে যা প্রথমে নজরে পড়ে তা হল মস্তিষ্কের সঙ্গে হৃদয়ের মিলন। তিনি যে একজন সুদক্ষ লিরিক কবি তার ছাপ আছে এ বইয়ের প্রথম দিকের কবিতায়। যেমন ধরুন,

তোমাকে সেদিন বলিনি যে কথা, ভুলিনি, কি করে ভুলি—
অলস আঁচল ধরা ছিল কাঁধে আদরে মদির অঙ্গে
চলে যেতে যেতে দাঁড়ালে বারেক লাজরক্তিমা রঙ্গে…

পাহাড়ে পাহাড়ে মেঘে উপবনে উধাও বৃষ্টিপাতে
শুধু ঝরে যায় সেই কথাগুলি, ভুলি নি, কি করে ভুলি।

হ্যাঁ নেহাতই একটি প্রেমের কবিতা, যৌবনে যা খুবই স্বাভাবিক। তাই কবি লিখেছেন, একেবারে তাঁর কবিজীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে। কিন্তু তাঁর আবেগকে তিনি তাঁর পূর্বোক্ত সমসাময়িকদের মতো ফাঁকা বীরত্বে কদর্য করে তোলেন নি, এবং তাঁর মানবিক স্বাভাবিকতার এই অভিজ্ঞান তাঁকে সুস্থতর জীবনযাত্রার খোঁজেই আরো উন্মুখ করেছে।

এবং সেই অন্বেষণেরই ফলশ্রুতি পাওয়া গেল এই বইয়ের দ্বিতীয় অংশে। যেন পুর্ণিমার স্বপ্ন ছিন্নভিন্ন করে জেগে উঠল বৈশাখী সূর্যের বহ্নিজ্বালা।

একই সঙ্গে অবক্ষয় আর নতুন জীবনরচনার দৃপ্ত পৌরুষে অস্থির যে বাংলাদেশ—যে বাংলাদেশ প্রতিবাদের, ধিক্কারের, বিদ্রোহের, তারই মুখোমুখি দাঁড়ালাম এসে আমরা, জীবনের বাস্তবতার বোধে সচকিত হ'য়ে উঠলাম। সেখানে মিথ্যা হ'য়ে গেল এ প্রশ্ন যে অমিতাভ আমাদের পুরনো কাব্যপাঠের অভ্যাসকে কতোখানি তৃপ্ত করেছেন বা করেন নি, কেননা সে তর্কটাই সেখানে অবান্তর। তিনি আমাদের অভিজ্ঞতার দিগন্তকে প্রসারিত করতে পেরেছেন সেইখানেই হল তাঁর পয়লা নম্বরের জিৎ। এবং যেহেতু তিনি তা পেরেছেন কাজেই স্বীকার করতে আমরা বাধ্য, কবিতারচনার অভ্যাসিক আদলটাকে না মেনে থাকলে তিনি বরং ভালোই করেন—কেননা, তা মেনে চললে হয়তো আমরা কবিতার এই নতুন আস্বাদ থেকে বঞ্চিত হতাম। দুটি উদ্ধৃতি তুলে বিষয়টাকে স্পষ্ট করি এবার।

আমাদের রক্তের বোতলগুলি ঊর্ধ্বমুখী
লিফ্‌টে উঠে যায়
হাওয়া উড়ে আসে সব শাদাশাদা দেয়ালে দেয়ালে,
দীর্ঘ করিডরে...
ঘুমে হেঁটে চলা মধ্যরাতে
হাজার বছর ধরে
হঠাৎ, হঠাৎ
ফনার্স, মেশিনের কণ্ঠের কল্লোলে

হাজার বছর পরে
কল্লোলিত কল্লোলিত
আমাদের, রক্তের বোতলগুলি
আমাদের, চ্ছলাৎ চ্ছলাৎ
ঢেউয়ে, লিফ্‌টে উঠে যায়—
টান্ টান্ ধমনী শিরায়
নিযুত অসংখ্য অফুরান
চকিত পিচ্ছিল সূক্ষ্ম
সাস্‌পেন্সন তারে…
ধমনী শিরায়
লিফ্‌টে উঠে যায়।

একবার পড়ুন—

এখন কলকাতা দেখ একশো-পাঁচ দিশীমদে বেহেড্ বেহুঁশ
চুর হ'য়ে অচেতন নর্দমা জড়িয়ে শুয়ে মেটিয়াবুরুজে,
বিদেশী জাহাজ থেকে খালাসীপাড়ায় নেমে কোন এক অশ্লীল নাবিক
যেন মাত্র খেলাচ্ছলে চাঁদমারী ক'রে তার ওড়াবে ফুসফুস
কিছু পরে অবহেলাভারে সব সাক্ষীদের দুহাতে পকেটে নোট গুঁজে
সদ্য ফুসফুস-ফাটা কলকাতার ঠোঁটে ধরবে জলন্ত কুটিল ম্যাচ্‌ষ্টিক,
ওষ্ঠের আগুন অমনি হঠাৎ-তৎপর এক বৈদ্যুতিক লাফে
ঢুকে যাবে কলকাতার অন্ত্রভরা মদে অ্যালকহলে,
অকস্মাৎ বিস্ফোরণে শরীরের সর্বত্র ফাটিয়ে মধ্যস্থলে
ভীষণ দাউদাউ করে পলক-না-ফেলতে সব পুড়ে যাবে পাপে।

উদ্ধৃতি হয়তো একটু বড় হল, কিন্তু অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের অনুসন্ধান ও উপলব্ধির তীব্রতা বুঝতে একটু দরকার ছিল। শব্দনির্বাচনে তাঁর আপাত হেলাফেলা, অথচ অভ্যন্ত সতর্কতা এবং আমাদের চলতি জীবনের টেনশানকে কাব্যে রূপায়িত করার জন্যে টান-টান ছন্দের ব্যবহার তাঁর কবিতাকে এক নতুন চরিত্রে সতেজ করে তুলেছে। জীবনের রূঢ়তা ক্রূরতার বিষয়ে প্রতি-মুহূর্তে সজাগ থেকেও তিনি মানুষের সীমাহীন ভবিষ্যতে বিশ্বাসী। এবং

এই মানব-অভিমুখিতাই তাঁকে বারে বারে জীবনের ঝটিকাকেন্দ্রের দিকে সচেতন করে তুলেছে।

আবার কখনো-বা আমাদের আত্মপ্রতারণার প্রতিবাদে তাঁর কলম থেকে বেরিয়ে এসেছে নতুন জাতের কবিতা—আবেগের তীব্রতায় জন্ম নিয়েছে নতুন ধরনের আঙ্গিক। এ বইয়ের শেষ দিকের গদ্যাকার কবিতাগুলোয় এই নতুন মেজাজ বিদ্রূপে বেদনায় ভাস্বর হ'য়ে উঠেছে। 'লিপিকা'র দিনগুলো থেকে কতোদূরে স'রে এসেছি আমরা এ যেন তারই এক নতুন অভিজ্ঞান। কিন্তু অমিতাভ যেহেতু শক্তিমান কবি তাই আমার স্থির বিশ্বাস, তাঁর এই অর্জিত সাফল্যেই তিনি তৃপ্ত হবেন না, নগরজীবন থেকে তাঁর দৃষ্টিকে প্রসারিত করে মেলে ধরবেন শ্রমজীবী জীবনের মর্মকেন্দ্রে এবং গ্রামবাংলার দূর দূরান্তে। কেননা, কেবল রাজনীতির নয়, কাব্যেরও ভবিষ্যত যে সেইদিকেই অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের মতো দায়িত্বশীল কবির কাছে নিশ্চয়ই তা অনাবিষ্কৃত নেই।

তাঁর নতুন লেখার জন্যে উন্মুখ হ'য়ে রইলাম।

শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে স্বদেশ সত্য
তাহার উপরে নাই

।।।
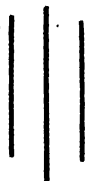
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ
কলিকাতা-৯

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে ঃ

●

॥ বাংলার লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি ॥

[মননশীল প্রবন্ধ সংকলন]

অধ্যাপক ডঃ দুলাল চৌধুরী।

প্রণীত

●

॥ লোকায়ত প্রকাশন ॥
১১৮/৪৯ আনোয়ার শা' রোড্‌,
॥ কলিকাতা ৪৫ ॥

নবশক্তি প্রেস ঃ স্বত্বাধিকারী : নবশক্তি নিউজপেপার্স
কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-১৪॥